ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের জনজীবন ও তাদের ইতিহাস: ১৯৪৭ থেকে ২০১৫

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

অঙ্কন রায়

ইতিহাস বিভাগ

রেজিস্ট্রেশন নং- **AOOHI0200416**

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের জনজীবন ও তাদের ইতিহাস: ১৯৪৭ থেকে ২০১৫ (*Bharat-Bangladesher Chitmahal er Janajibon O tader Itihas: 1947 thake 2015*) Submitted by me for the Award of the Degree of 'Doctor of Philosophy in Arts' at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Rup Kumar Barman, Professor, Department of History, Jadavpur University;And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Dr. Rup Kumar Barman
Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata 700032
Dated

Candidate:

(Ankan Ray)
Dated

মুখবন্ধ

‘ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের জনজীবন ও তাদের ইতিহাস: ১৯৪৭ থেকে ২০১৫’ শিরোনামক গবেষণাপত্রে ছিটমহলের সংজ্ঞা এবং তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সুবাদে অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মণের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়। তাঁরই তত্ত্বাবধানে *Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies* (MAKAIAS) এর গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সূত্রে ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় পর্বে ছিটমহল সম্পর্কে কৌতুহলের দরুণ এই সম্পর্কিত তথ্য আরোহণ করতে শুরু করি।

ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষের মানবাধিকার লংঘিত হওয়ার চিত্র আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। দশকের পর দশক জুড়ে মানুষের এই সংগ্রাম আমাকে ছিটমহল নিয়ে চর্চায় ঋদ্ধ করেছে। ছিটমহলবাসীদের অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের ইতিহাস আমাকে ছিটমহলের সংগ্রামী মনোভাবের সাথে পরিচয় করিয়েছে। এই অভিজ্ঞতার সাথে কাটানো সময়গুলো আমার কাছে বাস্তবসম্মত চিন্তা ভাবনার অনুপ্রেরণা হিসেবে থেকে যাবে আজীবন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজজীবন যখন আমাদের আধুনিক সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে, একাকিত্ব, অবসাদ ইত্যাদি জটিল অর্থবহ শব্দ যখন আমাদের রোজনামচা হয়ে উঠেছে তখন রাষ্ট্রীয় সীমানার অভ্যন্তরে এই সংগ্রামী মানুষগুলো শিখিয়েছে কি করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে হয়। একই সাথে কি করে হাতে হাত রেখে আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে হয় তার উদাহরণ তৈরি করেছে। রাষ্ট্রহীন অবস্থা থেকে কি করে পায়ের তলার মাটি তৈরি করা যায়, তা করে এই মানুষগুলোই দেখিয়েছেন।

ছিটমহল এক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্য রাষ্ট্রের ভূভাগ। সহজেই অনুমেয় এই অঞ্চলের মানুষদের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন হবে। অথচ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও পূর্বতন ছিটমহলবাসীর জনজীবন ও তাদের ইতিহাস ভীষণ উন্নত, যে আবেগ তাদের

অনুকূলে হার না মানা মানসিকতা তৈরি করেছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্প হোক কিংবা আমার এম ফিল-এর গবেষণার অথবা পিএইচডি গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষায় আমি যখন এই মানুষগুলোর কাছে গিয়েছি তারা আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। তাদের সংগ্রামের কথা জানার প্রয়াসে তারা আমার কাছে ব্যক্ত করেছে রাষ্ট্রীয় অসহযোগীতার কথা। যার প্রতিফলন হয়েছে এই গবেষণায়। আমি এই গবেষণাপত্রের সর্ব প্রধান সহায়ক হিসেবে এই মানুষগুলোর কথা উল্লেখ করতে চাই। যাদের সহযোগিতা ছাড়া, এই গবেষণা নির্মাণকরা সম্ভব হতো না। বিনিময় পরবর্তী ছিটমহল অধিবাসীদেরকে সর্বান্তকরণে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যারা তাদের সংগ্রামের কথা আমাকে জানার সুযোগ করে দিয়েছিল। বাংলাদেশের মহঃ আলাউদ্দিন (পাটগ্রাম, লালমনীরহাট), বিষ্ণু বিলাশ রায় (কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ) এই গবেষণাকর্মে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন।

২০১১ সালের আদমশুমারির পর থেকে ছিটমহলে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করতে শুরু করে। দুই দেশের মধ্যে একাধিকবার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হলেও, ছিটমহলের মানুষদের অভিব্যক্তিতে অসম্পূর্ণতার কথা উঠে এসেছে। জীবন ধারণের অধিকার ও নিরাপত্তার অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষদের হারানোর কিছু ছিল না। তাদের প্রাণপণ সংগ্রামের খবর একটা সময় পৌঁছে যায় মূল ভূখণ্ডে। এসময় বিভিন্ন বে-সরকারি সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন পাশে দাঁড়ায় এই সংগ্রামী মানুষদের। ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের মানুষদের নিয়ে, তাদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে কলম ধরেন অনেকেই। সীমান্তবর্তী শহরগুলির ছোট পত্রিকা, স্থানীয় সংবাদপত্র, নাট্যদল ছিটমহলবাসীর বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। ছিটমহল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এর অভ্যন্তরে তৈরি হয় – ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল সমন্বয় সমিতি, ছিট ইউনাইটড কাউন্সিল, ছিট নাগরিক সুরক্ষা কমিটি, ছিটমহল বিনিময় সংগ্রাম কমিটি, ইত্যাদি।

এই সংগঠনগুলি ছাড়াও জানা-অজানা বহু সাধারণ মানুষ, স্থানীয় ও প্রথম সারির সাংবাদিকরা যারা সংহতি প্রদানের মধ্য দিয়ে বিশ্বজনীন করে তুলেছে ছিটমহলের অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে।

ছিটমহল বিনিময় পরবর্তীকালেও ছিটবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তেমন সফলতা আসে নি। আজও কারণে অকারণে এই মানুষগুলি নানাভাবে বঞ্চিত। উপরিউক্ত এই সমিতিগুলি বিভিন্ন সময়ে বিনিময় পরবর্তী অধিকারের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই বিষয়গুলি সমাজ বিজ্ঞানের চর্চায় সেভাবে উপস্থাপিত হয়নি। এই নীরবতার জায়গাটি বার বার আমায় ছিটমহল বিষয়ক গবেষণায় উৎসাহিত করেছে।

ছিটমহল বিষয়ক গবেষণা আলোচনার স্থান উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে এতটাই সংক্ষিপ্ত যে গবেষণাপত্রের অনুপস্থিতি বর্তমান গবেষণাটিকে আরো প্রতিকূল করে তুলেছে। মুষ্টিমেয় কিছু গবেষক এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন ফলত নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর। সংবাদপত্রে প্রতিবেদন, সরকারি নথি ও এই জাতীয় প্রাথমিক স্তরের তথ্যের ওপর। তবে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে উঠে এসেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ। সাধারণ মানুষের ব্যক্তি জীবনের প্রতিকূল বিষয়গুলি যেমন– জমি সংক্রান্ত নথিপত্র, জমির কর প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা, বিবাহযোগ্য কন্যার বিবাহ দানের অসুবিধার কথা, উঠে এসেছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, প্রসূতির স্বাস্থ্য, শিশুর স্বাস্থ্য, নারীদের অনিশ্চিত জীবন যাত্রা, শিক্ষালাভ কিংবা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতার কথা। যা বিনিময়ের সাত দশকে (১৯৪৭-২০১৫) খন্ড চিত্রের মত একাধিক প্রবন্ধ লেখা হলেও এর সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে গবেষণার অভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

ছিটমহলের কাজে বহু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে, যেমন- ক্ষেত্র সমীক্ষায় ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটগুলিতে তথ্য সংগ্রহ ও তাদের সাথে কথোপকথানের সুযোগ অনেক বেশি ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলগুলোতে ক্ষেত্রসমীক্ষা নানা কারণে

বারবার ব্যাহত হয়েছে। নানাভাবে সাধারণ মানুষের ভাব প্রকাশে পরোক্ষভাবে বাঁধা দান করা হয়েছে, তাদের উত্তর কে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে। বিশেষত সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা গুলি ছিটমহলবাসীরা নির্ভয় বলতে পারেনি বলে আমার মনে হয়েছে। বিশেষত সাম্প্রদায়িক হিংসা সংক্রান্ত প্রশ্ন গুলিতে ছিটমহল বিনিময় পূর্ববর্তী উত্তরগুলির চাইতে পরবর্তী উত্তরগুলি অনেকটাই বেশি স্পষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে ছিটমহল বিনিময় পরবর্তী সময়ে কিছু মানুষ ব্যক্ত করেছে এদেশে অন্তত সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হতে হবে না। বিষয়টি বিতর্ক ও আলোচনার ঊর্ধ্বে নয়, ফলে কেবলমাত্র এই বিষয়টিকে লক্ষ্য রেখে আরো বিস্তারিত গবেষণা সম্ভব।

গবেষণা পত্রে চেষ্টা করা হয়েছে '*আকাদেমি বানান অভিধান*' (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫) অনুসরণ করার। গবেষণা পত্রে ইতিপূর্বে বহু মুদ্রণ প্রমাদ দেখা গিয়েছিল, সেগুলো ঠিক করার পরেও এই গবেষণাপত্রে অনিচ্ছাকৃত বানানের ভুল ত্রুটি থেকে থাকলে তার দায়ভার সম্পূর্ণ ভাবে লেখকের।

আমার পিতার প্রথম জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার শিতলকুচী ব্লকের অভ্যন্তরে, বাংলাদেশের পাটগ্রাম জেলার অর্ন্তগত ফলনাপুরে ছিট (জেএল নং ৬৪/ ৫০৬.৫৬ একর) অঞ্চলে। পারিবারিক আলোচনায় এই অঞ্চলগুলির দুর্বিষহ জীবনের কথা বারবার উঠে এসেছে তার মুখে। আমার পিতামহের বাসস্থান এই ছিট অঞ্চলে হলেও ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের ছিল তার চাষ জমি ও একটি বসত বাড়ি। ছিট অঞ্চলে পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হলে আমার পিতামহ তার সন্তানদের পার্শ্ববর্তী সীমান্ত শহর মাথাভাঙ্গা পড়াশোনার জন্য পাঠান। পরবর্তীকালে, ছিটমহল অঞ্চলে বসবাস করার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না আমার পূর্বপুরুষদের। কিন্তু পৈত্রিক ভিটে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেও ছিটমহল অঞ্চলে তাদের যাতায়াত করতে হত। পারিবারিক এই বাড়িতে বেশ কয়েকবার আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেই

সময় হতে সেখানে বসবাসকারী মানুষের মুখে তাদের নিরুপায় অবস্থার কথা জানতে পেরে ছিট মহল সম্পর্কে একটা কৌতুহল বরাবর ছিল। পরবর্তীকালে, গবেষণা করতে এসে ছিটমহল সংক্রান্ত প্রকল্প আমাকে আকর্ষিত করে। ছিটমহল যাওয়া-আসার পূর্বতন অভিজ্ঞতার কারণেই হোক গবেষণাকালে ক্ষেত্রসমীক্ষার জটিলতা তুলনামূলক কম অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। আমি আমার মা বাবাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সব সময় আমার পাশে থাকার জন্য। আমার পিতা পুষ্পেন্দ্র মোহন রায়, মাতা শ্রী মাধবীলতা রায় যারা সবসময় আমার পাশে থেকে আমার গবেষণাকে সুসম্পন্ন করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরনা জুগিয়েছে। আমার অন্তরের প্রনাম গবেষক ও ভাষাতাত্ত্বিক পদ্মশ্রী ড. ধর্মনারায়ণ বর্মা, সাহিত্যিক মিনতী অধিকারী যারা আমার গবেষণা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দিয়েছেন। একই সাথে শ্রদ্ধা ও প্রনাম শ্রী পুষ্পেন বর্মন (মামা), পার্বতী বর্মন (মামি), সুলতা সিনহা (মাসি) তারা সবসময় আমায় উৎসাহ দিয়েছে। আমার দাদা ৺অরিন্দম রায়, বৌদি রূপা রায় ডাকুয়া, ভ্রাতা কুন্তল রায়, ভ্রাতা কিংশুক রায়, দেবপ্রিয়া সিনহা (বোন) গবেষণার কাজে কতভাবে যে আমাকে সাহায্য করেছে তার হিসেব নেই। অবশেষে যার নাম না নিলেই নয়, তিনি সহধর্মিনী কাদম্বরী আধিকারী। তিনি আইনজ্ঞ হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। অতন্দ্র প্রহরীর মতো প্রতিটা মুহূর্তে আমার গবেষণার ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, পারিবারিক বা সামাজিক কোনো সমস্যা আমার গবেষণায় ব্যাঘাত ঘটছে কিনা তা তিনি লক্ষ রেখেছেন।

আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কে অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাকে গবেষণা করার ও গবেষণাপত্র প্রদান করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে গর্বের ও অহংকারের। আমি ধন্যবাদ জানাই বিদ্যালয়ের সকল আধিকারিক, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, সকল শিক্ষা কর্মী,

সকল কর্মচারী বৃন্দকে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠীদের, আমার সহ গবেষকদের। এই সকল মানুষদের নীরব সমর্থনে এই কঠিন কাজ শান্তিপূর্ণ ভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছি।

আমার গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সকল গ্রন্থাগার, সংস্থা, সংগ্রহশালা ও প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পেয়েছি সেগুলি হল- কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, নর্থ বেঙ্গল স্টেট লাইব্রেরী, কুচবিহার; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজা রামমোহনপুর শিলিগুড়ি; এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার। এই সকল প্রতিষ্ঠান সাথে সংযুক্ত প্রতিটি মানুষকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গবেষণার প্রয়োজন এ ব্যবহৃত বহু তথ্য দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগারিক বনানী দিদি সবসময়ের জন্য যে কোন ধরনের বই দিয়ে আমায় সহায়তা করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের গ্রন্থাগারে পার্থ প্রতিম বোস সব ধরনের সহযোগীতা করেছে প্রতিনিয়ত উৎসাহ যুগিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাদের ওপর আমি কৃতজ্ঞ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ড. মহুয়া সরকার, ড. অমিত ভট্টাচার্য, ড. সুদেষ্ণা ব্যানার্জী, ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী (মুখার্জী) ও শ্রী সমীর দাস সর্বদা আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রানিত করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ড. পার্থ প্রতিম বসু, ড. দেবী চ্যাটার্জী ও ড. অনিন্দজ্যোতি মজুমদার স্যারদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই ড. যুথিকা বর্মা, ড. প্রজিত কুমার পাতিল (আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম), ড. রূম্পা দাস (অধ্যক্ষ, মহেশতলা কলেজ), ড. নিবেদীতা রায় (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা), ড. মনামী বসু, ড. বিনয় বর্মন (বাঁকুড়া সালদিহা কলেজ), স্বর্গীয় গবেষক ড. কার্তিক চন্দ্র বর্মন, ড. নরেন্দ্র নাথ

রায় (অধ্যক্ষ, বানেশ্বর সরথিবালা মহাবিদ্যালয়), ড. অয়ন ব্যানার্জী, ড. শর্মিষ্ঠা দেব ও ড. রাজেশ বিশ্বাস। যারা বিভিন্ন ভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন।

এই গবেষণা চলাকালীন প্রতিনিয়ত যার সাথে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ভাগ করে নিয়েছি, যিনি বিনাশর্তে আমাকে তার মূল্যবান সময় দিয়েছেন যার কথা না বললেই নয় তিনি ড. কৃষ্ণ কুমার সরকার। এছাড়াও অধ্যাপক অমিয় সরকার, বাল্যবন্ধু গবেষক কিশোর রায় সরকার, ড. বিমল চন্দ্র বর্মন, ড. মিঠুন মজুমদার, জয়ন্ত কুমার রায়, ড. পুরবী বর্মন, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস, অধ্যাপক শুভাশিস দে, ড. আনিসুল হক, ড. শিল্পা মন্ডল, ড. রাকিব অধ্যাপক পরিমল বর্মন, ড. দেবব্রত রায়, ভাস্বতী রায়, সৌরভ ছেত্রী, তন্ময় রায়, কৈলাস মাহাত, পরিতোষ বর্মন, মহঃ আহেদ, প্রনামী ভদ্র, আশিস নস্কর, ভাতৃপ্রতীম অজিত কুমার বর্মা, অঙ্কিতা দাস, মহেশ রায়, ড. অসিত বর্মন, তরুন বর্মন এদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। এছাড়াও আমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

sএই গবেষণা প্রকল্প নির্মানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে *ICSSR (Indian Council of Social Science Research, New Delhi, 19th Jan 2018)* কতৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অঙ্কন রায়
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
যাদবপুর, কলকাতা, ৭০০০৩২

সংকেতাবলি (Abbreviations)

ASEAN = Association of Southeast Asian Nations. এ. এস. ই. এ. এন.

BDO = Block Development Officer. ব্লক ডেভোলপমেন্ট অফিসার

BDR = Bangladesh Rifles. বাংলাদেশ রাইফেল

BJP = Bharatiya Janata Party. ভারতীয় জনতা দল

BSF = Border Security Force. বর্ডার সিকিউরিট ফোর্স

CPI = Communist Party of India. কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ ইন্ডিয়া বা সি পি আই (এম)

DM = District Magistrate. জেলা মুখ্য আধিকারিক

DPBC = Dakshin Berubari Pratiraksha Committee. দক্ষিণ বেরুবাড়ি প্রতিরক্ষা কমিটি

FB =Forward Bloc. ফরওয়ার্ড ব্লক্

IBEECC = Indo-Bangladesh Enclaves Exchange Coordination Committee. ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি

IDPs= Internally Displaced Persons. অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত ব্যক্তিবর্গ

IERA = Indian Enclaves Refugee Association. ইন্ডিয়ান এনক্লেভ্ রিফিউজি অ্যাসোসিয়েশন

INGO= International Non-Governmental Organization. ইন্টারন্যাশানাল নন্-গর্ভামেন্টাল অর্গানাইজেশন

JL= Jurisdiction List. জুরিশডিকশন লিস্ট

KPP = Kamtapuri Peoples Party. কামতাপুরি পিপলস্ পার্টি

LBA = Land Boundary Agreement, 2015. সীমান্ত-চুক্তি (ভারত-বাংলাদেশ)

MGNREGA= Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. এম. জি. এন. আর. ই. জি. আর

MLA = Member of Legislative Assembly. বিধায়ক

MP = Member of Parliament. সাংসদ

NDA= National Democratic Alliance এন. ডি. এ.

OBC = Others Backward Class অন্যান্য অনগ্রসর জাতি

RSP = Revolutionary Socialist Party. আর. এস. পি.

SAARC= South Asian Association of Regional Co-operation. দক্ষিন এশিয়ার সংঘভুক্ত জাতি রাষ্ট্র

SC= Scheduled Caste. তালিকাভুক্ত শ্রেনী

SDO = Sub-divisional Officer. মহকুমা আধিকারিক

SUC = Shitmahal United Council. ছিট ইউনাইটেড কাউন্সিল

SUCI = Socialist Unity Center of India. এস. ইউ. সি. আই.

UDHR = Universal Declaration of Human Rights (1948). ইউ. ডি. এইচ্. আর.

UIDAI= Unique Identification Authority of India. আর্ধার কার্ড

UNHCR= United Nations High Commission for Refugees. ইউ. এন. এইচ্. সি. আর.

UNO= United Nations Organization. রাষ্ট্র সংঙ্ঘ

UPA= United Progressive Alliance ইউ. পি. এ.

সরণি সূচি

সরণি- ১: ২০০৯ সালে ভারতীয় ভূখণ্ডে বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মৃত্যুর পরিসংখ্যান।

সরণি- ২: ভারত ও বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে বিরূপ রূপে থাকা বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের আয়তন।

সরণি-৩: জলপাইগুড়ি জেলার ছিটমহল হস্তান্তর

সরণি-৪: ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময় হয়ে আসা ভারতের ছিটমহল পূনবাসন শিবিরের অধিবাসীদের জন্য দেওয়া বিনামূল্যে সরবরাহকারী দ্রব্যাদি।

পরিভাষিক শব্দাবলী (Glossary)

খামারখাত ও অন্দরান: কুচবিহার রাজ্যের অধিনস্ত মহারানীর নিজেস্ব জমি।

ভুপালী: ভুটান থেকে ফিরে যাওয়া নেপালের অভ্যন্তরে থাকা নেপালী ভাষী রাষ্ট্রহীন অধিবাসী।

মোগলান: ভারতের অভ্যন্তরে মুঘলদের অধীনস্ত ভূভাগ।

লুথাম্পাস (Lhotsmpas): ভুটানের দক্ষিণে অবস্থিত নেপালী ভাষিক রাষ্ট্রহীন উদ্বাস্তু।

ছিটমহল (Enclave): নিজ রাষ্ট্রের ভূখণ্ড যখন অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তাকে ছিটমহল বলে।

ছিটমহল পরিবেষ্ঠিত ছিটমহল (Counter Enclave): একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্য রাষ্টের ভূখণ্ড থাকলে ছিটমহল, এই ছিটমহলের অভ্যন্তরে যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূভাগ থাকে তবে তাকে ছিটমহল পরিবেষ্ঠিত ছিটমহল বলে।

জাস সোলি (jus soli): একটি মানুষের নাগরিকত্ব নির্ধারণ হয় তার জন্ম গ্রহনের স্থানের ওপর'। *(A person acquires citizenship of a nation)*।

জাস সাঙ্গুইনিস (jus sanguinis): 'কোন শিশুর নাগরিকত্ব নির্ধারণ হয়, তার পিতা মাতার নাগরিকত্বের ওপর। *(A rule of law that a child's citizenship is determined by that of his or her parents)* ।

ডি-জুরে (De-Jure): ১৯৪৫ সালের সম্মেলনে ব্যাখ্যা শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, রাষ্ট্রহীন ব্যাক্তি হচ্ছে এমন ব্যাক্তি যাকে কোন রাষ্ট্র আইনের অধীনে জাতীয় নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করে না।

ডি-ফ্যাক্টো (De-Facto): ১৯৬১ সালের সম্মেলনে বলা হয় কোন রাষ্ট্রহীন অধিবাসীরা নিজের দেশের ভৌগলিক পরিসীমার বাইড়ে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী (Host Country) রাষ্ট্রের মূল সীমানার অভ্যন্তরে যারা অবস্থান করে তাকে De-Facto বলা হয়।

তালুক: সরকার বা জমিদারের নিকট হতে বন্দোবস্ত করে নেওয়া ভূসম্পত্তি।

দুয়ার: ভারত ও ভুটানের মধ্যবর্তী পর্বতমালা প্রবেশ দ্বার।

নিয়ন্ত্রক দেশ দ্বারা পরিবেষ্ঠিত ছিটমহল (Counter-Counter Enclave): ছিটমহলের অভ্যন্তরে যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূভাগ থাকে তবে তাকে ছিটমহল পরিবেষ্ঠিত ছিটমহল বলে, যদি এই পরিবেষ্ঠিত ছিটমহলের অভ্যন্তরে মূল ভূখণ্ডের বিচ্ছিন্ন ভাগ থেকে যায় তবে তাকে নিয়ন্ত্রক দেশ দ্বারা পরিবেষ্ঠিত ছিটমহল বলে।

রাজওয়ারা: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কুচবিহারের মহারাজের অধীনস্ত ভূভাগ।

নাজির: কুচবিহার রাজ্যে সেনা বিভাগের প্রধান।

প্রক্সি সিটিজেন (Proxy Citizen): ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলে থাকা অধিবাসীরা মূল ভূখণ্ডের সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য তারা মূল ভূখণ্ডের নাগরিকদের পরিচিয়কে ব্যবহার করে যখন কোন কাজের সুযোগ নেয়, তখন এই সুযোগ নেওয়ার বিষয়কে প্রক্সি সিটিজেন বলা হয়েছে।

বিরূপ আবস্থানে থাকা বিচ্ছিন্ন ভূভাগ (Adverse Possession): ভারত ও বাংলাদেশের ভূভাগের সীমানা নির্ধারণের সময় যে ভূভাগগুলি বাংলাদেশের যা ভারতে রয়ে যায়, আবার যে ভূভাগগুলি ভারতের তা যদি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে যায় তবে ওই ভূভাগকে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে থাকা বিচ্ছিন্ন ভূভাগ বা অ্যাডভার্স পজিসন বলে।

ক্ষত্রিয়: হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থার দ্বিতীয় শ্রেণী।

নব্য-নাগরিক: ছিটমহল বিনিময়ে হওয়ার সমসাময়িক সময়ে উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিজেদের পছন্দের রাষ্ট্র নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়, ভারতীয় ছিট থেকে আসা ৮৯৭ জন ভারতের মূল ভূখণ্ডে চলে আসে, সেই শিরিবে থাকা মানুষগুলোকে নব্য নাগরিক বলা হয়েছে।

পরগণা: অনেকগুলি গ্রাম মিলে একত্রিত একটি বৃহৎ ভূখণ্ড।

পাটকুমার: রাজপুত্র

রায়কত: কুচবিহার রাজ্যের দূর্গের নিরাপত্তা বিভাগের সাথে যিনি যুক্ত ছিলেন।

ফৌজদার: সেনাধ্যক্ষ।

রাজগুরু: রাজার অধ্যাত্মিক পরামর্শ দাতা।

সাবেকী ছিট: ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময় হওয়ার মূল ভূভাগের সাথে বিনিময় হওয়া সদ্য রাষ্ট্রীয় পরিসীমার অভ্যন্তরে আসা ভূভাগ।

সুচিপত্র

মখবন্ধ i-vii

সংকেতাবলী viii-ix

সরণি সূচী x

পরিভাষিক শব্দাবলী xi-xiii

ভূমিকা ০১-১৮

প্রথম অধ্যায়:

রাষ্ট্রহীনতার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল ১৯-৫৪

১.২ জাতীয়তা ও রাষ্ট্রহীনতার ধারণা

১.৩. রাষ্ট্রহীনতার সংজ্ঞায়িত ব্যাখ্যা: প্রসঙ্গ ছিটমহল

১.৪. বিশ্বের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রহীনতা

১.৫. দক্ষিণ-পূর্ব, মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া রাষ্ট্রহীনতার প্রকৃতি

১.৫.১. দক্ষিণ এশিয়ার (SAARC) অন্তভূক্ত রাষ্ট্র সমুহের রাষ্ট্রহীনতার প্রকৃতি

(ক). বাংলাদেশ

(খ). ভুটান

(গ). নেপাল

(ঘ). শ্রীলঙ্কা

(ঙ). আফগানিস্তান

(চ). মালদ্বীপ

(ছ). ভারত

১.৫.২. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রহীনতা

১.৫.৩. মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রহীনতা

১.৬. ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের রাষ্ট্রহীনতার চরিত্র

১.৭. পর্যবেক্ষণ

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে:

ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিটমহল সৃষ্টির ইতিহাস ৫৫-৭৯

২.২ কুচবিহারের ইতিহাস: আদিপর্ব

২.৩. মধ্যযুগের ইতিহাস: কুচবিহার রাজ্যে ছিটমহলের উৎস

২.৪. ভূটান-কুচবিহার: দ্বন্দ্ব ও সন্ধির সম্পর্ক

২.৫. ১৭৭২ সালে সন্ধিস্থাপন: ভুটান ও ইংরেজ

২.৬. ঔপনিবেশিক বাংলার শাসন ও ব্রিটিশ কুচবিহার

২.৭. উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কুচবিহারের ছিটমহলের বিকাশ ও বিস্তৃতি

২.৮. ভারতে সাথে কুচবিহার রাজ্যের সংযুক্তিকরণ

২.৯. পর্যবেক্ষণ

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

তৃতীয় অধ্যায়ে:

স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি (১৯৪৭-২০১৫) ৮০-১৩৮

৩.২. আন্তর্জাতিক স্তরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা: ভারত ও পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)

৩.৩. ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশী ছিটমহল ও তাদের অবস্থান

৩.৩.১. মাথাভাঙ্গা মহকুমার ছিটমহলের অস্তিত্ব

৩.৩.২ দিনহাটা মহকুমায় ছিটমহলের অস্তিত্ব

৩.৩.৩. মেখলীগঞ্জ মহকুমায় ছিটমহলগুলির অস্তিত্ব

৩.৩.৪. তুফানগঞ্জ মহকুমার অধীনে ছিটমহলের অস্তিত্ব

৩.৪ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল ও তাদের অবস্থান

৩.৪.১ বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার অধীনে ভারতীয় ছিটমহলের অস্তিত্ব

৩.৪.২. বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার অধীনে ভারতীয় ছিটমহলের অস্তিত্ব

৩.৪.৩. বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার অধীনে ভারতীয় ছিটমহলের অস্তিত্ব

৩.৪.৪. বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার অধীনে ভারতীয় ছিটমহলের অস্তিত্ব

৩.৫. মানবাধিকারের সংকট: ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল

৩.৫.১. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল

৩.৫.২. ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল

৩.৬. রাষ্ট্রহীনতা সংকট ও ছিটমহল আন্দোলন

(ক) ছিটমহল নাগরিক কমিটি

(খ) ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি

(গ) ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল

(ঘ) নলগ্রাম, ফলনাপুর ও জোংড়া নাগরিক সুরক্ষা কমিটি

(ঙ) ছিটমহল বিনিময় সংগ্রাম কমিটি

(চ) Indian Enclave Refugee Association বা ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু কমিটি

(ছ) দক্ষিণ বেরুবাড়ি প্রতিরক্ষা কমিটি

৩.৭. দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সীমান্ত সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা

৩.৭.১. বেরুবাড়ি কথা- ১৯৫২ সালে জলপাইগুড়ি জেলার ছিটমহল হস্তান্তর

৩.৭.২. ১৯৫২ সালে ভারত-পাকিস্থানের পাসপোর্ট ও ভিসা চুক্তি

৩.৭.৩. ১৯৫৮ সালের নেহেরু-নুন চুক্তি

৩.৭.৪. ১৯৭৪ সাল ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি

৩.৭.৫. তিনবিঘা চুক্তি

৩.৭.৬. স্থল সীমান্ত চুক্তি (Land Boundary Agreement) ২০১১ ও প্রোটকল

৩.৮. পর্যবেক্ষণ

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

চতুর্থ অধ্যায়ে:

বিনিময় ও বিনিময় পরবর্তী ভারতে ছিটমহল অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন ও সংকট

১৩৯-১৭৪

৪.২. ভারত ও বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময়

৪.৩. বিনিময়মুখী অভিযান

৪.৩.১. ২০১৫ সালের ছিটমহল বিনিময় নিয়ে উভয় সরকারের দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া

৪.৩.২. আঞ্চলিক স্তরে ছিটমহল বিনিময়ে পর্যালোচনা

৪.৪. বিনিময় পরবর্তী ছিটমহলের দৈনন্দিন জীবন

৪.৪.১. নব্য নাগরিকদের জনজীবনের অভিজ্ঞতা

৪.৪.২. ছিটমহল বিনিময় পরবর্তী ক্যাম্প জীবন: প্রসঙ্গ ভারতীয় ছিটের নাগরিক

(ক). হলদীবাড়ি পুনর্বাসন শিবির

(খ). মেখলীগঞ্জ ছিটমহল পুনর্বাসন সমিতি

(গ). দিনহাটা ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির

৪.৫. নব্য নাগরিক হয়ে শিবিরের দৈনন্দিন জীবন

৪.৫.১. অস্থায়ী শিবিরের নাগরিক জীবন

(ক). স্বাস্থ্য পরিষেবার

(খ). খাদ্য পরিষেবার

(গ). শিক্ষা পরিষেবার

৪.৬. অভাব ও অভিযোগ

৪.৬.১. নব্য নাগরিকদের সাথে মূল ভূখণ্ডের নাগরিকদের সম্পর্ক

৪.৬.২ ভারতীয় সরকার কর্তৃক নব্য নাগরিকদের স্বীকৃতি প্রদান

(ক). ভোটার কার্ড

(খ). আধার কার্ড

(গ). জব কার্ড

৪.৭. শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা

৪.৭.১. শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক সমস্যা

৪.৮. শিবিরের অধিবাসীরূপে দৈনন্দিন জীবিকা

৪.৯. পর্যবেক্ষন

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

উপসংহার **১৭৫-১৭৯**

সংযোজনী -I **১৮০-২১৪**

সংযোজনী -II **২১৫-২২১**

মানচিত্র **২২২-২২৮**

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী **২২৯-২৪০**

অন্তঃজাল **২৪১**

ভূমিকা

'রাষ্ট্র' বলতে এমন একটি সার্বভৌম রাজনৈতিক সংগঠনের একককে বোঝায়, যা কোন একটি নিদিষ্ট ভৌগলিক পরিসীমার মধ্যে বিস্তৃত। এই সার্বভৌমত্বের ধারনার বিকাশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র একটি নিদিষ্ট ভূভাগকে অধিকৃত করে রাখার প্রয়াস সংগঠিত করে থাকে। এই প্রয়াসের মধ্যদিয়ে পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী সীমানাকে কেন্দ্র করে সমস্যার উদ্ভব হতে দেখা যায়। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে সীমানা সংক্রান্ত বহুবিধ সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে অন্যতম হল রাষ্ট্রহীনতা বা ছিটমহল সমস্যা।

১৯৯৬ সালের তথ্য ভিত্তিক পরিসংখ্যানে বিশ্বে প্রায় ২২৩ টি ছিটমহল, ৩২ টি ছিটমহল পরিবেষ্ঠিত ছিটমহল (Counter Enclave) ও ১টি নিয়ন্ত্রক দেশ পরিবেষ্ঠিত ছিটমহলের (Counter-Counter Enclave) অস্থিত্ব দেখা যায়। এর মধ্যে আলোচ্য গবেষণার নিরীক্ষে ভারত ও বাংলাদেশে ১৭৮ টি ছিটমহল, ২৫টি ছিটমহল পরিবেষ্টিত ছিটমহল ও ১টি নিয়ন্ত্রক দেশ পরিবেষ্ঠিত ছিটমহল আছে। যা উভয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সুসম্পর্কে ক্ষেত্রেও বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১]

বিশ্বের রাষ্ট্রহীন অঞ্চলগুলোর আলোচনার প্রসঙ্গে পশ্চিম ইউরোপে মোট ৩২টি এনক্লেভ আছে, ও ছিটমহল পরিবেষ্টিত ছিটমহল (Counter Enclave) উল্লেখ করা যায়। এই ছিটমহলগুলি নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, স্পেন, ফ্রান্স জার্মানী, ইতালী, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিশ্বের সব থেকে বৃহৎ এনক্লেভ বেরেল-নাসাউ (Baarle-Nassau) ও বেরেল-হারটগ্ (Baarle-Hertog) ইউরোপে অবস্থিত। এছাড়াও অন্যান্য ছিটগুলি হলো- ভেনবাহন এনক্লেভ, লিভিয়া, বুসিঞ্জার, কমপিওন ডি'ইতালিয়া এবং জংহোলজ (Vennbahn Enclave, Llivia, Businger, Compione d' Italia ও Jungholz) ইত্যাদি।[২]

পশ্চিম ইউরোপের পাশাপাশি রাশিয়ার Union of Soviet Socialist Republics (USSR 1922-1991) অভ্যন্তরে মোট ১৩টি এনক্লেভের অস্থিত্ব পাওয়া যায়। যা রাশিয়া সহ, আজারবাইজান, তাজাকিস্থান, আরমেনিয়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করে আছে। রাশিয়ার এনক্লেভগুলির মধ্যে অন্যতম হল কালিনিনগার্ড (Kaliningard) এনক্লেভ। যা ১৯৯১ সালের পর থেকে ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই এনক্লেভটি রাশিয়ার মূল ভূখন্ডটি থেকে ২৬০ কিলোমিটার দূরত্বে লুথিনিয়া, বেলারুশ ও পোল্যান্ড দ্বারা আবদ্ধ। বর্তমানে যা রাশিয়ার নিরাপত্তাগত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।[৩]এছাড়াও আফ্রিকার সেউটা ও মেলিলা (Ceuta ও Melilla) ছিটমহল দুটি বিশ্বের মানচিত্রে এক নজির সৃষ্টি করেছে। উভয় এনক্লেভ দুটি স্পেনের মূল ভূখন্ডের অভ্যন্তরে আফ্রিকার প্রতিবেশী মরক্কোয় নিয়ন্ত্রক দেশের (Host Country) ভূমিকায় আছে।[৪]

পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়ার ও আফ্রিকার মতো এশিয়াতে ১৭৮টি এনক্লেভ আছে। যা ভারত ও বাংলাদেশ সহ ওমান ও United Arab Emirates (UAE) এর মধ্যে অবস্থিত। এই ১৭৮ টি এনক্লেভ বা ছিটমহলের বেশির ভাগ ছিটমহল ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন গবেষকের আলোচনায় ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী সমস্যার আলোচনার পাশাপাশি বর্তমান সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[৫]

ঔপনিবেশিক সময়ে কুচবিহার-মুঘল দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে চাকলা হস্তান্তর হয়। এই চাকলাগুলি অঞ্চলিক স্তরে ছিটমহল নামে পরিচিতি পায়। ভারত ও পাকিস্তানে (১৯৪৭) দেশভাগের পর নব্য রাষ্ট্র গঠিত হলে ছিটমহল বা এনক্লেভ (Enclave) সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে। এরপর ১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধের মধ্যদিয়ে নতুন দেশের (বাংলাদেশ) উদ্ভব হলেও ছিটমহল সমস্যার অমীমাংসিতই থেকে যায়।

ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সময় গঠিত সীমানা নির্ধারক কমিটি (Boundary Commission) নির্মিত বিভাজন রেখার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী বিচ্ছিন্ন ভূভাগগুলি উভয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অমীমাংসিত থেকে যায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১১১টি ছিটমহল (১৭,১৫৮.১৩ একর) ও ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল (৭১১০.০২ একর) থেকে যায়।[৬] এই পরিস্থিতি বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডে বসবাসকারী অধিবাসীদের রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা অভূতপূর্ব অবস্থার সন্মুখিন করে তোলে।

এই সকল বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডে বসবাসকারী মানুষ সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রক দেশের (Host Country) নিদিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। ফলত, তাঁরা সার্বভৌম দেশের নাগরিক হয়েও তাঁদের নাগরিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হতে হত। এই প্রতিবন্ধকতা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাদেরকে করে তুলেছিল রাষ্ট্রহীন (Stateless)।

এই সকল মানুষের রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা উত্তরনকল্পে উভয় দেশ বিভিন্ন সময় দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সন্মুখীন হয়। এই সকল পদক্ষেপের মধ্যে ১৯৫৪ সালের নেহেরু-নুন চুক্তি, ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি, ১৯৯২ সালে তিনবিঘা চুক্তি, ২০১০ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির (Joint Action Committee) দ্বারা জনগণনা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ৩১ সে জুলাই ভারত ও বাংলাদেশের 'ছিটমহল বিনিময়ের' দ্বারা রাষ্ট্রহীন মানুষগুলোর নাগরিকত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস সংগঠিত হয়।[৭]

এই চুক্তির মধ্য দিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ছিটমহল সম্পর্কীত সমস্যাটির নিস্পত্তি ঘটে। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়ে যায়। বিনিময় পরবর্তী পর্বে এই সকল মানুষের সমস্যা সমাধানে যে সকল উদ্যোগ নেওয়া

হয়েছিল, তা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল অপরিমিত। বিনিময় পরবর্তী সময়ে এই সকল মানুষদের নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে ছিটমহলের অধিবাসীদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত টানাপোড়ন তৈরি হয়। এই সমসাময়িক সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল থেকে ৯৮৭ জন অধিবাসী ভারতের মূল ভূখণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণে সম্মত হয়। তাঁরা ছিটমহলের ভূ-খন্ডসহ বাংলাদেশের মূল ভূভাগ থেকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। নব্য নাগরিক রূপে ভারতীয় ভূখণ্ডে আসা ছিটমহল অধিবাসীদের জন্য সরকার কতৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন- ছিটমহল পূনর্বাসন শিবির, আবাসন গৃহ প্রদান, কর্ম সংস্থান ইত্যাদি গ্রহণ করার মত বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হতে দেখা যায়।

সুতরাং উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিশ্বের পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ছিটমহলগুলির স্বাধীনোত্তর পর্বের ৬৮ বছরের (১৯৪৭-২০১৫) এক সামগ্রিক ইতিহাস উঠে আসতে দেখা যায়। কিন্তু ছিটমহলের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন, সেই অধিবাসীদের সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় স্তরের আন্দোলন, উভয় রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, ও ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময় পরবর্তী পর্বে ‘নব্য নাগরিক’ ও উভয় দেশের ‘সাবেকি ছিটমহলের’ অধিবাসীদের ওপর ক্ষেত্রসমীক্ষা বিষয়ক একাধিক অনুবিক্ষণীক্ বিষয়গুলি পর্যালোচনার বাইরে রয়ে গেছে। যা গবেষণাধর্মী আঙ্গীকে পূর্ণনির্মাণ করা প্রয়োজন। এই অনালোচিত বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য করে গবেষণা সন্দর্ভটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি:

ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল নিয়ে গবেষণা সন্দর্ভে ১৯৪৭ সাল থেকে বিনিময় পরবর্তী ২০২১ সাল পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। এই ছিটমহলগুলি উভয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ১১১টি ও ৫১টি বিচ্ছিন্ন ভূ-খন্ডে বিভক্ত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে অবস্থানের দরুণ ওই ভূভাগের অধিবাসীরা রাষ্ট্রহীনরূপে

স্বাধীনোত্তর পর্বে চিহ্নিত হতেন। রাষ্ট্রহীন পরিসরে সেই অধিবাসীদের অনিশ্চিত জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ফলে মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি একটা অন্যতম কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই অধিকার হীনতার সংকটের ফলে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৭ পরবর্তী বিভিন্ন চুক্তির মধ্যদিয়ে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের (পরবর্তী বাংলাদেশ) মধ্যে থেকে ছিটমহল সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সকল চুক্তির পরেও সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান করতে একাধিকবার ব্যর্থ হতে দেখা যায়। ১৯৪৭-২০১৫ সালে স্বাধীনতার (৬৮ বছর) পর ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই সমস্যা নিস্পত্তি ঘটে। ছিটমহল বিনিময়ের পাশাপাশি সরকার কেন্দ্রীক ছিটে অবস্থানরত অধিবাসীদের নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রশ্নে রাষ্ট্র নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। যার ফল স্বরূপ ভারতীয় ছিটমহলে ৯৮৭ জন রাষ্ট্রহীন অধিবাসী ভারতীয় মুল ভূ-খন্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। যদিও এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ছিটমহলে থাকা অধিবাসীদের কেউ বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণে সম্মতি দেখায়নি। সেই নব্য নাগরিক ও বিনিময় পরবর্তী সাবেকি ছিটমহলের অধিবাসীদের জীবন পর্বকে ইতিহাসের আঙ্গীকে বর্তমান গবেষণার তুলে ধরা হয়েছে।

পূর্ববর্তী গবেষণায় আলোকপাত:

ছিটমহল নিয়ে গবেষণা বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে এনক্লেভ (Enclave) বা ছিটমহল বিষয়ক ধারণা নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। এর সাথে ছিটমহলগুলি ভূ-রাজনৈতিক পরিসর যেমন স্থান পেয়েছে তেমনী এনক্লেভ বা ছিটমহলকে সংজ্ঞিত করা হয়েছে একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধে। এই গ্রন্থগুলি জি. ডাব্লুউ. এস. রবিনসন এর Exclaves (1959)[৮], পি.পি. করনের (Pradyumna P. Karan), A Free Access to Colonial Enclaves (1960), The India-Pakistan Enclave Problem (1966),[৯] এ. এইচ. ক্যাটুডাল এর Exclaves, Cahiers de Geographic de Quebec (1974),[১০] ব্রেন্ডেন আর. হোয়াইটের 'Waiting for the Esquimo: A Historical and

documentary Study of the Cooch Behar Enclaves and Bangladesh (2004)',[১১] দেবব্রত চাকীর ব্রাত্যজনের বৃতান্ত প্রসঙ্গ: ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল (২০১১)[১২], রূপ কুমার বর্মণ এর 'The Origin and Evolution of the Enclaves of India and Bangladesh (2019)'[১৩], এই গ্রন্থগুলো ছিটমহল নিয়ে ধরনা দিয়েছে। এছাড়াও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি ছিটমহলের ভৌগলিক পরিসরটিকে উল্লেখ করেছেন। যা বিশ্বের এনক্লেভ এর ধারণার পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ছিটমহল নিয়ে উৎপত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে। কিন্তু এই গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলিতে ছিটমহল বিষয়ে বিশ্বের সাথে ভারতীয় ছিটমহলের তুলনামূলক আলোচনা, ছিটমহলে অবস্থান করা অধিবাসীদের মানবাধিকারের সংকটের মত বিষয়গুলি উপেক্ষিত থেকে গেছে।

ছিটমহলের ভৌগলিক পরিসরে রাষ্ট্রীয় পরিচিতি থাকলেও বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রয়োগ ছিল অধারা। এক অর্থে তারা রাষ্ট্রহীন। ২০১১ সালের যৌথ গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল অধিবাসীদের জনগনণা করা হয়। এই দুই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রায় ৫১ হাজারের মতো অধিবাসী রাষ্ট্রহীন রূপে বসবাস করছে। এই রাষ্ট্রহীনতার পরিচিতি বহনের মধ্য দিয়ে একাধিক প্রতিকূলতার সন্মুখীন হতে হত। এপ্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানিক গবেষকদের একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হয়েছে, যে প্রবন্ধগুলি হল, Williem Van Schendel এর '*Stateless in South Asia: The Making of The India- Bangladesh Enclaves'* (২০০২)[১৪], Jones, Reece '*Sovereignty and Statelessness in the border enclaves of India and Bangladesh'* (2009)[১৫], Shewly Hosna Johan, '*life, the Law and the Politics of Abandonment Everyday Geographies of Enclave in India and Bangladesh'* (2012)[১৬], রূপ কুমার বর্মণের লেখা গ্রন্থ '*Contested Identity of Stateless Indians: A Study on the Chhitmahal-dwellers of India-Bangladesh Border Zones, (2014)', 'The Proxy citizens of North Bengal A Study on the present condition of the people*

of Indian enclaves of Bangladesh (2014)', "*Stateless of Enclave Dwellers and Struggle of Survival; A Study on the Indian Enclave Refugees"*- (২০১৫), *'Statelessness and Struggle for Existence: Reflection on the Indian Enclaves Dwellers (1950-2017)'* (2017), *The Raidak A Transnational River: From Bhutan to Bangladesh Through India*' (2021)[১৭], পার্থ প্রতিম বোসের লেখা *The Indo-Bangladesh 'Enclave' and a Disinherited People*, (২০১১)[১৮], মোহম্মদ গোলাম রববানীর লেখা '*বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল: অবরুদ্ধ ৬৮ বছর (২০১৭)*[১৯], রূপ কুমার বর্মণের প্রবন্ধ 'ছিটমহল বৃত্তান্ত: উত্তরবঙ্গের ছিটমহল ও ছিটমহলবাসীদের প্রান্তিকতার বিবরণ' (২০১৩)[২০], এই সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের অধিবাসিদের ভৌগলিক পরিসরে দৈনন্দিন প্রতিবন্ধতা তুলে ধরেছে। যা আন্তর্জাতিক আইনী অধিকারের সাথে যে দ্বাণ্ডিক ভিন্নতা তা প্রকাশ পেয়েছে।

ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল নিয়ে বিতর্ক প্রকাশ্য আসতে শুরু করে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনোত্তর পর্বে। দেশভাগের ফল স্বরূপ রাষ্টীয় সীমানা নির্ধারণগত অসম্পূর্ণতা ছিটমহলের অধিবাসীদের সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছিল। নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সীমানা কেন্দ্রীক অন্যতম সমস্যাগুলির মধ্যে যেমন- সাম্প্রদায়িক হানাহানি, সাংস্কৃতিক বিভেদ ও ধর্মীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল, তেমনী এই সমস্যার পাশাপাশি জন্ম নিয়ে ছিল ছিটমহল সমস্যা। স্বাধীনতা প্রাপ্ত দুই রাষ্ট্রের মাঝে পরাধীন হয়ে পড়ে ছিটের অধিবাসীরা। যাদের সমস্যা সমাধানে ভারত-পাকিস্তান ও ভারত-বাংলাদেশের সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাদের দ্বারা গৃহীত চুক্তি গুলি ছিটমহল সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। তবুও ছিটমহলের মতো গুরুত্বপূর্ণ মতামতের বিষয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে দুই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রকর্তাদের সিদ্ধান্তে। ২০১৫ সালের ৩১ সে জুলাই ছিটমহল বিনিময় দ্বারা উভয় দেশের রাষ্ট্রহীনতার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে ছিটমহল নিয়ে দুই দেশের চুক্তি সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে-- জয়া চ্যাটার্জির

প্রবন্ধ *'The Fashioning of Frontier: The Redcliffe line and The Bengal's Border Landscape 1947-52'* (১৯৯৯)[২১], রেখা সাহার লেখা India-Bangladesh Relations (২০০০)[২২], Smruti S Pattanaik এর সম্পাদিত 'Four Decades of India-Bangladesh Relations- Historical Imperatives and Future Direction (২০১২)[২৩], মোহম্মদ সেলিমের '*বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক (২০১৬)*[২৪], Robert G. Wirsing & Samir Kumar Das এর, 'Bengal's Beleaguered Borders: In there a fix for the Indian Subcontinent's Transboundary Problems? (২০১৬)[২৫], Sreeparna Banerjee, Ambalika Guha and Anusua Basu Roy Chowdhury, এর লেখা প্রবন্ধ 'The 2015 India-Bangladesh Land Boundary Agreement: Identifying Constraints and Exploring Possibilities in Cooch Behar (২০১৭)[২৬], Debarshi Bhattacharya "*Land Boundary Agreement; 2015 Between India and Bangladesh –A post Implication Analysis from India's Perspective*" (২০১৭)[২৭], রূপ কুমার বর্মণের গ্রন্থ '*Migration, State Politics and Citizenship: A Historical Study on India, Bangladesh and Bhutan*'(২০২০), The Enclaves of the India-Bangladesh Border: History, Statelessness and Bilateral Relations[২৮], সজল নাগ এর Nation and Its Modes of Oppression in South Asia (২০২২)[২৯], ইত্যাদি। ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল নিয়ে একাধিক গ্রন্থ কিংবা প্রবন্ধ লেখা হলেও, সীমান্ত সংক্রান্ত চুক্তির বিয়য়ে অস্পম্পূর্ণতা রয়ে গেছে।

এছাড়াও গবেষণা ধর্মী গ্রন্থের পাশাপাশি কথা সাহিত্য ও ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও ছিটমহল বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ, গল্প, সম্পাদিত বই লেখা হয়েছে।[৩০]

গবেষণার উদ্দেশ্য:

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্যে 'ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের জনজীবন ও তাদের ইতিহাস' প্রসঙ্গে দেশীয় রাজ্য থেকে স্বাধীনোত্তর পর্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে-

১। স্বাধীনোত্তর ভারত ও পাকিস্তান (পরবর্তী বাংলাদেশ) এর সীমানায় ছিটমহলের সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২। বিশ্বের একাধিক দেশ রাষ্ট্রহীন জীবনের ইতিহাস যা ব্যাক্তি অথবা সীমান্ত সমস্যার সাথে ওতপ্রত ভাবে যুক্ত। ভারত ও বাংলাদেশের মত স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ছিটমহল নিয়ে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পকর্কে তুলে ধরা হয়েছে।

৩। ছিটমহল সমস্যার সামধানকল্পে দুই দেশের সরকার গৃহীত পদক্ষেপ ও রাষ্ট্রহীন অধিবাসীদের আন্দোলন তাদের কিভাবে ছিটমহল বিনিময়ে রূপান্তরিত হয়েছিল তা উঠে আসবে।

৪। ছিটমহল বিনিময়ের ফলে দুই দেশের রাষ্ট্রহীন অধিবাসীরা রাষ্ট্রীয় পরিচিতি গ্রহণ করে। এই পরিচিতি গ্রহণের মধ্যদিয়ে সাবেকি ছিটমহল অধিবাসী ও বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কি পরিবর্তন হয়েছিল সেই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে।

৫। ভারতের মূল ভূখন্ডের যারা নাগরিকত্বের গ্রহণ করলেন তাদের দৈনন্দিন 'মনস্তাতিক দণ্ড ও প্রতিকূলতার' বিষয়গুলি ক্ষেত্র সমীক্ষায় দ্বারা তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্প:

বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতই ভারত ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রহীনতার মত সমস্যায় জর্জরিত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সীমান্ত চুক্তি নিয়ে দুই দেশ সমস্যা সমাধানে আগ্রহ দেখালেও তার প্রকৃত অবসান করতে ব্যর্থ হয়। দেশভাগের (১৯৪৭) পর বিচ্ছিন্ন দুটি রাষ্ট্র গঠন হলে সাবেকি ছিটের অধিবাসী ও বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা নব্য নাগরিকদের ক্ষেত্রে কিছু অসম্পপূর্ণতা রয়ে যায়।

ব্রিটিশ সরকারের নির্বাচত স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ্‌ের তত্ত্বাবধানে ভারত ও পাকিস্তানের হাতে সীমানা নির্ধারণের দ্বায়িত্বভার দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাহেব সৃষ্ট সীমানার চিত্রে কুচবিহার রাজ্যের শাসন অধীনস্ত ‘রাজওয়ারা’ ও মুঘল শাসনাধীনে থাকা ‘মোগলান’ নিয়ে উদাসীনতা থেকেই স্বাধীনতা পরবর্তী দুই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছিটমহলের জন্ম দেয়। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠনের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে আন্দোলনে সম্প্রসারিত হয় উভয় রাষ্ট্রেই। ২০১৫ সালে ৩১সে জুলাই ‘ছিটমহল বিনিময়ের’ ফলে যার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। সেই বিনিময়ের অভ্যন্তরে ছিল বিনিময় হয়ে আসা ‘নব্য নাগরিক’ ও ‘সাবেকি ছিটের’ মানুষেরা। এই নব্য নাগরিক ও সাবেকি ছিটের রাষ্ট্রহীনতার স্বপ্নপূরণে তাদের কতটা দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন এনেছিল তা নিয়ে গবেষণা সন্দর্ভে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

১. ১৯৪৭ সালের ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন দুটি রাষ্ট্র গঠন হলেও দুই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছিটমহলগুলির ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রই একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও পূনাঙ্গ সমাধান নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়।

২. ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রহীনতা ও বিশ্বের অনান্য রাষ্ট্রহীন অধিবাসীদের তুলনামূলক পার্থক্যগুলি আলোচিত হয়েছে।

৩. স্বাধীনোত্তর ছিটমহল সমস্যার জটিলতা ও উভয় রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক পদক্ষেপগুলি দেখানো হয়েছে।

৪. ছিটমহল জীবনের অভিজ্ঞতা (১৯৪৭-২০১৫) ও বিনিময় পরবর্তী জীবন সংগ্রাম তাদের নব্য নাগরিক ও সাবেকি অধিবাসীদের পরিচিয় করিয়েছে।

গবেষণারধর্মী প্রশ্নসমূহ:

উপরিউক্ত প্রকল্পকে সামনে রেখে গবেষণা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে।

(i) বিশ্বের বিভিন্ন ছিটমহলের প্রেক্ষিতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যবর্তী ছিটমহলগুলি কিভাবে সীমান্ত অবস্থিত ছিটমহলগুলি সীমান্ত সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে পরিনত হয়েছে?

(ii) ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা সমাধানে দেশ দুইটির মধ্যে সংগঠিত বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল?

(iii) এই সকল ছিটমহলে বসবাসকারী অধিবাসী নিয়ন্ত্রক দেশের (Host Country) ভূভাগে থাকাকালিন কিভাবে অবস্থান করেতেন এবং ছিটমহল বিনিময়ের পর তাদের অবস্থানের কি রকম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়?

(iv) এছাড়া বিনিময় পরবর্তী পর্বে মূল ভূখন্ডে ফিরে আসা মানুষ কিভাবে মূলজনস্রোতে ফিরে আসার প্রয়াস করে চলেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র কিভাবে অংশীদার হয়ে উঠেছে?

এই সকল প্রশ্নসমূহ বর্তমান গবেষণা পত্রটির আলোচ্য বিষয়।

গবেষণা পদ্ধতি:

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের পূর্ণতা দান করার জন্য মুখ্যত প্রাথমিক উপাদান ও সহায়ক উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে লেখা তথ্যগুলির ভিত্তিতে স্বাধীনোত্তর পর্বে ছিটগুলির চরিত্রগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ধরা পরবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ, দেশ-বিদেশের গবেষণাপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাধর্মী বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানের জন্য দেশের অভ্যন্তরে কিংবা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের গ্রন্থাগারে সংগ্রহীত গ্রন্থগুলি সহায়তা করেছে, যেমন- উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কুচবিহার), ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), রাষ্ট্রীয় সংরক্ষনাগার (কলকাতা), জাতীয় অভিলেখাগার (নতুন দিল্লী) প্রভৃতি এবং বাংলাদেশের আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর গনপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা) থেকে সংগৃহীত গ্রন্থগুলি অধ্যায়ণে উভয় রাষ্ট্রের ছিটমহলের অধিবাসীদের বাস্তবতাকে পরিচিতি করিয়েছে।

২০১৫ সালের বিনিময় পরবর্তী কালের ঘটনাবলির জন্যে ক্ষেত্র সমীক্ষার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। বিনিময় পরবর্তী সময়ে ছিটমহলের মানুষের জন্যে দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ী শহরে নির্মিত অস্থায়ী শিবির গুলোতে গিয়ে দীর্ঘদিন ক্ষেত্র সমীক্ষার সাথে যুক্ত থাকতে হয়েছে। এই সময়ে নাগরিকদের মৌখিক তথ্যাদি *(Oral Narrative)* সংগ্রহ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন নাগরিকদের অস্থায়ী শিবির ও ততসংলগ্ন স্থানে বসবাসের অভিজ্ঞতা নাগরিকদের কাছে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা গেছে। সরকার কেন্দ্রীক ছিটমহলের উন্নয়নে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল আদৌ তা কতটা সদর্থক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তা পরিমাপ করার জন্য পরিমানগত পদ্ধতি (*Quantitative Method*) এর ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ের সরকারি আদমসুমারির তথ্য, যথা- ১৯৬৬ সালে আদমসুমারী, ২০১০ সালে উভয় রাষ্ট্রের ছিটমহলের জনগণনার তথ্য, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর জেলার গেজেটিয়ার,

বিভিন্ন সাংগঠনিক পত্রিকা, বিভিন্ন সংগঠনের প্রচার পুস্তিকা, সংবাদ প্রতিবেদন, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রকাশিত লেখার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলির ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। ২০১৫ সালের বিনিময় পূর্বে ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যাদি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা, ছাড়াও প্রতিবেশী বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়েছে ।

অধ্যায় বিন্যাস:

ছিটমহল বিষয়ক বর্তমান সন্দর্ভটিকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই সন্দর্ভের ভূমিকাতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্য অভীক্ষা, গবেষণার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, গবেষণা পদ্ধতি ও প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রহীনতার উদ্ভব। এখানে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রহীন বিচ্ছিন্ন ভূভাগগুলির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। যা বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির অভ্যন্তরে থাকা রাষ্ট্রহীনতার সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের চরিত্রগত পার্থক্য ও তুলনামূলক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা চাকলাগুলি ছিটমহলে উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের ক্ষেত্রে ছিটমহলের রাষ্ট্রহীনতা ও তাদের মানবাধিকারের বিষয়টিকে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ছিটমহলের মানুষদের সংকটকে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের যে ভূমিকা নিয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া ছিটমহলের অভ্যন্তরে নাগরিকত্ব হীনতার স্বীকার হয়েছে বহু মানুষ। এই মানুষগুলো নিরাপত্তাহীনতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতীয় ছিটের থেকে

বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে। এই নিরাপত্তাহীন বাস্তুচ্যুত হওয়া অধিবাসীদের সংকটকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ২০১৫ সালে ৩১শে জুলাই মধ্যরাতে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি ও বিনিময় পরবর্তী '*নব্য নাগরিক*' ও '*সাবেকী ছিটের*' অধিবাসীদের জীবন সংগ্রাম ও তাদের অমীমাংসিত দাবিগুলি নিয়ে বিশদ বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক তত্বগত ব্যাখ্যার সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ছিটমহলের ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রয়োগ। বিশেষ করে ভারত ও বাংলাদেশের 'বিনিময় পরবর্তী' (২০১৫) ছিটমহলের মানুষের সমাজের দৈনিক চিত্র উঠে এসেছে। সরকারী বিভাগের নথিগুলি পর্যালোচনা ও সাবেকী ছিটের মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তনের দিকগুলি প্রত্যক্ষ করানোর জন্য আলোকচিত্র গুলি সংযোজনীতে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া দুই দেশ থেকে নিয়মিত প্রকাশ হওয়া দৈনিক সংবাদপত্র গুলির ভূমিকাও এই গবেষণাপত্রটিকে নিত্যদিনের প্রতিকূলতাকে সামনে নিয়ে এসেছে, যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যা গবেষণা সন্দর্ভে ব্যবহৃত প্রাথমিক ও সহযোগী উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে।

গ্রন্থপঞ্জি ও সুত্র নির্দেশ:

১. Breandan R. Whyte: '*Waiting for the Esquimo: An Historical and Democracy Study of the Cooch Behar enclaves of India and Bangladesh',* Melbourne, Australia, School of Anthropology, Geography and Environmental Studies; (University of Melbourne, *(2002)*, পৃ.৪।

২. https://ontology.buffalo.edu/smith/baarle.htm ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ১৫.১০.২০২৩) ।

৩. (Nivedita Das Kunda: Kaliningrad: Russian Enclave in the European Union, Strategic Analysis, Vol. 27, No. 4, Oct-Dec- 2003, পৃ.পৃ. ৬২৭।

৪. Carmen González Enríquez: Ceuta and Melilla: Clouds over the African Spanish towns. Muslim minorities, Spaniards`s fears and Morocco-Spain mutual dependence. Journal of North African Studies (Routledge) 2007.

৫. Breandan R. Whyte *(2002),* পৃ.৫ প্রাগুক্ত।

৬. দেবব্রত চাকী, ব্রাত্যজনের বৃতান্ত: প্রসঙ্গ ভারত বাংলাদেশ ছিটমহল; (সোপান, কলকাতা, ২০১১) পৃ. ১৬৬।

৭. Sreeparna Banerjee, Ambalika Guha, and Anusua Basu Roy Chowdhury, 'The 2015 India-Bangladesh Land Boundary Agreement: Identifying Constraints and Exploring Possibilities in Cooch Behar; (ORF, New Delhi, July 2017), পৃ. ১।

৮. G. W. S. Robinson; Exclaves, *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 49, No. 3, [Part 1] (Sep., 1959) ।

৯. P.P. Karan: A Free access to Colonial Enclaves, *Annals of the Association of American Geographers, 50* (June, 1960), অন্য একটি প্রবন্ধ The India-Pakistan Enclaves Problem, *Professional Geographers* 18 (1966) ।

১০. Honore Mark Catudal: 'Exclaves', Cahiers de Geographic de Quebec 18(43) 1974।

১১. Breandan R. Whyte: '*Waiting for the Esquimo: An Historical and Democracy Study of the Cooch Behar enclaves of India and Bangladesh',* Melbourne, Australia, School of Anthropology, Geography and Environmental Studies; (University of Melbourne), (2002) ।

১২. দেবব্রত চাকী, ব্রাত্যজনের বৃতান্ত: প্রসঙ্গ ভারত বাংলাদেশ ছিটমহল; (সোপান, কলকাতা, ২০১১) ।

১৩. Rup Kumar Barman, *The Origin and Evolution of the Enclaves of India and Bangladesh: A Historical Study'* (Avhijeet Publication, New Delhi) 2019।

১৪. Williem Van Schendel; '*Stateless in South Asia: The Making of The India-Bangladesh Enclaves',* The Journal of Asian Studies, Vol-61, No.1, (Duke University Press, ২০০২) ।

১৫. Jones, Reece: *Sovereignty and Statelessness in the border enclaves of India and Bangladesh, Political Geography,* 28 (2009).

১৬. Shewly Hosna Johan: '*life, the Law and the Politics of Abandonment Everyday Geographies of Enclave in India and Bangladesh';* (২০১২) ।

১৭. Rup Kumar Barman: *Contested Identity of Stateless Indians: A Study on the Chhitmahal-dwellers of India-Bangladesh Border Zones, (২০১৪)', 'The Proxy citizens of North Bengal A Study on the present condition of the people of Indian enclaves of Banfladesh* (২০১৪*), 'Statelessness and Struggle for Existence: Reflection on the Indian Enclaves Dwellers (1950-2017)'* (২০১৭), '*The Raidak A Transnational River: From Bhutan to Bangladesh Through India*'; Mittal Publication, ২০২১.

১৮. Partha Pratim Bose, The Indo-Bangladesh 'Enclaves' and a Disinherited People, Jadavpur Journal of International Relations, Vol-15, issue.1, (Sage Publication, ২০১১) ।

১৯. মোহম্মদ গোলাম রববানীর: '*বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহলঃ অবরুদ্ধ ৬৮ বছর,* প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, (২০১৭) ।

২০. রূপ কুমার বর্মণ, ছিটমহল বৃত্তান্ত: উত্তরবঙ্গের ছিটমহল ও ছিটমহলবাসীদের প্রান্তিকতার বিবরণ; *অন্তর্মুখ,* বাংলা গবেষণা পত্রিকা, পর্ব-৩, সংখ্যা-১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৩, ত্রৈমাসিক, সম্পাদনা- খোকন কুমার বাগ, ২০১৩।

২১. Joya Chaterjee, *'The Fashioning of Frontier: The Redcliffe line and The Bengal's Border Landscape 1947-52*'; Modern Asian Studies, UK, Vol-33, No.1, (Cambridge University Press, 1999).

২২. Rekha Saha, India-Bangladesh Relation;(Ph.D Thesis) S. Mukharjee, Calcutta, March 2000।

২৩. Smruti S Pattanaik, 'Four Decades of India-Bangladesh Relations- Historical Imperatives and Future Direction' *Security Dynamics and Bangladesh-India Relations*: Bangladesh Perspective, Author- Shaheen Afroze, 2012 Shaheen Afroze, *Security Dynamics, and Bangladesh-India Relations*: Bangladesh Perspective; পৃ.পৃ. ২১৯-২২০।

২৪. মোহম্মদ সেলিম: *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক,* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা), ২০০৯।

২৫. Robert G. Wirsing & Samir Kumar Das, 'Bengal's Beleaguered Borders: In there a fix for the Indian Subcontinent's Transboundary Problems?'; *The Asian Papers*, No.1, Center for International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service in Qutar, 2016.

২৬. Sreeparna Banerjee, Ambalika Guha and Anusua Basu Roy Chowdhury, 'The 2015 India-Bangladesh Land Boundary Agreement: Identifying Constraints and Exploring Possibilities in Cooch Behar; (ORF, New Delhi, July 2017) ।

২৭. Debarshi Bhattacharya, "*Land Boundary Agreement; 2015 Between India and Bangladesh –A post Implication Analysis from India's Perspective*" Quest Journal of Research is Humanities and Social Science, Vol-5, Issue -3. 2017.

২৮. Rup Kumar Barman: *Migration, State Politics and Citizenship: A Historical Study on India, Bangladesh, and Bhutan; Aayu Publication,* New Delhi, (2021),

The Enclaves of the India-Bangladesh Border: History, Statelessness and Bilateral Relations (2023) ।

২৯. Sajal Nag*: Nation and Its Modes of Oppression in South Asia*; (Routledge India, London), 2023।

৩০. Note- অধীর বিশ্বাস: *বর্ডার: বাংলা ভাগের দেওয়াল*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬., বরেন্দু মন্ডল, *ছিটমহলের গল্প*; সোপান, কলকাতা, ২০১৮, রাজর্ষি বিশ্বাসের দুটি গ্রন্থ; 'ছিটমহলের নতুন গল্প' (২০১৮) ও '*বেরুবাড়ি তিনবিঘা ছিটমহলঃ ইতিহাস*, জনজীবন, সংস্কৃতি' (২০১৮), গাঙচিল্, কলকাতা, রাকিব, *ছিটমহলের ভাষা: ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য*, (এম ফিল্) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, (২০২০-২০২১), মহম্মদ লতিফ হোসেন, *বাংলার কথা সাহিত্য ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল*; (পি এইচ ডি) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০২১।

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রহীনতার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানায় ছিটমহল সমস্যা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে থেকে মুক্তির পর স্বাধীন রাষ্ট্র (ভারত ও পাকিস্তান) নির্মিত হলে, এই বিচ্ছিন্ন ভূখন্ড সম্পর্কিত রাষ্টীয় কতৃত্বের ধারণা ও নীতির পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল। ফল স্বরূপ এই সকল ছিটমহলে রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতার বেড়াজাল দৃঢ় হতে থাকে।রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা ওই সকল বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের (ছিটমহল) মানুষের নাগরিক অধিকার খর্ব করতে শুরু করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯) পরবর্তীপর্বে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি যথা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকে। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রেক্ষাপট সকল রাষ্ট্রের জন্য এক রকম ছিল না। এই ভিন্নতার দিকটি কোথাও সার্বভৌম রাষ্ট্র, ধর্মীয় ভাবাদর্শ কিংবা ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্র নির্মাণের এই পর্বে প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রের একাধিক সমস্যা (Dispute) পরিলক্ষিত হয়।

ফলত, স্বাধীন রাষ্ট্রে গঠনের পাশাপাশি সীমান্ত সমস্যাকে (Dispute) কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণাধর্মী আলোচনা উঠে আসতে দেখা যায়। এই সকল গবেষণায় সীমান্তরে অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে একাধিক স্মৃতি, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, উদ্বাস্তু শিবির সম্পর্কীত পর্যালোচনা এবং সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু দেশভাগের সমসাময়িক পর্বে ভারত ও বাংলাদেশ (তৎকালীন পাকিস্তান) সীমানার অভ্যন্তরে ছিটমহলবাসীর রাষ্ট্রহীনতার সমস্যাগুলি নিয়ে তেমন ভাবে গবেষণা উঠে আসতে দেখা

যায়নি। ফলত, স্বাধীনতা পরবর্তী (১৯৪৭ থেকে ২০১৫) বছর ধরে দুই দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ছিটমহলের মানুষের রাষ্ট্রহীনতার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার দাবি রাখে।

ছিটমহলে বসবাসকারী অধিবাসীদের নাগরিকত্ব নিয়ে তৈরি হয়েছে বহুমূখী সমস্যা। ২০১৫ সালের পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই সমস্যা বাঁধার সৃষ্টি করেছিল। ফলত, উভয় দেশের সরকার ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বহুবার মুখোমুখি হয়। যার ফলে দুই দেশের মধ্যে একাধিক চুক্তি সাক্ষরিত হতে দেখা যায়, যেমন- নেহেরু-নুন চুক্তি (১৯৫৮), ইন্দিরা-মুজির চুক্তি (১৯৭৪), তিন বিঘা চুক্তি (১৯৯২) ও দুই দেশের যৌথ কর্মী গোষ্ঠী দ্বারা জনগনণা ইত্যাদি। সর্বশেষ ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশে থাকা ছিটমহলবাসীর রাষ্ট্রহীনতার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বিনিময়কে কেন্দ্র করে ৯৮৭ জন ভারতীয় ছিটমহলবাসী ভারতের মূল ভূখন্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক হয়। বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসীদের ক্যাম্পের দৈনন্দিন জীবন ও 'নব্য নাগরিকত্ব' গ্রহণের পর ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে একাধিক প্রতিকূলতার সন্মুখীন হতে হয়। এই গবেষণা পত্রটিতে রাষ্ট্রীয় চুক্তি ও ব্যাক্তি জীবনের বিষয়গুলি মূখ্য বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে।

'ছিটমহল' হলো এমন এক ভূখন্ড যা নিজ রাষ্ট্রের ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। অর্থাৎ, পাশাপাশি অবস্থিত দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যখন একটি দেশের কিছু ছোট ছোট জনপদ বা এলাকা অপর দেশের সীমানার মধ্যে থেকে যায় তখন ওই অঞ্চলকে প্রতিবেশী দেশের ছিটমহল বলা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার ভারত ও বাংলাদেশের ভূ-পরিসরে সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলির মধ্যে যথা পশ্চিমবঙ্গের, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিহাট, পঞ্চগড় প্রভৃতি জেলায় ছিটমহলের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

১.২. জাতীয়তা ও রাষ্ট্রহীনতার ধরণা:

অক্সফোর্ড শব্দকোষ (Oxford Dictionary) এর অনুযায়ী 'জাতীয়তা' বা 'Nationality' হলো 'The Status of Belonging to a particular nation', যার অর্থ একটি রাষ্ট্রের সাথে একটি ব্যাক্তির অন্তভূক্তিকরণ। যার ফলে সেই রাষ্ট্র ব্যাক্তির মানবাধিকার সুরক্ষিত করে এবং একই ভাবে সেই ব্যাক্তি রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। 'International Court of Justice' (ICJ) এর মতে জাতীয়তা বা নাগরিকত্ব একটি আইনী বন্ধন যেটি সামাজিক সংযুক্তিকরণ, পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।[১] প্রত্যেরকটি স্বাধীন দেশ নাগরিকদের সুরক্ষা ও মানবাধিকারের লক্ষ্যে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে, কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক সমস্যার কারণে সেই অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এই বঞ্চনার কারণে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রহীনতার উদ্ভব হয়। মূলত যে যে ভূ-রাজনৈতিক কারণগুলি রাষ্ট্রহীনতার জন্য দায়ী সেগুলি হলো - (a) রাষ্ট্রীয় সংযুক্তিগত কিংবা বিভাজনগত কারণে, বলপূর্বক বা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে দলগত অভিবাসন, (b) আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিবাহ; এবং (c) বিরাষ্ট্রীকরণের নির্দেশ।[২]

রাষ্ট্রহীনতার প্রেক্ষাপটে মুলত দুটি দিক উঠে আসে, 'De-Jure' ও 'De facto'।[৩] ১৯৪৫ এর সম্মেলনে (Convention) এ 'De-Jure' শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয় 'Stateless Persons is someone, who is not consider as a national by any state under operation of its law', অর্থাৎ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যাকে কোনো রাষ্ট্র তার আইনের অধীনে জাতীয় নাগরিক বলে গণ্য করে না।[৪] অপরদিকে 'De facto' রাষ্ট্রহীনতা শব্দটির উল্লেখ 'Final Act of 1961'- সম্মেলনে (convention) এ পাওয়া যায়। এই সম্মেলন অনুযায়ী 'De facto Stateless persons are persons outside the country of their nationality who are unable or for valid reasons are unwilling to able themselves of the

protection of that country।[৫] 'De facto' রাষ্ট্রহীন মানুষেরা নিজের দেশের ভৌগলিক পরিসীমার বাইরে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশি রাষ্ট্রের (Host Country) মূল ভূখন্ডের সীমানার অভ্যন্তরে অবস্থান করে। বস্তুত, এই মানুষেরা ১৯৫৪ সালের রাষ্ট্রহীনতার সম্মেলনে (Stateless Convention) এর আওতায় তাদের নিয়ে আসা হয়নি। ফলত, তাদের অধিকারগুলি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ওপর নির্ভরশীল। ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিটমহলগুলির ক্ষেত্রে যা ছিল খুবেই প্রাসঙ্গিক।

Uniter Nation High Commission for Refugees (UNHCR)-এর তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় এক কোটির ওপর মানুষ রাষ্ট্রহীন। এই রাষ্ট্রহীন মানুষদের জন্য সম্মেলনে (১৯৫৪) কিছু নূনতম 'দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক মান' (Standard of Treatment) নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সম্মেলন অনুযায়ী রাষ্ট্রহীন অধিবাসীদের প্রসঙ্গে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং শিশুশিক্ষার অধিকার সাধারণ নাগরিকদের মতই ভোগ করার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি একটি দেশে অ-নাগরিকরা (Non-Citizen) যে ধরনের অধিকারগুলি ভোগ করবে বলা হয়। যে অধিকারগুলি যথা, সমিতির অধিকার (Right of Association), কর্মসংস্থানের অধিকার (Right of Employment), এবং বাসস্থানের অধিকার (Right to Shelter) -ইত্যাদি।[৬]

উপরে উল্লেখিত অধিকারের বাইরে পরবর্তীকালে বহুবিধ আইন পাশ হয়েছে। নিম্নক্ত আইনগুলি রাষ্ট্রহীন নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় পরিচিতি নির্মাণে ও তাদের মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে-

- *International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 [Article 24 (3)]*

এই চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি শিশুর নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার আছে।[৭]

- *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 [Article 5 (d) (iii)]*

প্রতিটি মানুষ নাগরিকত্ব গ্রহণের অধিকার রাখে।[৮]

- *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979 [Article 9]*

প্রতিটি দেশ মাহিলাদের নাগরিকত্ব অর্জনে সম অধিকার প্রদান করবে। এবং বৈবাহিক সূত্রে বা তার স্বামীর নাগরিকত্ব জোর করে চাপানো যাবে না।[৯]

- *Convention on the Rights of the Child, 1989 [Article 7 & 8]*

প্রত্যেকটি শিশুর জন্মের পরে পরেই নিবন্ধীকরণ বাঞ্চনীয় এবং নামকরনের পাশাপাশি সেই শিশুর নাগরিকত্বের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে উপরিউক্ত রাষ্ট্রগুলি সেই শিশুর নাগরিকত্ব ও তার পারিবারিক পরিচিতি সংরক্ষনের জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ থাকবে।[১০]

- *Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006 [Article 18]*

রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের চলাফেরার স্বাধীনতা, তাদের বাসস্থান বাছাই করার স্বাধীনতা এবং নাগরিকত্বের অধিকারকে অন্যদের সাথে সমান যোগ্যতায় স্বীকৃতি দিতে অঙ্গিকারবদ্ধ হবে।[১১]

প্রতিটি রাষ্ট্র পরিচালনার একটি অন্যতম একটি দিক হলো সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নীতি। আবার কখন সেই রাষ্ট্র নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করার অধিকার রাখে। যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় কিংবা বহিঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তার ভৌগলিক পরিসরকে সুরক্ষা দেয়। তাই রাষ্ট্রের সাথে রাজনীতির ধারণা ওতপ্রত ভাবে জড়িত। প্রাচীন ইউরোপের শাস্ত্রে দুই প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি ব্যবস্থার একটি হল - স্বাধীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও অপরটি হল - পোপের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। প্রাচীন রাষ্ট্রীয় ধারনার পরিবর্তনের সাথে সাথে এই

বিষয়টি নতুন আঙ্গীকে নিজের সংঙ্গা নির্মাণ করে চলেছে। যে পরিবর্তনের সাথে জুড়ে আছে নাগরিক জীবনের অধিকার।[১২]

১৬৪৮ সালের ওয়েষ্টফেলিয়ার যুদ্ধ পরবর্তী ৩০ বছর ব্যাপী ক্রুসেডের যুদ্ধের (*Christian War*) এর মধ্য দিয়ে খৃষ্ট রাজার (*Christian King*) ভাবনার পরিবর্তন হয়ে পোপের শাসনে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের ক্ষমতা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল।[১৩] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেমন ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক শাসনের পরিবর্তন বিশ্বের বহুদেশকে নব উদ্ভুত হওয়া রাষ্ট্রগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। যে ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যাক্তির কর্ম ও তাদের অধিকারের বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়। এককথায় তাদের অধিকার সুরক্ষিত করাই ছিল সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রথম ধাপ। আবার এই রাষ্ট্র পরিচিতি ওতপ্রত ভাবে জড়িত ছিল তাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি। এর সাথে আন্তর্জাতিক দেশগুলি সমষ্টিগত ভাবে বিভিন্ন সংগঠনের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।[১৪] ১৯৪৫ সালে ২৪শে অক্টোবর গঠিত হয় সম্মিল্লিত জাতিপুঞ্জ *(United States).*[১৫] এই সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপে ১৩০ টি রাষ্ট্র একত্র হয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলন (*International Convention of Human Rights*) অনুষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার ১৫ নং ধারায় এ বলা হয় "*[e]veryone has the right to a nationality*" (সকলের নাগরিকত্বের অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়)।[১৬] কিন্তু যারা রাষ্ট্রহীন সে প্রসঙ্গে – *The State of Being Stateless* সম্পাদিত প্রবন্ধে রাষ্ট্রহীনতা নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে- "*For the purpose of this convention the term stateless person means a person who is not considered as national by any state under the operation of the law."*[১৭] তাহলে উপরে উল্লিখিত সংঙ্গার ভিত্তিতে বলাই যায় যে যারা রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নাগরিকত্বের আওতায় নেই তারাই রাষ্ট্রহীন। আবার হানা আরহেন্ট (*Hannah Arendt*) তাঁর গ্রন্থ *'Origin of Totalitarianism'*(১৯৫১)-এ উল্লেখ করেছেন *"Rightlessness synonymous to Statelessness"* তিনি কোন ব্যক্তির

অধিকারহীনতার জায়গাকে রাষ্ট্রহীনতার সমপূরক বলে তুলনা করেছেন।[১৮] ছিটমহলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় অধিকারহীনতার এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য।

'*Theory of Enclave'* গ্রন্থে লেখক *Evgeny Vinokurov* বিশ্বের রাষ্ট্রহীন অঞ্চলের পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের প্রসঙ্গটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তার ব্যাখ্যায় ২০১৫ সালের বিনিময়ের পূর্বে ভারতের ১৭১৬০.৬৩ একর ভূ-ভাগ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় মুল ভূখন্ডের অংশ রয়ে যায়। সেই সঙ্গে সেখানে বসবাসকারী অধিবাসীরাও হয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রহীন। ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ৭১১০.০২ একর ভারতে থেকে যায়। এছাড়াও অ্যাডভার্স পজিশনের ২৭৭৭.০৩৪ একর ভারতের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে ২২৬৭.৬৮২ একর বাংলাদেশের ভূ-ভাগ ছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক এক্তিয়ারের বাইরে।[১৯]

১.৩. রাষ্ট্রহীনতার সংজ্ঞায়িত ব্যাখ্যা: প্রসঙ্গ ছিটমহল

ছিটমহল বলতে যা বোঝায় তা হল মূল ভূখন্ডের রাষ্ট্রীয় সীমানার অংশ যখন অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই বিচ্ছিন্ন ভূভাগকে ছিটমহল বলে। তবে এই ছিটমহলের মানুষেরা রাজনৈতিক ও মানুসিক ভাবে মূল ভূ-ভাগের সাথেই যুক্ত থাকে। আবার 'Enclave' বলতে অন্যান্য তাত্ত্বিকরা বলেছেন এমন একটি রাষ্ট্র যা শুধু জলসীমা দ্বারা নির্দিষ্ট কোন একটি দ্বীপ নয়, তা অন্য রাষ্ট্র দ্বারাও পরিবেষ্ঠিত হয় কিংবা বহু রাষ্ট্র দ্বারাও পরিবেষ্ঠীত হতে পারে। ভৌগলিক রাজনীতির ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রহীনতার তত্ত্বগত ভাব অনুযায়ী বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের ভূ-ভাগ যখন কোন নির্দিষ্ট অন্য একটি বিদেশি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে তাকে রাষ্ট্রহীন অঞ্চল বা Enclave বলে।[২০]

Brendan R. Whyte বলেছেন *"Portion of Territory separated from the country to which it particularly belong and entirely surrounded by the alien*

domain".[২১] Enclave বা ছিটমহল হল এমন একটি অংশ যা মূলত প্রতিবেশী রাষ্ট্রে (Home Country) অথবা নিজস্ব ভূ-ভাগের বাইরে প্রতিবেশী রাষ্টের সাথে যুক্ত এবং ওই রাষ্ট্রের দ্বারাই পরিচালিত। যদি তারা সেই রাষ্ট্রহীন অঞ্চলটিকে নিজের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি না দেয় তাহলে তারা সমস্ত রকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ তাদের পক্ষে অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে 'অ-নাগরিক' হওয়ার দরুন মৌলিক অধিকারটুকু থেকে যাবে অধরা। যা একজন নাগরিকের অস্থিত্বকে অস্বীকার করার সমান। কারণ সে কোন এক রাষ্ট্রের পরিসীমার অভ্যন্তরে থেকেও রাষ্ট্রীয় পরিচয়পত্র থেকে বঞ্চিত হয়। এই ভাবে তাঁরা রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে।

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রহীনতার সংকটে অনেক দেশই এই সমস্যার মধ্যে জড়িত, যেমন- জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, ইতালী এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে (৫১টি বাংলাদেশি ছিট ও ১১১টি ভারতীয় ছিট) এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রসঙ্গত বলা যায় যে সংকট সৃষ্টির চরিত্রগত ভিন্নতা যেমন আছে, তেমনী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রহীন নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধতার দিকটিতেও বিভিন্নতা দেখা যায়।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২০১৫ সালের ছিট বিনিময় ভারতীয় উপমহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যেখানে ভূখন্ডের সাথে সংযোজিত হয়েছে বাস্তুচ্যুত মানুষের ইতিহাস। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নানা রকমের অস্থিরতা বারংবার মানুষের জনজীবনে পরিবর্তন এনেছে। এই অস্থিরতাগুলির মধ্যে রয়েছে দেশের বিভাজন, ঔপনিবেশিকতার অবসান (De-Colonisation), সেনা অভিযান অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তি। এই সমস্ত কারণগুলি আবার রাষ্ট্রহীনতার সাথে অঙ্গাঙ্গীক ভাবে যুক্ত। ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলকে কেন্দ্র করে আবার দেশভাগের স্মৃতি একই ভাবে তাদের জনজীবনের ওপর প্রভাব ফেলেছিল।[২২] ভারত ও

বাংলাদেশের রাষ্ট্রহীন নাগরিকেরা ছিটমহলবাসী রূপে নিজেদের প্রচলিত আত্মপরিচিতি তৈরি করেছে।

National Law University, New Delhi ২০১৪ সালে 'India and the Challenges of Statelessness' নামক একটি গ্রন্থে *UNHCR, The UN Refugee Agency* কাছে রাষ্ট্রহীনতার নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেন। এই গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী ভারতের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন প্রসঙ্গে *Assam Accord Act 1985, India-Cyelon Pact 1964* চুক্তি দুটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু ছিটমহলের অধিবাসীগণ রাষ্ট্রহীন হওয়ার ফলে তাদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে কোন আলোচনা উঠে আসেনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯৫৪ সালে *Convention relating to the Status of Stateless Persons* ও ১৯৬১ সালে *Convention relation on the Reduction of Statelessness* এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রহীনতার অবলুপ্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দীর্ঘ ব্যবধানে এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা যায়।[২৩]

ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের সীমানার অভ্যন্তরে পরিচিতিহীন রূপে বসবাসকারী মানুষেরা ছিটমহলের অধিবাসীরূপে চিহ্নিত হয়। যদিও এই অধিবাসীরা পূর্ব পাকিস্তান উদ্বাস্তু হিসাবে চিহ্নিত নয়। কিন্তু তাদের শাসন ক্ষমতা ও সরকার সবকিছু থাকলেও অন্য রাষ্ট্রের ভূপরিসরে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হওয়ার মত ঘটনা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার।

২০১৫ সালের পূর্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমানার অভ্যন্তরে ছিটমহলের মানুষেরা অবস্থান করতেন। এক্ষেত্রে সেই সীমান্ত চুক্তির পূর্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে (Host Country) ছিটমহলের অধিবাসীরা বহিঃরাষ্ট্রের অধিবাসীরূপে স্বীকৃতি ছিল। যা তাদের নিজ রাষ্ট্রের পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছিল। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংজ্ঞায় ভারত ও বাংলাদেশের

ছিটমহলের লোকেরা *'নিজ দেশ' বা 'নাগরিকত্ব'* হারায়নি। কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকায় বাস্তবিক অর্থেই তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রহীন। এই প্রতিকূলতার দরুন তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, উচ্ছেদ, হত্যা, চুরি ও একাধিক চরিত্রের নৃশংসতা ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলবাসীদের রাষ্ট্রহীনতার সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। সুতরাং, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বা বাংলাদেশী মৌলবাদীদের দ্বারা তাদের বার বার হুমকির মুখে পরতে হত। এই পরিস্থিতি তাদের একাধিকবার স্থানান্তর হতে হয়েছিল। কারণ তারা বিভিন্ন হিংসা বা মৌলবাদীদের দ্বারা হুমকির ফলে এই পথ গ্রহণে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাস্তুচ্যুত বা অভ্যন্তরীন অভিবাসনকেই বেঁছে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ তাদের সামনে ছিল না। ছিটমহলে যেহেতু অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাই ভারত সরকার ভারতীয় ছিটের অধিবাসীদের নিরাপত্তা দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে ছিল না। তাদের অনেকেই বাস্তুচ্যুত হয়ে আসার পরেও ভারতীয় মূল ভূখন্ডে *'ভারতীয় নাগরিক'* হিসাবে বিবেচ্য হয়নি। কারণ ভারতীয় মূলভূখন্ডের নাগরিকদের কাছে ছিটমহল থেকে আসায় *'শরণার্থী' বা 'অবৈধ অভিবাসী' বা 'অনুপ্রবেশকারী'* বলে মনে করা হত। বর্তমান সময়েও তাদের অনেকেই নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। দেশের মুল ভূভাগের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুত শরণার্থী বা Internal Displaced Persons হিসাবে আশ্রয় নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে অনেকেই।[২৪]

১.৪. বিশ্বের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রহীনতা:

ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল নাগরিকদের নিয়ে আলোচনায় তাদের রাষ্ট্রহীনতার পেছনে একাধিক কারণ উঠে আসতে দেখা যায়। যে কারণগুলির মধ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পাশাপাশি তাদের নাগরিকত্ব, অন্তঃদেশীয় অথবা বহিঃরাষ্ট্রীয় বিষয়ের পাশাপাশি চুরি কিংবা ডাকাতির মত সমস্যা নিয়ে পূর্বেই আলোচিত করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা শুধু যে ভারত ও

বাংলাদেশের মধ্যেই সীমিত ছিল তা নয়, এর বাইরে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে রাষ্ট্রহীনতার উদ্ভব হতে দেখা যায়। যা প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে জটিল আকার ধারণ করেছে। এই গবেষণাপত্রে ভারত ও বাংলাদেশের পাশাপাশি প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রহীনতা নিয়ে তুলনামূলক চর্চা করা হয়েছে। সেই সূত্র ধরে যেমন বিশ্বের রাষ্ট্রহীনতা চরিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে, তেমনি ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের ভিন্নতার জায়গাটি উন্মোচিত করবে।

২০১৫ সালের পূর্বে বিশ্বের মোট রাষ্ট্রহীন অঞ্চল বা অন্তঃদেশীয় রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন ভূভাগের সংখ্যা হল ২২৩ টি, এছাড়াও ৩২টি ছিটমহল পরিবেষ্টিত ছিটমহল (Counter enclave) ও ১ টি নিয়ন্ত্রক দেশ পরিবেষ্টিত ছিটমহল (Counter- Counter enclave). এই প্রসঙ্গে প্রতিরূপ ছিটমহলের বা Counter Enclave বলতে বোঝায় যখন একটি রাষ্ট্রের ভূখন্ড অন্য একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, কিন্তু আবার যদি সেই বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকা অংশের অভ্যন্তরে যদি মূল রাষ্ট্রের ভূভাগ থেকে যায় তবে তাকে ছিটমহল পরিবেষ্টিত ছিটমহল (Counter Enclave) বলে। আবার ঠিক একই ভাবে দেখা যায় নিয়ন্ত্রক দেশ পরিবেষ্টিত ছিটমহল (Counter -Counter Enclave)। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা যায় একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি অন্য রাষ্ট্রের অংশ থাকে, আবার ওই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রের ভূভাগ পরিবেষ্টিত হয়, তবে তাকে নিয়ন্ত্রক দেশ পরিবেষ্টিত ছিটমহল বা Counter Counter Enclave বলে।[২৫]

ছিটমহলের যে সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের নিরীখে আলোচিত হয়েছে বা উপস্থাপিত হয়েছে তা মূলত পশ্চিম ইউরোপ, পূর্বের USSR (Union of Soviet Socialist Republics) এবং এশিয়াকে কেন্দ্র করে। তবে পূর্বে যে নিয়ন্ত্রক দেশ পরিবেষ্টিত ছিটমহল (Counter-Counter Enclave) এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা মূলত কুচবিহারে বর্তমান।[২৬] বিশ্বের মোট ছিটের সংখ্যা

তুলনায় ভারত ও বাংলাদেশেই ছিল ৮০% শতাংশ ছিটমহল। এই ছিটমহলগুলির অবস্থান যদি লক্ষ্য করা যায় তা মূলত দুই রাষ্ট্রের সীমানায় অবস্থিত। এছাড়াও মধ্য এশিয়ার যে ভূখন্ডগুলি রাষ্ট্রহীন অবস্থায় আছে তার ৮ টি ভূখণ্ডের তা তিনটি আলাদা রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত (কিরগিজস্তান, উজবেকিস্থান, ও তাজাকিস্থান)।[২৭] যদিও মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থিত কিরগিজস্থানের কালাচার্চ সোক– এই ছিটের আয়তন সবচেয়ে বৃহৎ ২৩৬ কিলোমিটার। ভারত ও বাংলাদেশের কুচবিহারের যে ছিট ছিল তার মোট পরিমান হল ১১৯ কিলোমিটার যার তুলনায় কিরগিজস্থানের বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ।

আবার মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির একেবারে বাইরে পশ্চিম ইউরোপের নেদারল্যান্ড ও বেলজিয়ামের 'বেরেল-নাসার্ড' (Battle Bassau) এর ৭টি ছিট ও 'বেরেল- হারটোগা' (Barrle-Hertog) এর ১টি ছিটমহল দ্বারা পরিবেষ্ঠিত ছিট (Counter Enclave) ছিল। বিশ্বের রাষ্ট্রহীনতার আলোচনার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার ভারত ও বাংলাদেশের (১০২+৭১) টি ছিটমহলের জটিলতা ছিল একই ধরণের। এরফলে একাধিক মানুষ হয়ে পরেছিল রাষ্ট্রহীন। এই রাষ্ট্রহীনতার সংকটময় জীবন তাদের আন্দোলনমুখী করে তুলতে বাধ্য করেছিল।[২৮] এই বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ছিটগুলি সীমান্ত লাগোয়া হওয়ায় একাধিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হলেও তা ছিটমহলগুলির অবস্থাকে উন্নত করতে ব্যর্থ হয়। ফলত, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মত বিষয়ে সীমান্ত লাগোয়া ভূখন্ডে কাঁটাতারের সীমারেখা তৈরির নির্দেশ থাকলেও, দুই দেশের সীমানা লাগোয়া ছিটমহল থাকায় কিছু কিছু অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যার দরুন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কিংবা অবৈধ্য অনুপ্রবেশের মত ঘটনা দুই দেশের ক্ষেত্রে জটিল আকার ধারণ করেছিল। ভারত ও বাংলাদেশের পাশাপাশি বিশ্বের এই বিক্ষিপ্ত ভূভাগগুলির অভ্যন্তরে থাকা জনজীবনের সাথে সাদৃশ্য

ও ব্যতিক্রমী রাষ্ট্রহীন জীবনের তুলনামূলক পরিসর উঠে এসেছে। বর্তমান অধ্যায়ে ব্যতিক্রমী বিভিন্নতাকে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল।

১.৫. দক্ষিণ-পূর্ব, মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্রহীনতার প্রকৃতি:

বিশ্বের একাধিক দেশে রাষ্ট্রহীন ভূখণ্ডের তুলনায় ইউরোপ ও এশিয়ায় অধিক পরিমান রাষ্ট্রহীন অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়। ফলত, এই রাষ্ট্রহীনতাকে সঙ্গে নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমানা কেন্দ্রীক একাধিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলত, বহুরকমের সমস্যা যেমন তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে এশিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরে থাকা রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করে। এই সংঘগুলি আবার ছিল একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ। সেই সংঘগুলি যেমন- *Council of Europe (1949), Central Asian Union (1991), South Asian Association of Regional Cooperation (1985), The Association of South East Asian Nations (1961)* প্রভৃতি সংঘগুলি রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও তাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কিংবা কূটনৈতিক ভাবে তাদের আলোচনাকে প্রশস্ত করেছে। এশিয়া মহাদেশের তিনটি আন্তর্জাতিক সংঘকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যা ভারত ও বাংলাদেশের সমস্যাকে তুলনামুলক দৃষ্টিতে অনুভব করতে সহায়তা করবে। এই তিনটি সংঘ হল---

(১) দক্ষিণ এশিয়ার (SAARC) রাষ্ট্রগুলির নিরিখে

(২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (ASEAN) রাষ্ট্রগুলির নিরিখে

(৩) মধ্য-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির নিরিখে

১.৫.১. দক্ষিণ এশিয়ার (SAARC) অন্তভুক্ত রাষ্ট্র সমুহের রাষ্ট্রহীনতার প্রকৃতি:

দক্ষিণ এশিয়া মূলত ৮টি রাষ্ট্রের সমষ্টি। এই সকল রাষ্ট্রগুলি হল– ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তান, ও মালদ্বীপ। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারত আয়তনের দিক

থেকে সবচেয়ে বড় (৩,৩৮৭,২৬৭ কিমি.)। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। তবে তাদের রাষ্ট্রহীনতার চরিত্রগত রূপ গুলি ছিল ভিন্ন। ভারতের ইতিহাসে সীমানা নির্ধারণ হলেও নতুন রাষ্ট্রের নির্মাণে মাঝে দুই দেশের ব্রিটিশ বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) এর মাঝে পড়ে থাকা ছিটমহলের মানুষগুলো রাষ্ট্রহীনতারই অঙ্গ হিসাবে থেকে গিয়েছিল।[২৯] আবার ভুটানের অভ্যন্তরে নেপালী ভাষিক গোষ্ঠী অধিবাসীরা 'লুথামপাস্ ও নেপালের অভ্যন্তরে 'ভুপালী' উদ্বাস্তুরাও আজও রাষ্ট্রহীন।[৩০] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যারা পাকিস্তানের উর্দু ভাষাভাষী মানুষেরা রয়ে গেছেন। এখন পর্যন্ত দেশটিতে তারা রাষ্ট্রহীন রূপেই থেকে গেছে। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে জাঠ সম্প্রদায়, মালদ্বীপের ক্ষেত্রে যারা অমুসলিম (Non-Muslim) আজও তারা রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্বের স্বীকৃতি আদায়ে ব্যর্থ। একই ভাবে শ্রীলঙ্কার তামিল সম্প্রদায়ের যারা অভিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন অথবা কাজের জন্য গিয়েছিলেন তারাও ইতিহাসচর্চায় রাষ্ট্রহীন রূপেই বিবেচিত। ফলত, দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সবকটি দেশেই ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রহীনতার চরিত্রগুলি বিস্তারিত পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) বাংলাদেশ:–১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন বাংলা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সাথে দুই ধরনের রাষ্ট্রহীনতার শিকার হয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা অগণিত মানুষ। তার মধ্যে একটি হল সংখ্যালঘু উর্দুভাষী ও অপরটি হল বর্তমান বিশ্বে বহুচর্চিত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশকারী (মূলত বর্মা ও মালয়শিয়া থেকে আগত)। এই সমস্যার বাইরে আমাদের আলোচ্য গবেষণা পত্রটির সাথে খুবই আঙ্গিক ভাবে যুক্ত ছিটমহলের সমস্যাও। যার সাথে যুক্ত প্রায় ৫০ হাজারের উর্দ্ধে থাকা রাষ্ট্রহীন মানুষের জীবন।[৩১] বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ৩৭ বছর অতিক্রম হয়ে গেলেও প্রায় ৫ লক্ষ উর্দুভাষী মানুষ দেশের অভ্যন্তরে

শহরবাসী রূপে ক্যাম্পের মধ্যে অবস্থান নিয়ে আছে। ফলত, এরা প্রতি মুর্হূতে রাষ্ট্রহীনতার দরুন সাধারণ নাগরিক জীবনের চাহিদাগুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে।

১৯৪৭ সালের পর কিছু সংখ্যক উর্দভাষী মানুষ পূর্ব-পাকিস্তানেই থেকে যায়। এর ফলে এই সকল অঞ্চলে উর্দুভাষী ও বাংলাভাষী মিলে এক মিশ্রভাষী শ্রেনী তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের কাছে দেশভাগের স্মৃতিতে তারা আজও শত্রুস্বরূপ। তার ফলে আজও বাংলাদেশ সরকার এদের অনেককেই নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়নি। এই উর্দু ভাষাভাষী পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষেরাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাগরিকত্বহীনতায় দিন অতিবাহিত করছে। তবে ২০০৮ সালে বাংলাদেশের হাইকোর্টের রায় অনুসারে কোনো উর্দুভাষী পরিবারে সন্তানের জন্ম যদি হয় তবে তার পিতামহ যদি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে "By operation of Law" এর Act অনুসারে তাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গ্রহন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমসাময়িক সময়ে উর্দভাষী রাষ্ট্রহীন ব্যাক্তিদের পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ২৮০০০ রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষ রাষ্ট্রহীন রূপে বাস করছে। ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Law) অনুসারে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন বা বহিঃরাষ্ট্রীয় অধিবাসী বলে ঘোষনা করা হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্থায়ী শিবিরের বাইরে ২ লক্ষ কিংবা তারও বেশী রোহিঙ্গারা চলাফেরা করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে মূলত দুবার এই রোহিঙ্গারা বহিঃরাষ্ট্রীয় হয়ে আসে, প্রথম অভিযান ১৯৭৮ সালে এবং দ্বিতীয়বারের অভিযানটি হয়েছিল ১৯৯১-৯২ সালে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলটি বর্মার সীমানার নিকটে হওয়ায় তারা সেই পথে অনুপ্রবেশ করে। এই দুটি রাষ্ট্রের আলোচিত পরিসরের বাইরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৩৭,০০০ ভারতীয় ছিটমহল অধিবাসী রয়েছেন। ২০১৫ সালের পূর্বে যারা ছিল রাষ্ট্রহীন বা

ছিটমহলের অধিবাসী রূপে পরিচিত হত। বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের মধ্যে অবস্থান করলেও তারা মানুসিক ভাবে ভারতীয় হিসাবে নিজেদের সম্পর্ক বজায় রেখেছে।[৩২]

(খ) ভুটান:- দক্ষিণ এশিয়ার হিমালয় সংলগ্ন রাষ্ট্র ভুটান। এই রাষ্ট্রটির আয়তনে ছোট হলেও সেই দেশের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা বর্তমান। যা ভুটানের অভ্যন্তরীন সমস্যার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। এই অস্থিরতার মাঝে রাষ্ট্রহীনতার মত বিষয়টি ভুটানেও গুরত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দক্ষিণ এশিয়ার নেপাল ও ভুটান ছোট রাষ্ট্র দুটির মধ্যে অনুপ্রবেশ নিয়ে বহুবার একে অপরের প্রতি আলোচনা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভুটান সীমান্তের সাথে উত্তরে চীন, পূর্ব-পশ্চিমে ও দক্ষিণাঞ্চলে ভারতীয় সীমানা যুক্ত। হিমালয়ের কোলে ভুটানের অভ্যন্তরে নেপালী ভাষাভাষী অধিবাসীদের রাষ্ট্রহীন রূপে চিহ্নিত করেছে এই প্রসঙ্গে ভুটানের অভ্যন্তরে যারা নেপালি ভাষায় কথা বলে তাদের স্থানীয় ভাষায় লুথাম্পাস (*Lhotsampas*) বলা হয়।[৩৩]

১৯০৭ সালে ভূটানের রাজা জ্ঞালংস ওয়াংচুক (Ngalongs Wangchunk) শাসনের দ্বারা পাহাড়ের কোলে ছোট দেশটি রাজতান্ত্রিক শাসনে পরিচালিত হত। এই তিব্বতী রাজা উনবিংশ শতাব্দীতে নেপালি বা নেওয়ারী পরিবারকে তিব্বতী মঠ নির্মাণের জন্য নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমী ও মধ্য ভুটানের কিছু কিছু গ্রামের বসতি তৈরি করে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন শুরু করে। ১৯৮০ সালের পর ড্রুকপা (Drukpa) সংস্কৃতির মধ্যে লুথাম্পাস (Lhotsampas)-রা (নেপালী ভাষী) অধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। ১৯৮৫ সালের 'নব্য নাগরিকত্ব আইন' (*New Citizenship Act*) পাস হয়। ভুটানের দক্ষিণের জেলা গুলোতে লুথাম্পাস (*Lhotsampas*)- দের জনসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশি। এই আইনী স্বীকৃতির পর ভুটানের অভ্যন্তরে থাকা ওই সকল নাগরিকদের ভুটান সরকার নাগরিকত্ব থেকে বহিষ্কার করে।

এছাড়াও ভুটান সরকার পক্ষ থেকে আরো বলা হয় ১৯৫৮ সালের ৩১ সে ডিসেম্বর এর আগে যদি জমির রাজস্ব দিয়েছে এমন কোনো কাগজ দেখাতে পারে তবে তারা ভুটানের অধিবাসী হিসাবে গণ্য হবে। আর যারা রাজস্বের কাগজ দেখাতে অসমর্থ হবে তাদের অবৈধ নাগরিক (Illegal Immigrant) হিসাবে ধরা হবে।[৩৪]

AHURA (Association of Human Rights Activities Bhutan) তথ্য অনুসারে, ভুটানের মধ্যে থাকা লুথাম্পাস (Lhotsampas) দের প্রতিকূলতাকে তুলে ধরেছিলেন। ভুটানের মূল অধিবাসীরা নেপালী ভাষীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন ' এক রাষ্ট্র ভুটানের মানুষের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচিয়, ভাষা ও ধর্মীয় পরিচিয় একটিই হবে' ফলে তারা বলতেন 'একরাষ্ট্র এক নাগরিকত্ব' (One Nation One People)। এই উক্তির মধ্য দিয়ে নেপালিভাষী ভুটানের অধিবাসীরা আরো বেশী করে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তবে তারা এই টুকু করেই থেমে থাকেনি। ভুটানের নাগরিকরা সচেতন ভাবে ভুটানের সরকারী ভাষা ড্রুকপা, ড্রুকপা পোষাক, ড্রুকপা ধর্মীয় প্রভৃতি অনুশীলন করেন। এছাড়াও নেপালিভাষী লুথাম্পাস (Lhotsampas) দের যে স্কুলের পাঠ্য পুস্তকগুলি ছিল তা পুড়িয়ে ও বিনষ্ট করে দেয়।[৩৫] কিন্তু UNHCR এর সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত *Convention Relating to the Status of Stateless Person এর Article 3 তে বলা হয়েছে 'Non-Discrimination The contracting states shall apply the provisions of this convention of Stateless person without discrimination as to race, religion or country of origin'.*[৩৬] এই উপরিউক্ত আইনের দ্বারা যে বঞ্চনার থেকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কথা বলা হলেও তা কিন্তু ভুটানের লুথাম্পাস (Lhotsampas) দের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা দিতে এই আইনী স্বীকৃতি ব্যর্থ হয়। যার ফল স্বরূপ বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষের ওপর নেপালিভাষী ভুটানের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রহীন হয়ে প্রতিকুলতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছে।[৩৭]

(গ) নেপাল:- দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের সংলগ্ন আর একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই রাষ্ট্রটিও রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা থেকে মুক্ত ছিল না। ১৯৯৫ সালের সরকার কতৃক তথ্যের ভিত্তিতে নেপালে মোট ৩.৪ থেকে ৫ মিলিয়নের মত অধিবাসী আজও রাষ্ট্রহীন। কিন্তু নেপাল সরকার নাটকীয় ভাবে ২.৬ মিলিয়ন রাষ্ট্রহীন নাগরিককে আড়াল করে রেখেছে। এই রাষ্ট্রহীন নাগরিকেরা মূলত তিব্বত ও ভুটান থেকে এসে স্থায়ী হয়েছে। এছাড়াও দেশে প্রায় ২০০০০ এর মতো তিব্বতী উদ্বাস্তু বসবাস করছে। এই রাষ্ট্রহীন মানুষেরা মূলত নেপালের রাজধানী কাটমান্ডু-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করে।[৩৮]

উপরে উল্লিখিত আলোচনায় ১৯৮৫ সালে ভুটানে গমনকারী নেপালি ভাষাভাষী যাদের Lhotsampas বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Rights) বঞ্চিত হওয়ার পর তারা আবারও নেপালে আশ্রয়ের জন্য ফিরে আসে। এই ফিরে আসা লুথাম্পাস (Lhotsampas) রা নেপালের দক্ষিণাংশে মূলত, ঝাঁপা জেলায় অধিক পরিমাণে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে। এই স্থায়ী হয়ে ওঠা অধিবাসীদের নেপালি ভাষিকদের স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'ভুপালী'।[৩৯]

১৯৯০ সালে UNHCR তথ্যে জানা যায় নেপালের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে থাকা নেপালিভাষীরা ভুটানের থেকে ফিরে আসায় নেপালি অধিবাসীদের জন্য ভুটান উদ্বাস্তু শিবির (Bhutanese Refugee Camp) তৈরি করা হয়।[৪০] ১৯৯১ সালের পর ২৬,০০০ যে ভুপালী উদ্বাস্তু ছিল তাদের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৯৬ সালে ক্যাম্পে থাকা মোট উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাড়ায় ৯০,৭০০ জন।[৪১] তাদের অবস্থা এতটাই করুণ যে দেশের অর্থনীতি অনেকাংশ তাদের কল্যানের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। এই পরিকল্পনার ফলে নেপালের মত ছোট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিও ক্ষতির শিকার হয়। তবে নেপাল সরকারের দ্বারা এই অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্য থাকা

মানুষদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়নি। এই অস্থায়ী রাষ্ট্রহীন মানুষগুলি আবার তিব্বত, ভুটান কিংবা চিনে স্তুপ মন্দির নির্মাণের কাজের সাথে যুক্ত হতেন।[৪২] যদিও রাষ্ট্রহীনতার দরুন তাঁরা মধ্যে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পায়নি। ফলত, তাদের ছোটখাটো কাজের মধ্য দিয়েই দৈনন্দিন জীবন অতিবাহীত হত। রাষ্ট্রহীন থাকায় তাদের সরকারি ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হত না। এছাড়া মানবাধিকারের যে মৌলিক চাহিদা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি থেকে এরা ছিল বঞ্চিত।[৪৩] ফলত, United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) এর তথ্যের ভিত্তিতে ২,০০,০০০ এর মতো নেপালী মেয়ে ও নারী বিকল্প কাজের সন্ধানে ভারত সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পাচার হয়েছে।[৪৪] আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি আইনত দিক থেকে এগিয়ে আসেনি। তাই এই সমস্যার অন্যতম দিক থেকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মুখ্য পর্যায়ে দায়ী। যে রাষ্ট্রহীনতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার সাথে একথা নিশ্চিত রূপে বলা যায় যে নেপালের মত ছোট দেশটিও আজকের বিশ্বে রাষ্ট্রহীনতার প্রকপ থেকে মুক্ত হতে পারে নি। ফলত, রাষ্ট্রহীনতায় তৈরি হওয়ায় তাদের অনৈতিক নানান কর্মের সাথে জর্জরিত হয়ে পরার পেছনে অন্যতম কারণ বলা যায়।

(ঘ) শ্রীলঙ্কা:- ১৯০২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ব্রিটিশদের শাসনাধীনে ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ভূভাগে দক্ষিণ ভারত থেকে কফি চাষের জন্য বহু শ্রমিককে নিয়ে আসা হয়েছিল এই ব-দ্বীপে। যার ফল স্বরূপ শ্রীলঙ্কার মত দ্বীপে রাষ্ট্রহীনতার সূচনা হয়।[৪৫] ১৯৪৮ সালে স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের পর ভারতীয় তামিল ভাষাভাষীক তাদের 'Home Land' বা স্বদেশে ফিরে আসতে অস্বীকার করে। তবে ১৯৬২ সালে ভারত সরকারের দ্বারা ১,৩৪,১৮৮ জন মানুষকে Citizenship Under Act. এর আওতায় নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।[৪৬] এরপরেও রাষ্ট্রহীনতা সম্পর্কিত সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয়নি।

১৯৬৪ সালে তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্র প্রধান শ্রীরিমাভো বান্দারানায়কের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়। এর ফলে ভারত সরকার ৫,২৫,০০০ জনকে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং একই সঙ্গে ৩০,০০০ জনকে শ্রীলঙ্কার সরকার নাগরিকত্ব প্রদান করে।[৪৭] ১৯৮৮ সালে শ্রীলঙ্কা সরকারের ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে Grant of Citizenship of Stateless Person (Special Provision) Act No. 39 of 1988 পাশ করে। এই আইনে বলা হয় ৩০সে অক্টোবর ১৯৬৪ সালের পূর্বে কোন ব্যাক্তি যদি শ্রীলঙ্কার অধিবাসী হিসাবে নিজেকে প্রমানিত করে, তবে তাকে শর্তহীন ভাবে শ্রীলঙ্কার সরকার নাগরিকত্ব প্রদান করবে। যদি কোন কারণে সে ব্যাক্তি দেশ পরিত্যাগ করে পূনরায় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানায়, তবে সেই ব্যাক্তিকে Section 2A Act. 39 এর ভিত্তিতে ১৯৬৪ সালের পূর্বে সে শ্রীলঙ্কার অধিবাসী ছিলেন তার প্রমান জমা করতে হবে।[৪৮]

এছাড়াও ভারতীয় বংশোদ্ভুত এবং শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রহীন তথা নাগরিকত্বের বাইরে থাকা ২০০ জন চীনের অধিবাসী যাদের জন্মস্থান ছিল শ্রীলঙ্কায়। এদের মধ্যে যারা শ্রীলঙ্কার জন্মের প্রমান পত্র দিতে ব্যর্থ হয় তাদের রাষ্ট্রহীন বলে ঘোষনা করা হয়। যদি কোন অধিবাসী তাদের পিতামহের জন্ম শ্রীলঙ্কা হয়েছিল প্রমাণ দিতে পারে তাদের পাসপোর্ট, সরকারী নথিপত্র বহাল থাকলেও ২ বছর পর তাদের পুনঃনর্বীকরণ করতে বলা হয়েছে।[৪৯] ফলত, কোথাও ভারতীয় বংশভূত তামিল অথবা চীনের নাগরিকরা দক্ষিণ এশিয়ার ছোট এই ব-দ্বীপে রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা থেকে মুক্ত ছিল না।

(ঙ) আফগানিস্তান:- ১৯৮৫ সালে South Asian Association For Regional Cooperation (SAARC) এর প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে আফগানিস্তান সংযুক্ত হয়নি। ২০০৫

সালে আফগানিস্তান প্রথম SAARC-এর সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৪ সালের Status of Stateless Persons ও ১৯৬১ সালে Convention on the Reduction of Statelessness এর যোগদানকারী রাষ্ট্র হিসাবে ও উক্ত সংস্থাগুলির আফগানিস্তান চুক্তিবদ্ধ ছিল না। UNHCR এর তথ্যের ভিত্তিতে আফগানিস্তানে মূলত জাঠ সম্প্রদায়ের নাগরিকত্বের সমস্যা নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে আছে যোগী, চোরি ফোরসে ও গরব্যাট সম্প্রদায়। ২০১৩ সালের UNHCR এর তথ্যতে এই সম্প্রদায়গুলির প্রান্তিকতা ও প্রতিকূলতাকে তুলে ধরা হয়। যা আফগানিস্থানের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রহীন অধিবাসী ও তাদের নিরাপত্তাহীনতার মত বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করেছে।[৫০]

(চ) মালদ্বীপ:- মালদ্বীপের মত ছোট দেশটিতে প্রায় ৩ লক্ষ্যের মত মানুষ ছিল উদ্বাস্তু। যার মধ্যে প্রায় ৫০,০০০ হাজারের মত উদ্বাস্তু অনিয়মিত কাজের সাথে যুক্ত। এদের বেশিরভাগ মূলত বাংলাদেশ থেকেই আগত। এছাড়াও ভারতের অভ্যন্তরে বহু রাষ্ট্রহীন নাগরিক যারা তথ্যহীন অবস্থায় মালদ্বীপ থেকে অভিবাসিত হয়েছে। তাদের অনেকেই আজ অর্থের অভাবে বিভিন্ন স্বল্প মজুরীর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে (Cheap Labour) নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের সাথে যুক্ত আছেন । যদিও এই দেশটি ১৯৫৪ সালে Status of Stateless Persons ও ১৯৬১ সালে Convention on the Reduction of Statelessness সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে নিযুক্ত ছিল না।

মালদ্বীপ ছিল মূলত মুসলিম ধর্মীয় রাষ্ট্র তাই অমুসলমানরা নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল, তেমনি অন্য জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সেই সমর্থক সিদ্ধান্তই নেওয়া হত। এক অর্থে মালদ্বীপের রাষ্ট্রীয় ভাবনার মধ্যে ধর্মীয় ভাবানার একটা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই দেশের নাগরিকত্বের বিষয়ে দেখা যায় যে কোন মালদ্বীপের নারীকে যদি কোন পুরুষ বিয়ে করতে চায় তবে তাকে ধর্মীয়গত ভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হতে হবে অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

করতে হবে। আর যদি কোন মালদ্বীপের পুরুষ অন্য কোন রাষ্ট্রের খ্রীষ্টান অথবা জিউস ধর্মালম্বী নারীকে বিয়ে করে তবে সেই নারীকে তার পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। আবার যদি কেউ ওই রাষ্ট্রের ধর্মীয় ভাবনার ওপর আঘাত হানে তবে সেই ব্যাক্তির নাগরিকত্ব পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হতে পারে।[৫১] এছাড়াও মালদ্বীপ যেহেতু সমুদ্র সংলগ্ন একটি রাষ্ট্র তাই জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সাথে বহু মানুষ সাথে সাথে বহু মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর হতে বাধ্য হয়। United Nation Human Rights Council Commission এর তথ্যের থেকে জানা যায় যে মালদ্বীপে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১২ হাজার দ্বীপ আছে। মালদ্বীপ ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন 'রাষ্ট্রহীনতার' একটি অন্যতম কারণ ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে অনেক ক্ষেত্রে তারা দ্বীপ ত্যাগ করে অন্যত্র দ্বীপে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এই সকল কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষরা অন্য দ্বীপে গিয়ে আইনগত সমস্যার সন্মুখীন হতেন।

(ছ) ভারত:- দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও আয়তনে বৃহত্তম রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত ভারত। এই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রহীনতার ও বাস্তুচ্যুতির মত ঘটনা ইতিহাসে বার বার উঠে এসেছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় সংখ্যালঘু ছোট ছোট জাতিগুলো ভীষন ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশের অংশ (পূর্বতন পাকিস্তান)-এর চট্রগ্রামের পার্বত্য এলাকার প্রায় ৩০,০০০ হাজার চাকমা এবং হাজো সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভারতের অরুণাচলপ্রদেশে অভিবাসিত হয়ে আছে।[৫২] এই সময় বহু শিশুও দেশান্তরের ফলস্বরূপ তারা আজও নাগরিকত্ব পায় নি। বর্তমানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দরুন প্রায় ৬৫,০০০ চাকমাদের নাগরিকত্বকে মঞ্জুর করেছে ভারত সরকার। যারা আজ নাগরিক অধিকারে ভোটদানের সুযোগ পয়েছে। আবার স্বাধীনতার সমসাময়িককালে চলে আসা প্রায় ২০,০০০ পাকিস্তানী যারা আজও রাষ্ট্রহীনতার শিকার। ভারত সরকারের ১৯৫৫ সালের Indian Citizenship Act ও ১৯৬৫ সালের Citizenship Rule-এর প্রয়োগ করেন। এই আইন অনুয়ায়ী পাকিস্তানের সীমানা অধ্যুষ্যিত যে সমস্ত অধিবাসীরা ৫

বছর ভারতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে, তাদের নাগরিকদের দিকটি শিথিল করা হয়।[৫৩] এই রাষ্ট্রহীনতার বিষয়টি নিয়ে নানা মহলে আলোচনা হলেও ভারতের ক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষনাধর্মী গ্রন্থটিতে যে বিষয়টি স্থান পেয়েছে তা হল ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল যা দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রহীনতার সাথে আঙ্গাঙ্গীকভাবে যুক্ত।

১.৫.২. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রহীনতা:

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রহীনতার চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। এই রাষ্ট্র সমষ্টির অভ্যন্তরে কখনো জাতিগত কিংবা কখনো সম্প্রদায় বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। ফলত এই সকল অধিবাসীদের অভিবাসনগত কারণে রাষ্ট্রহীনতার সৃষ্টি হতে দেখা হয়। তাদের ক্ষেত্রে যেমন সম্প্রদায়গত পাথক্যের পাশাপাশি তাদের সতন্ত্র ভাবে পরিচিতি পাওয়ার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বর্মা, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা বর্তমান। সংখ্যার দিক থেকে স্বল্প হলেও রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে থাকা মানুষেরা নাগরিকত্বহীনতার পরিচয় বহন করে চলেছে।

১৯৮২ সালে বর্মার নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Law) অনুসারে রোহিঙ্গাদের অ-নাগরিক (Non-National) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে যা আবার বিশ্বচর্চায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে। বর্মার নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Law) অনুসারে নাগরিকত্বকে তিন ভাগে ভাগ তাদের দেশের নাগরিকত্ব কে নির্দেশ করা হয়েছে- (a) বর্মার পূর্ণ নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে বলা হয়, ১৮২৩ সালের পূর্বে বর্মায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের বংশধর বা যারা সেই সময় জন্মে ছিলেন। (b) বর্মায় সংশ্লিষ্ট নাগরিক তাঁরাই যারা ইউনিয়নের নাগরিকত্ব

আইন আনুযায়ী ১৯৪৮ সালে নাগরিকত্ব গ্রহণ অর্জন করেছেন, ও (c) দেশীভূত নাগরিক তাঁরা যারা ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৮ সালের আগে বর্মায় বসবাস করতেন এবং ১৯৮২ সালের পরে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এই তিনটি বিভাগের কোন একটিতেও রোহিঙ্গারা আইনের আওয়াভুক্ত না হওয়ার নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির শিকার হওয়া ভিয়েতনামের অভিবাসীদের কম্বোডিয়ার সরকার নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করে।[৫৪] এই পরিস্থিতিতে কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে তারা মানবাধিকারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। মূলত কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে খমের খোম (Khmer kho'm) জাতিগোষ্ঠীকে সেই দেশের সরকার নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। একই রকম ভাবে ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে চীনা জনগোষ্ঠীর অধিবাসীদের আজও নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর একটি ছোট রাষ্ট্র মালয়েশিয়া। সেই ক্ষেত্রে পূর্ব উল্লেখিত বর্মার প্রসঙ্গে রোহিঙ্গাদের বিষয়টিও মালয়শিয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা একই রকম। রোহিঙ্গারা ১৯৮৪ সালে মালয়েশিয়ায় আসে, ১৯৯২ সালে বর্মার সামরিক শাসনের কঠোরতার কারণে তাঁরা বাস্তুচ্যুত হয়ে মালয়েশিয়ার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাদের কাছে নাগরিকত্বের কোন পরিচয়পত্র ছিল না। তবে মালয়শিয়ার সরকার প্রথম অবস্থায় তাদের জন্য কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। যার ফলে থাইল্যান্ডের মত ছোট দেশে সামরিক কঠোরতার প্রভাবে রাষ্ট্রহীন হয়ে আসা ব্যক্তিদের পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ থেকে ৩.৫ মিলিয়ন মানুষ নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

২০০৬ সালে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রায় এর সময়ে ২ লক্ষ রাষ্ট্রহীন মানুষকে নাগরিকত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও তিনি রাষ্ট্রহীন শিশুদের জন্য শিক্ষা

গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে ৯৫৮০ জন জন্মসূত্রে চীনের নাগরিক ছিলেন। তাঁরা কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামে আসার পর তাদেরকে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭০ সালে খামের রুজ (Khmer Rouge) এর শাসনকালে যে নৃশংসতা চালানো হয়েছিল তার ফলে প্রায় ১০,০০০ এর মতো উদ্বাস্তু কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামে আশ্রয় গ্রহণ করে। ২০০০ সালে UNHCR তত্ত্বাবধানে ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মধ্যে এবিষয়ে আলোচনার হয়। ফলস্বরূপ, ২০০৭ সালের মধ্যে এই উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা হয়। যদিও তার বাইরে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহারন স্বরূপ তাইওয়ানে চীনের অভিবাসীরা তাইওয়ানীজ্ মেয়েদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারলেও, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে তা একেবারেই গ্রহণীয় হবে না বলে উল্লেখ করা হয়।[৫৫]

দক্ষিণ-পূর্বে অন্য একটি ছোট রাষ্ট্র লাওস। রাষ্ট্রহীনতার প্রসঙ্গে লাওসের নাগরিকত্বের কথা তাদের দেশের সংবিধানের ১৩নং ধারায় বলা হয়েছে। কোন সন্তান জন্ম হলে তার পিতা মাতার নাগরিকত্ব লাওসের হতে হবে। যদি তা না হয় তবে পিতা- মাতার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় ভাবে সেও রাষ্ট্রহীন রূপে চিহ্নিত হবে। তবে সরকার চাইলে ওই রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিটিকে নাগরিকত্ব প্রদান করার অধিকার রাখে। যদিও নাগরিকত্বটি গৃহিত হয় তবে রাষ্ট্রের স্বার্থের নীরিক্ষে তাঁর নাগরিকত্ব অধিগ্রহণের প্রশ্নটি বিচার সাপেক্ষ্য।

ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রহীনতা স্বাধীনতার সাত দশকে যেমন বিশ্বের কাছে অজানা নয়, তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির কাছে রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা প্রায় সবকটি দেশেই চরম আকার ধারণ করেছে। রাষ্ট্রহীনতার চরিত্রগত দিকটি আলাদা আলাদা হলেও এই প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে তাদের মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়টি ছিল উপেক্ষিত। যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রহীনতার চরিত্রকে বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করেছে।[৫৬]

১.৫.৩. মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রহীনতা:

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মত রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতেও দেখা যায়। যে রাষ্ট্রহীনতার সাথে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরিচিতিহীন ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় আত্মপরিচয় ও মানবাধিকার ছিল অতপ্রত ভাবে জড়িত। তাই পূর্বে যেভাবে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেভাবেই মধ্যএশিয়ার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রহীনতার প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে (United Nation) এই দেশগুলির সমস্যা নিয়ে কম-বেশি জানানো হলেও স্বাধীনতার পূর্ব থেকে সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে আজও ব্যর্থ।

আলোচ্য অধ্যায়ে মধ্যএশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আজেরবাইজান, কাজাগিস্তান, কিরঘিসস্থান, তুর্কেমেনিস্তান ও উজবেকিস্থান-এ রাষ্ট্রহীনতার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র তুলে ধরা হয়।

আজেরবাইজানে (Azerbaijan) ২০০৭ সালের UNHCR এর তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২০৭৮ জন রাষ্ট্রহীন মানুষের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। যদিও কাজাকিস্তানের ক্ষেত্রে ২০০৭ সালের সরকারী তথ্যের মোট ৭৮৩৮ জন নাগরিকের মধ্যে কমনওয়েলথ (Common Wealth) রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে ৪৪৯ জন মানুষকে আলাদা করে রাষ্ট্রহীন রূপে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই সংখ্যা UNHCR এর দেওয়া পরিসংখ্যানের তুলনায় অনেকটাই অধিক। ফলত, এক্ষেত্রে যারা এই রাষ্ট্রের নাগরিক নন তাদেরকে নিজের নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আজারবাইজানের রাষ্ট্রহীনদের সাথে কার্যত নাগরিকের (*De-facto*) সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। আবার কারো কারো পাসপোর্ট বা প্রবেশাধিকারপত্রের সময়সীমা অতিক্রম হয়ে গেলে, মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে তারাও রাষ্ট্রহীন হয়ে পরে।

মধ্য এশিয়ার কিরঘিস্তানও (Kyrgystan)রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। বর্তমানে এই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রহীন অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০। কিন্তু ২০০৯ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী জানা যায় যে এই দেশে প্রায় ১ লক্ষের মত নাগরিক রাষ্ট্রহীন।

তুর্কমেনিস্তানে (Turkmenistan) ২০০৬ সালের তথ্য অনুযায়ী ১৬,০০০ নাগরিককে স্থায়ী নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালের আগে তুর্কি নাগরিকদের গৃহযুদ্ধের সময় নাগরিকত্বের পরিচিতির অবলুপ্তি ঘটে। তারা ছিল মূলত রাশিয়া ও উজবেগ গোষ্টীর মানুষ।

২০০৬ সালের UNHCR তথ্য আনুয়ায়ী উজবেকিস্তানের উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু Uzbek Interior Military মন্ত্রালয় থেকে বলা হয় যে 'তাদের দেশে আরো প্রায় ৫০,০০০ এর মত রাষ্ট্রহীন নাগরিক আছে। এই সকল মানুষদের নাগরিকত্ব দানের জন্য ছাড়পত্র দ্বারা তাদের শর্তহীন নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছিল। তাদের বসবাসের আধিকার দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, তবে কিছু শর্তের মধ্যেমে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। এই সকল রাষ্ট্রহীনতার আলোচিত অভিজ্ঞতা ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষের রাষ্ট্রহীনতাকে বুঝতে সহায়তা করে।[৫৭]

১.৬. ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের রাষ্ট্রহীনতার চরিত্র:-

এই অধ্যায়ে পূর্বেই দক্ষিণ এশিয়ার অন্য রাষ্ট্রগুলির সাথে ভারতের রাষ্ট্রহীনতার কথাও বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গবেষণায় অনালোচিত ছিটমহলের যে মূল সমস্যা ও ৬৮ (১৯৪৭-২০১৫) বছরের দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রেক্ষাপট নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির ইতিহাস যদি দেখি তবে সস্পষ্টতই ধর্মীয় ভাবনার বিষয়টি উঠে আসে। তা স্বত্বেও ব্যক্তির অধিকারের প্রসঙ্গটি ছিল অক্ষুন্ন। এই অধিকারের অক্ষুন্নতা রাষ্ট্রীয়

নিরাপত্তার দিক থেকে যেমন সমস্যা তৈরি করেছিল, অপরদিকে ওই বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডে বসবাসকারী মানুষের নাগরিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা দূর্বল হয়ে পরার সম্ভবনা তৈরি হয়। ২০১৫ সালের পূর্বে ছিটমহলের রাষ্ট্রহীন জীবন সেই মানুষগুলিকে বিভিন্ন অসামাজিক ও অবৈধ্য কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য করেছিল। এই সকল সমস্যা উভয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সংকট হিসাবে আসতে দেখা যায়।

ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রহীন ছিটমহলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তন চোখে পরে 'ছিটমহল-বিনিময়' পরবর্তী সময়ে। ছিটমহলের নাগরিক অধিকারের বিষয়টি ৬৮ বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়েছে। যা তাদের ছিটমহলবাসীর পরিবর্তে মুল ভূখণ্ডের নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করেছিল।[৫৮]

যদিও সেই আনন্দের সাথে কয়েক দশক তাদের জীবন ইতিহাসে সম্পৃক্ত ছিল বেদনার দিকটি। এই দেশ বিভাজনের সাতদশকে সীমানার পরিধিতে থেকেও তাদের নাগরিক হিসাবে কোন দেশে ছিল না ঠাঁই। এই প্রতিকূলতার উত্তরনে প্রাথমিক পর্বে ২০১০ সালে ছিটমহল জনগনণা হয়। সেই গণনায় প্রায় ৫১,০০০ মানুষের পরিসংখ্যান উঠে আসে। যা ২০১৫ সালে বিনিময়ের পর সেই মানুষগুলোকে রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্বের অধিকারকে সুরক্ষিত করেছিল।

এই ছিটমহল বিনিময় পর্বে এই সকল বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডে বসবাসকারী মানুষের সামনে ভারত অথবা বাংলাদেশ এই দুটি দেশের মধ্যে একটি দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ৯৮৭ জন (হিন্দু ও মুসলমান) উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতীয় ছিট থেকে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহন করেন। এই সকল বিষয়ের মধ্য দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডে থাকা মানুষের প্রত্যহিক জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে।[৫৯]

১.৭. পর্যবেক্ষণ:

ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল সম্পর্কীত আলোচনায় কয়েকটি বিষয় উঠে আসে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অবস্থানকারী 'বিচ্ছিন ভূখণ্ড' বা 'ছিটমহল' ওই সকল দেশের সীমানা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক সমস্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় দেশে রাষ্ট্রহীনতার সংকট বৃদ্ধি পাওয়ার ক্রম পর্যায়ে 'বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড' এ বসবাসকারী মানুষের আলোচনা আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে উঠে আসতে দেখা যায়। দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সমস্যার অঙ্গ হিসাবে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থানকারী ছিটমহল এবং এই ছিটমহলে অবস্থানকারী মানুষের রাষ্ট্রহীনতা প্রাতিষ্টানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। সেই সকল বিষয়গুলির মধ্যে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার মত বিষয়টি জড়িত, অপরদিকে ওই ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষদের মানবাধিকারের সমস্যা।

ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ভারত ও পাকিস্থানের সীমানা নির্ধারনের দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ্ সীমানার মানচিত্র তৈরি করে দিলেও ছিটমহল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার দরুন প্রায় ৫১ হাজারের মতো মানুষকে ৬৮ বছরের রাষ্ট্রহীনতার যন্ত্রনাকে নিয়ে জীবন অতিবাহীত করতে হয়েছিল। ২০১৫ সালে ভারত ও বাংলাদেশের উভয় দেশের সরকারের অনুকূল প্রচেষ্ঠায় সীমান্ত চুক্তি বা Land Boundary Agreement (LBA) এর দ্বারা ছিটমহল সমস্যার নিস্পত্তি ঘটে।

যা বিশ্বের রাষ্ট্রহীনতা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় অ-নাগরিক (non-Citizen) থেকে নাগরিক হয়ে ওঠার এক সামগ্রিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে নব্য সংস্করণ হিসাবে প্রতিষ্টা পাবে।

টীকা ও সুত্র নির্দেশ:

১. U.N. Gupta: *The Human Rights: Conventions and Indian Law*, (New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 2014), পৃ. ৭৪।

২. Rup Kumar Barman; *Statelessness of Enclave Dwellers and Struggle for Survival: A Study on the Indian Enclaves Refugees*, Indian Council of Social Science Research (ICSSR, New Delhi, 2017), পৃ.১৮০।

৩. Sitharaman Kakarala: *India and The Challenge of Statelessness: A review of the legal Framework relating to Nationality*, (National Law University, Delhi Press, 2012),পৃ. ৪।

৪.https://www.unhcr.org/ibelong/aboutstatelessness/#:~:text=What%20is%20statelessness%3F,the%20nationality%20of%20any%20country. (UNHCR, The UN Refugee Agency) এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ১৯.০২.২০২০।

৫. Hugh Massey: *UNHCR And Defactor Stateless*, Senior Legal Advisor, UNHCR, 2010, April, পৃ.৬১।

৬. *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*, UNHCR- UN Refugee Agency, পৃ.৩।

৭.https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/internationalcovenantcivilandpoliticalrights#:~:text=Article%2024,1.&text=Every%20child%20shall%20have%2C%20without,family%2C%20society%20and%20the%20State. এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ২০.০৪.২০২২।

৮.https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial.এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ২০.০৪.২০২৩।

৯.https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/conventioneliminationallformsdiscriminationagainstwomen#:~:text=of%20international%20organizations.,Article%209,change%20or%20retain%20their%20nationality. এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ২০.০৪.২০২৩।

১০.https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/convention-rights-child. এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ২০.০৪.২০২৩।

১২. U.N. Gupta: *The Human Rights: Conventions and Indian Law*, (New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 2014), পৃ. ২৬।

১৩. তদেব, পৃ. ২৬।

১৪. তদেব, পৃ.পৃ. ২৬-২৭।

১৫. U.N. Gupta: *The Human Rights: Conventions and Indian Law*, (New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 2014), Satish Kanitkar: *Refugee Problems in South Asia*, (New Delhi, Rajat Publication, 2000), Promod Mishra: *Human Rights in South Asia* (New Delhi, Kalpaz Publication, 2000).

১৬. https://www.un.org/. এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ০৯.০৪.২০২১।

১৭. U.N. Gupta, *The Human Rights: Conventions and Indian*: প্রাগুক্ত।

১৮. Hannah Arendt: *The Origins of Totalitarianism*, (New York, Orlando, 1966), পৃ.৫।

১৯. Evgeny Vinokurov: *Theory of Enclave*, (Lexington Books, 2007)।

২০. Rup Kumar Barman:'The Proxy citizens of North Bengal A Study on the present condition of the people of Indian enclaves of Banfladesh (2014)*; Journal-Karatoya*, Hist, Vol.7, 2014, (University of North Bengal, Siliguri)।

২১. Brendan R. Whyte: *Writing for the Esquimo: A Historical and documentary Study of the Cooch Behar Enclaves of India and Bangladesh*, (Melbourne University, University of Melbourne Press, 2004), পৃ. ৪।

২২. Mark Catudal Sreinstuken: *A Study on Cold War Politics*, (New York, Vantage Press, 1979); C.D.O Farran: *International Enclaves and the Question of State Servitudes*, International and Comparative Law Quarterly, Vol-4, No.2, (Cambridge University Press April, 1955), পৃ.পৃ. ২৯৭-৩০৭।

২৩. Sitharaman Kakarala: *India and The Challenge of Statelessness: A review of the legal Framework relating to Nationality*, (National Law University, Delhi Press, 2012),পৃ- ৫।

২৪. Rup Kumar Barman: *Statelessness of Enclave Dwellers and Struggle for Survival: A Study on the Indian Enclaves Refugees*, Indian Council of Social Science Research (ICSSR, New Delhi, 2017) পৃ- ১৮৩, (প্রাগুক্ত); দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা), *উত্তর প্রসঙ্গ: একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল,* কোচবিহার, পৃ.১৭৬।

২৫. তদেব, Rup Kumar Barman (2017), দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা), *উত্তর প্রসঙ্গ:* একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল, কোচবিহার, পৃ. ১৮৩।

২৬. Regional Cooperation for Human Security: Reflections from Bangladesh, Vol. 13, Number-2, July – Dec 2006, *South Asia Survey*, (New Delhi, Sage Publication, 2006), পৃ. ৩৩৩-৩৩৪, William van Schendal: *Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclave, The Journal of Asian Studies* 61, no.1 (Feb 2002) পৃ.পৃ. ১৩০-১৩১।

২৭. Shewly, Hosna, Jahan: *Life, the Law and the Politics of Abandonment: Everyday Geographies of the Enclaves in India and Bangladesh*, (Department of Geography, Durham University, 2012), William van Schendal: *Stateless In South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclave*, The Journal of Asian Studies 61, no.1 (Feb 2002),পৃ. ১৩০-১৩১।

২৮. Evgeny Vinokurov: (2007), পৃ. ৪৭, প্রাগুক্ত।

২৯. দেবব্রত চাকীঃ*সীমান্ত সমস্যার ৬০ বছর র‍্যাড্ক্লিফ রোয়েদাদের রহস্য আজও অধরা*, বর্তমান পত্রিকা, শিলিগুড়ি, ১৬.০৯.০৭।

৩০. Rup Kumar Barman: Departmental Project, *Demand for Democracy and Cultural Nationalism of Bhutan: Their Impact in Nepal and Indo-Bhutan Frontier Region*, (Department of International Relations, Jadavpur University, 2006-07), পৃ. ৯।

৩১. Promod Mishra: পৃ. ২৮৩, প্রাগুক্ত।

৩২. Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Law and ParliamentaryAffairs,(http://www.bdembassyusa.org/uploads/forms/Citizenship law%20amendment.pdf), *Refugees International A Powerful Voice for Life Saving Action,* (www.rufugeesinternational.org. 2001), (Washington, DC ,2009), পৃ. ৪০, এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ১৩.০৮.২০২২

৩৩. Rup Kumar Barman: Departmental Project, International Relations, (2006-07), পৃ. ১১, প্রাগুক্ত।

৩৪. Paula Banerjee; *The State and being stateless: An account of South Asia:* (Orient Black Swan, Hyderabad,1st Edition 4th September 2019),পৃ.পৃ. ১৮৮-১৯০।

৩৫. Rup Kumar Barman: Departmental Project, International Relations, (2006-07), Kolkata) পৃ. ২১, প্রাগুক্ত।

৩৬. Paule Banerjee, Anusua Basu Roy Chowdhury, Atig Ghosh; 2019, পৃ. ১৯০।

৩৭. UNHCR, *Convention on the Reduction of Statelessness, 1961*, https://www.unhcr.org/statelessness.html এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ০৫.১০.২০২০।

৩৮. Refugees Interational, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪০।

৩৯. তদেব, Refugees Interational, পৃ. ৪১।

৪০. (Note: 'ভুপালী' কথাটি দক্ষিন এশিয়ার ভুটানের রাষ্ট্রহীন নাগরিকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, যে সমস্ত নেপালের নাগরিকতা ভুটানে নাগরিকত্বহীন অবস্থায় আছে তাদের '*ভুপালীশ*' নামেই উল্লেখ করা হয়), Rup Kumar Barman: *Ethnic Mosaic and the Cultural Nationalism of Bhutan*,(Amsterdam University Press, 2009), Erich Kolig, Vivienne SM. Angeles, Sam Wong (Edited): *Identity, inCrossroad Civilisations: Ethnicity, Nationalism and Globalism in Asia*, (Amsterdam University Press, 2009.), (Article Collected From JSTOR), পৃ. ৬২।

৪১. Paule Banerjee, Anusua Basu Roy Chowdhury, Atig Ghosh: (2019) পৃ. ১৩৯, প্রাগুক্ত।

৪২. Rup Kumar Barman: Ethnic Mosaic and the Cultural Nationalism of Bhutan, (JSTOR), পৃ.৬২, প্রাগুক্ত।

৪৩. Promod Mishra, পৃ. ১৪৪, প্রাগুক্ত।

৪৪. http://athmandupost.eksantipur.com/news/2015-09-30/ cycle and statelessness working paper series No. 2015/12- Institute on Statelessness and inclusion web address - www.institute.org/wb2015-02-Rothe pdf)। এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ২৭.১০.২০১৫।

৪৫. Lynch in 2008. Future denied -Statelessness among infants' children and young is refugee; Washington, DC. Web Address – www.rcusa.org/blog এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ. ১৭.১০.২০২২

৪৬. Promad Mishra, পৃ. ১১৯, প্রাগুক্ত।

৪৭. তদেব; পৃ.১১২।

৪৮. Parliament of the Democratic Socialist of Sri Lanka, *Grant of Citizenship to Statelessness Persons* (Special Provisions), (Amendment) Act. No. 5 of 2005, www.refworld.org/pdfid/4c515bfe2.pdf. এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ২০.০৮.২০২২

৪৯. Refugees International, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪২।

৫০. UNHCR for the office of the High Commission for Human Rights Compilation Report Afghanistan, www.refworld.org/docid/50aca6112.html. এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ২০.০৮.২০২২

৫১. United Nation High Commission for Refugee Maldives,Submitted by the *United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human Right's Compilation Report- Universal Periodic Report* Review: Republic of Maldives.

৫২. Dr. K.C. Das and Adidur Rahman: Statelessness: A Study of Chakma Refugees of Arunachal Pradesh; Cross-Currents: An International Peer-Reviewed Journal on Humanities & Social Sciences | Volume-1 | Issue-02, Dec. 25th 2015।

৫৩. Roshni Sinha: Explainer: The Citizenship (Amendment) Bill 2019 web address: https://prsindia.org/theprsblog/explainer-citizenship-amendment-bill-2019 এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ২২.০৪.২০২২

৫৪. https://gjia.georgetown.edu/2022/06/14/the-perpetual-foreigner-statelessness-among-the-vietnamese-minority-in-cambodia/ এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ২২.০৪.২০২২।

৫৫.বর্মা নাগরিকত্ব আইনের নিরিখে https://www.refworld.org/docid/3ae6b4f71b.html এই ওয়েবসাইটি দেখার তারিখ: ২২.০৪.২০২২।

৫৬. Refugees International, পৃ.পৃ. ৩৬-৩৯, প্রাগুক্ত।

৫৭. তদেব, Refugees International, পৃ.৪৩।

৫৮. U.N.Gupta, পৃ. 26, প্রাগুক্ত।

৫৯. Rup Kumar Barman: *The Origin and Evolution of the Enclaves of Indian and Bangladesh A Historical Study*, (New Delhi, Avhijeet Publications, 2019), পৃ. ১৫, মোহাম্মুদ গোলাম রববানী: *বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল অবরুদ্ধ ৬৮ বছর*, (ঢাকা, প্রথম প্রকাশন, ২০১৭), পৃ.পৃ. ১০২-১০৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিটমহল সৃষ্টির ইতিহাস

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থেকেও 'রাষ্ট্রহীন' পরিচিতি ভারত ও বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৬৮ বছর পর্যন্ত বহন করতে হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর পর্বে এই রাষ্ট্রহীন ভূখণ্ডগুলি আন্তর্জাতিক থেকে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় ছিটমহল নামে নিজের পরিচিতি নির্মাণ করেছে। ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের ইতিহাস উৎপত্তির এই বীজ রোপিত হয় মধ্যযুগে। ঔপনিবেশিক আমলেও এই সংক্রান্ত জটিলতার সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি। কিন্তু দেশভাগের সময়ে রাষ্ট্র নির্মাণ হলেও উভয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিচ্ছিন ভূভাগগুলি সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে একপ্রকার অবহেলার দরুন প্রাক ঔপনিবেশিক সময়ে সৃষ্টি হওয়া ছিটমহলগুলি রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের অন্তভূক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। ফলত, ১৯৪৭-২০১৫ (৬৮) বছর চলে আসা স্বাধীন দুই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছিটমহলগুলিতে একাধিক প্রতিকূলতার সন্মুখিন হতে হয়। যে প্রতিকূলতা উভয় রাষ্ট্রের এই অধিবাসীদের করেছে রাষ্ট্রহীন। এই অধ্যায়ে ভারত-বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ছিটমহল সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশ একে ওপরের প্রতি একাধিক বিষয়ে নির্ভরশীল। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় এই দুটি রাষ্ট্র সীমান্তের সাথে বৃহৎ অংশ জুড়ে (৪০০৩ বর্গ কিলোমিটার) রয়েছে। যা শুধুই পশ্চিমবঙ্গ নয় তার বাইরে ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয় ইত্যাদি রাজ্যেগুলির সাথেও যুক্ত। দেশদুটি সীমানা লাগোয়া হওয়ার ফলে একে অপরের প্রতি রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পায়, তেমনী একাধিক বিষয়ে উভয় রাষ্ট্র বার বার অন্তরাষ্ট্রীয় সমস্যার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে একে অপরের সংস্পর্ষে এসেছে। এরই পাশাপাশি দুই রাষ্ট্রের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম ছিল ছিটমহল সমস্যা।

ছিটমহল বলতে বোঝায় 'একটি রাষ্ট্রের ভূখন্ডের বিচ্ছিন্ন অংশ যখন অপর একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থেকে যায় সেই বিচ্ছিন্ন ভূভাগকে 'ছিটমহল' বলে। ভারত ও বাংলাদেশের পরিসরে প্রায় ২৪০০০ একরের মত ভূভাগ এই সমস্যার সাথে জড়িত।[১]

একবিংশ শতাব্দীতে ছিটমহল নিয়ে গবেষক মহলে আগ্রহ তৈরি হতে দেখা যায়। যে বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বা গ্রন্থে একাধিক অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। মূলত পঞ্চদশ শতকের সূচনা মুঘলদের আগমন আজকের উত্তরবঙ্গের কুচবিহার জেলায় ও বাংলাদেশের (রংপুর ডিভিসনের) চার জেলায় ছিটমহলগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হলেও ছিটমহলের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের অবহেলার দরুন ছিটমহল সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে জটিলতাগুলির সমাধানে অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। ২০১৫ সালে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফলে (Land Boundary Agreement) মধ্যযুগ থেকে চলে আসা চাকলা ব্যবস্থা ছিটমহল নাম নিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের অংশরূপে সম্পৃক্ত হয়েছে।

২.২ কুচবিহারের ইতিহাস: আদিপর্ব

কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাস কিংবা কোচ-মুঘল দ্বন্দ্ব ছিটমহলের ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ঐতিহাসিক তথ্যের বাইরেও কিংবদন্তীমূলক পাশাখেলার কল্প কাহিনী ছিটমহলের ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে দায়ি ছিল বলে কোন কোন গ্রন্থের উল্লেখিত হয়েছে।

এই কুচবিহারের পূর্বতন ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে যে বিগত সহস্রাধিক বর্ষের মধ্যে দিয়ে 'কুচবিহার রাজ্য' বিভিন্ন নামে পরিচিতি পেয়েছে, যেমন- প্রাকজ্যোতিষ, লোহিত, কামরূপ, এবং কামতা। সেখানে যেমন রাজ্যের নামের পরিবর্তন হয়েছিল, তেমনী পরিবর্তীত হয়েছিল ভৌগলিক পরিসীমা। ভারতীয় আদিগ্রন্থ ও পুরাণে এই অঞ্চলটি প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের নাম

উল্লেখিত আছে। এছাড়াও সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙের ভ্রমন বৃতান্ত সি-ইউ কি তে কামরূপ নামের উল্লেখ করেছেন। এই কামরূপ ছিল আবার চারটি পীঠে বিভক্ত হয়েছে কামপীঠ, রত্নপীঠ, সৌমার পীঠ ও স্বর্ণপীঠে। এই চার পীঠের রত্নপীঠ ছিল কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার অংশ।[২] যে অংশে মধ্য যুগের চাকলা বিনিময়কে কেন্দ্র করে আজকের ছিটমহল নামের আত্ম পরিচিতি তৈরি করেছে।

২.৩ মধ্যযুগের ইতিহাস: কুচবিহার রাজ্যে ছিটমহলের উৎস

মধ্যযুগে ভারতে মুসলমান শাসকদের আগমন কুচবিহার রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় নব্য ইতিহাসের সূচনা করে। যার প্রভাব পূর্বের বাংলা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতেও পরেছিল। মুসলমান শাসকদের কাছে উত্তর-পূর্ব ভারত কৌশলগত অবস্থানের জন্য ছিল আকর্ষণীয়। কারণ উত্তরবঙ্গের একদিকে গাঙ্গেও অববাহিকা, অপরদিকে ছিল হিমালয়ের উপত্যকা অঞ্চল। এই অঞ্চলে যেমন সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি হিন্দু মুসলমান সহ তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মতন্ত্রের সহাবস্থান ছিল। এছাড়াও ছিল অহম রাজ্যের প্রভাব। যা উত্তর-পূর্ব ভারতের সাথে সংযোগ রক্ষার করার ক্ষেত্রে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এককথায় যে অংশকে বলা যায় উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার বা 'Gate of North East' বলা হয়। যা একাধিক ভারতীয় রাজ্যকে উত্তরবঙ্গের এই অংশের সাথে জুড়ে রেখেছে। মধ্যযুগের ইতিহাসের পাশাপাশি বর্তমানে সময়ে দাঁড়িয়ে এই অঞ্চলটি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আজও সংবেদনশীল।

ছিটমহল নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিহাসের দৃষ্টিতে একাধিক পর্যালোচনা উঠে এসেছে। যা নিয়ে গবেষকমহলে চর্চা বর্তমান রয়েছে। এর সৃষ্টির অনুসন্ধানে মূলত, পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্বে এই রত্নপীঠে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার খুঁদঘাট পরগনার হাড়িয়া মন্ডলের পুত্র বিশু ওরফে বিশ্বসিংহের রাজত্বের সূচনা হয়। বিশ্ব সিংহের পর পিতার সিংহাসন আরোহন করেন

নরনারায়ণ (১৫৩৩)। এই সময় অহম, কাছাড়, মনিপুর সহ জয়ন্তিয়া, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও ডিমুরিয়া নরনারায়ণের বস্যতা স্বীকার করে। তাঁর শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি নারায়ণী মুদ্রা চালু করেন। এই সার্বভৌম শক্তির অবস্থানের পেছনে সর্বাধিক যার অবদান গুরুত্বপূর্ণ তিনি ছিলেন ভ্রাতা চিলা রায়।

নরনারায়ণের রাজ্য সীমানা সম্পর্কে বলা হয়েছে তার ক্ষমতার উন্মেষ এতোটাই হয়েছিল যে পূর্বোত্তর ভারতে তাঁকে 'চক্রবর্তী' রাজ রূপে প্রতিষ্টা করা হয়। পূর্বে ব্রক্ষ্মদেশের সীমান্তবর্তী অরন্য থেকে পাব্বর্তীয় অসভ্য জাতির বাসস্থান পর্যন্ত, উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে মিথিলা অথবা তীরভূমি (ত্রিহূতের) সীমানা এবং দক্ষিণে ঘোরাঘাট পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তার সীমানা এতটাই দীর্ঘ ছিল যে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার উত্তরপূর্ব হতে চট্টগ্রামের নিকটস্থ বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে—

"জয় জয় নরনারায়ণ হুই নৃপকূল শিরোমনি
যাহার পরম প্রচন্ড প্রতাপ ঢাকিলা ইতো ধ্বনি
সাগর পর্য্যন্ত ভুঞ্জন্তোক রাজ্য প্রজা করি প্রতিপাল
কৃষ্ণর ভকতি প্রচারি ইহন্তো জিয়ন্তোক চিরকাল"

(৬৩ রামায়ন আদিকান্ড মাধবদেব)

নরনারায়াণ ১৫৩৩ সালে আসাম বিজয়ের পর গৌর আক্রমন করে। কিন্তু গৌড়ের রাজার কাছে তিনি পরাজিত হন। নরনারায়ণ পরবর্তী নৃপতিদের শাসনকালে রাজ্যের নাম কালক্রমে কখন বেহার, কখন নিজ বেহার আবার কখন কুচবেহার নামের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে। 'দরঙ্গ রাজবংশাবলীতে কথিত আছে যে একসময় গৌড়েশ্বরের মাতাকে সাপ কামড়ে দেয়, নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের চিকিৎসায় তিনি বিষমুক্ত হয়েছিলেন।' এই উপকারের স্বরূপ রাজমাতা শুক্লধবজকে পুত্র বলে সম্বোধন করেন, ও তার পাঁচটি কন্যার সাথে বিবাহ দেন। এই বিবাহের

যৌতুক হিসাবে বাহারবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়াবাড়ি, শেরপুর এবং দশকাহনিয়া পরগণা রাজাকে প্রদান করা হয়। আবার মতান্তরে বলা হয় করতোয়া নদীর মধ্যসীমা ধরে তার পূর্বের সমস্ত জমি শুক্লধবজকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই ভূভাগগুলি পরবর্তীতে ছিটমহলে রূপান্তরিত হয়।[৩]

নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মী নারায়ণ (১৫৮৭-১৬২৭) সিংহাসন আরোহন করেন। তাঁর সিংহাসন আরোহণের পর থেকে কোচ ও মুঘলদের দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। এই দ্বন্দ্বের ফলে মুঘলরা কখনো কখনো সমঝোতা বা সন্ধির দ্বারা কুচবিহার রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা নিজের দখলে করে নিতে সক্ষম হন। 'আকবর নামায়' উল্লেখ আছে যে ১৫৫৮-১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সুলেইমান করানীর দ্বারা কামতা রাজ্য আক্রমণ হয়। তিনি কুচবিহার আক্রমণের পর দিনাজপুরে আক্রমণ করে। এই সময় কুচবিহার রাজ্যের সৈন্যরা দুনজারি ঘোষ কায়স্ত সেনাপতির বাসস্থান দখল হয়। নরনারায়ণের উপঢৌকন দেওয়ার পর মুঘলরা কুচবিহার রাজ্য থেকে সেনা প্রত্যাহার করে।

নরনারায়ণ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণকে স্নেহ করতেন। নরনারায়ণ নিঃসন্তান থাকায় তাঁর পরবর্তী রাজা হিসাবে তাকেই সিংহাসন প্রদান করেন। এমনকি তাঁর অভিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ফলে রঘুদেব নারায়ণকে পাটকুমার (যুবরাজ) বলে সম্ভোধন করা শুরু হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের (১৫৮৭-১৬২৭) জন্ম হওয়ার পর রঘুদেব নারায়ণ মনক্ষুন্ন হয়েছিলেন। রঘুদেব নারায়ণ গদাধর নদীর তীরে 'খিলানবিজয়পুরে' একটি দূর্গ মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর পিতার দক্ষিণ ভাগের অংশ বাহারবন্দ (রংপুর জেলা) লুন্ঠন করেন। ১৫৮৪ সালে পাঠান দলপতি ঈশা খাঁ কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন। যা ছিল রঘুদেব নারায়ণের অধীনে। রঘুদেব নারায়ণের পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে লক্ষ্মীনারায়ণের অংশ

(বাহারবন্দ) তিনি দখল করেন। এই ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ পরবর্তীতে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হলে বীর নারায়ণ (১৬২৭-১৬৩২) সিংহাসনে বসেন।[৪]

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে প্রান নারায়ণের আমলে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারের অগ্রাধিকারে এগিয়ে আসে। যে পথ তৈরি হয়েছিল কুচবিহারের শাসনাধীনে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে। কুচবিহার রাজ্যের ছিটমহলের প্রসঙ্গে প্রান নারায়ণের শাসনকাল (১৬৩২-১৬৫৫) ছিল অন্যতম। তাঁর অভিষেকের সময়ে রায়কত নতুন রাজার মস্তকে ছত্রধারণ করেন এবং রাজাকে নজর প্রদান করেন। এই রায়কতরা কুচবিহার রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার অধীনে ছিল। বিশ্বসিংহের ভ্রাতা শিষ্যসিংহ এই রায়কত বংশের সূচনা করেন। 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থের ভিত্তিতে জানা যায় যে প্রান নারায়ণের রাজত্বকালে দেশে কোন অধিকার ছিল না। যদিও এনিয়ে মত পাথক্য আছে আসাম বুরুঞ্জী বা তৎকালীন ফরাসী লেখকদের কথায় অন্য তথ্য ধরা পরে, তাদের লেখায় রাজ্যের অভ্যন্তরে জাতিবিরোধ থাকার দরুন তাকে বহু শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বাঙ্গালার সামরিক সুবেদার সুলতান মহম্মদ সুজা, রাজা টোডরমলের কাগজ সংশোধন করায় বাহারবন্দ ও ভিতরবন্দ পরগণার 'সরকার বাঙ্গালভূমি' মোগল সাম্রাজ্যভূক্ত বলে গন্য হয়। ঔরঙ্গজেব দিল্লীর মসনদে বসতেই তার বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরজুমলা মোয়াজ্জেম খাঁকে বাংলার নতুন সুবেদার নিযুক্ত করেন ও কামতা রাজ্য আক্রমণের নির্দেশ দেন। ১৬৬১ সালে ১৯ সে ডিসেম্বর মীরজুমলা কুচবিহারের রাজধানী পরিত্যাগ করেন। ১৬৬৪ সালে ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সন্ধি সাক্ষরিত হয়। এরপর কুচবিহার রাজ্যের সীমানা হতে মুঘল সৈন্য অপসারিত করেন। প্রান নারায়ণ সেই কর (Tribute) ১৬৬৫ সালে ২রা ডিসেম্বর তারিখে বাদসাহের দরবারে পাঠান। এই ভাবে ১৬৮৪ সাল পর্যন্ত কুচবিহারের শাসনকার্য চললেও রাজপরিবারের মধ্যে অন্তবিরোধ চলতেই থাকে। যার ফল স্বরূপ ১৬৮৫ সালের পর থেকেই মুঘল শাসকরা ধৈয্য হারা হয়ে কুচবিহারের ওপর নিয়োমিত আক্রমণ

চালাতে থাকে। ওপর দিক থেকে কুচবিহারের রাজারাও মুঘলদের ওপর গোরিলা আক্রমণ চলায়। এই সুযোগে মুঘলরা কুচবিহারের দক্ষিণাংশের বেশ কিছু অঞ্চল নিজের দখলে করে নেয়।[৫] এছাড়াও প্রান নারায়ণ বোদেশ্বরী বিগ্রহের (জলপাইগুড়ি জেলার ভিতরগড়ে) স্থাপিত সেবাপুজার জন্য ভূমিদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই মন্দির অঞ্চলটি জলপাইগুড়ি জেলার ছিটমহলে আত্মপ্রকাশ করে। জলপাইগুড়ির বোদেশ্বর মন্দির ছাড়াও কামেশ্বর মন্দির (গোসানীমারী) ও জল্পেশরের মন্দির নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

প্রান নারায়ণের শাসনাধীনে 'তারিখে- আসাম' এবং 'আলামগিরনামায়' আকর গ্রন্থ দুটিতে কুচবিহার রাজ্যের চতুরসীমার বিবরন দেওয়া হয়েছে। প্রান নারায়ণের সময় ছয় হাজার বর্গমাইল স্থানে কুচবিহার রাজ্যের ভূভাগ বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজ্যের দক্ষিণে বাদশাহী অধিকারে থাকা অঞ্চল যথা- তাজহাট, বাহারবন্দ পরগণা, পূর্বে খুটঘাটের (গোয়ালপাড়া জেলার) নিকটবর্তী বসকরপুর এবং পশ্চিমে মোরঙ্গের অন্তর্গত ভাটগাঁও অবস্থিত ছিল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যানডেন ধ্রুকের আকা মানচিত্রে 'উত্তর বিহার' (তীরহুত) হতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালার উপত্যকা 'রাজওয়ারা' বলে প্রদত্ত হত। রাজওয়ারার অধিবাসীরা কুচবিহার রাজার প্রতি অনুগত ছিলেন।[৬]

প্রান নারায়ণের পরবর্তী রাজাদের মধ্যে মোদ নারায়ণ (১৬৬৫-১৬৮০), মহিন্দ্র নারায়ণ (১৬৮২-১৬৯৩), রূপ নারায়ণ (১৬৯৩-১৭১৪) ও উপেন্দ্র নারায়ণ (১৭১৪-১৭৬৩) রাজাদের মুঘলদের বারংবার আক্রমণের স্বীকার হতে হয়েছিল।[৭] ১৬৯৩ সালে রূপ নারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করার পর মুঘল দখলাকৃত অঞ্চলগুলি পূনরুদ্ধারের ব্যাপারে সচেষ্ট হলেন। মুঘলদের দখলাকৃত চাকলাগুলি ছিল বোদা, পাটগ্রাম, ফতেপুর, কাকিনা, কার্য্যিহাট ও পূর্বভাগ।[৮] যদিও বিশাল

ক্ষমতাশালী মুঘল শক্তির থেকে রূপ নারায়ণের পক্ষে রাজ্যাংশ্য উদ্ধার করা সম্ভাবনা ছিল স্বল্প, তবুও রাজওয়ারায় অবস্থান করা প্রজাদের আনুগত্য ছিল রাজার প্রতি।

এই দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রাম রাজার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল তা বলা যায় না। অবশেষে সন্ধি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ চাকলা তিনটি কুচবিহারের অধীনে পুনরায় শাসনাধীনে চলে আসে। অপর দিকে কার্য্যরহাট, কাকিনা ও ফতেপুর চাকলা তিনটি বাদশাহের অধিকারে থেকে যায়। এই বিভাজন হওয়ার ফলে পারস্পরিক চাকলাগুলি পরবর্তীতে ছিটমহলে রূপান্তরিত হয়।

১৭১৪ সালে রূপনারায়ণের দেহত্যাগের পর শাসন ক্ষমতার দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেন স্বাধীনতা প্রিয় শান্তনারায়ণ। উপরিউক্ত সন্ধির রূপ নারায়ণ পরাজিত হন। বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ তিনটি চাকলা পূনরায় ফৌজদারের অধীনে চলে যায়। ১৭১৪ সালে রূপ নারায়ণের দেহত্যাগের পর সন্ধি নিয়ে মুঘল কতৃপক্ষের মনঃপুত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে পুর্বের ফৌজদারকে পদচ্যুত করলেন ও নতুন ফৌজদার নিযুক্ত হলেন। কুচবিহারের রাজার সহিত পুনরায় যুদ্ধ হয়। রাজা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়। বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ চাকলা পুনরায় ফৌজদারের করায়ত্ব হয়। মুঘলদের সাথে সন্ধি স্থাপনের পর মুঘল শাসক চাকলার কর্মচারীদের অনুকরণে নাজীর শান্তনারায়ণকে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ এই তিনটি চাকলা প্রদান করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শান্তনারায়ণ সেই প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকার করেন।[৯] কুচবিহারের রাজা অতি সামান্য রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে এই পরগণাগুলি কুচবিহারের অধীনে রেখে দেয়।[১০] বাংলার নবাবী শাসন ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল পর্যন্ত এই সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হয় নি।[১১]

শান্তনারায়ণের দেশপ্রেম ও জেদের দরুন মুঘলদের থেকে বুদ্ধির দ্বারা তিনটি চাকলা পুনরুদ্ধার করতে যেমন সফল হয়েছিলেন, তেমনী মহারাজা রূপনারায়ণের সময়ে বিশ্বসিংহের কার্যকরী পরিসীমার মধ্যে ৩২০০ বর্গমাইল সীমানা মুঘলের থেকে সংযুক্ত হয়েছিল। যা বাংলার নবাব ও রূপনারায়ণের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের মধ্য দিয়েই হয়েছিল। পরবর্তীতে আনুমানিক ১৭৪৬ (১২৫৩ বঙ্গাব্দ) সালে ৯৬ বছর বয়সে শান্তনারায়ণের মৃত্যু হয়।[১২]

২.৪. ভূটান-কুচবিহারঃ দ্বন্দ্ব ও সন্ধির সম্পর্ক

কুচবিহারের অভ্যন্তরে ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ্ব যেমন মুঘলদের উত্তর-পূর্ব ভারতের শাসন ক্ষমতায় সুযোগ করে দিয়েছিল, তেমনী অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে ভূটানের শক্তি বৃদ্ধি পায়। যার দরুন কুচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনে বিশৃঙ্খলার সন্মুখীন হতে হয়েছিল।[১৩] যে ভ্রাতৃঘাতি সম্পর্ক দ্বন্দ্বে একসময় মুঘলদের পরাস্ত করতে কুচবিহার রাজ্যের রাজা ভূটানের সহায়তা নিয়েছিল, পরবর্তীতে ভুটানের দৌরাত্ব বৃদ্ধির কারণে পরিনত হয়। যার ফলে ভূটানের শাসক রায়কত (জলপাইগুড়ি) ও কুচবিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল।

কুচবিহার রাজ্যে ভূটানের সেনার অনুপ্রবেশের ফলে ক্ষমতাশীন নাজিরের পক্ষে তাঁর সক্রিয় অধিকার রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠছিল। ফলত, নাজিরদের সাথে ভুটানী সেনাদের বিবাদ প্রকাশ্য আসতে শুরু করে। এমনকি মহারানীর ‘খামার খাতা’ ও আন্দারান এর জমি থেকে যে আয় হতো তাও কমে আসছিল। রাজমাতা সত্যভামাদেবীর ব্যায় ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে শুরু করে।

রাজেন্দ্র নারায়ণের (১৭৭০-১৭৭২) মৃত্যুর পর পুণরায় রাজ্যের অভ্যন্তরে অরাজগতা তৈরি হয়। কুমার বৈকুণ্ঠ নারায়ণ ভূটানের প্রতিনিধি পেনশু তোমার হাতে নিহত হন। এই পরিস্থিতির সুযোগে পেনশু তোমার সাহায্যে দেওয়ান রামনারায়ণ দর্পদেব এর সহায়তায় পুত্র

কুমার বীজেন্দ্র নারায়ণকে রাজা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। এই পরিস্থিতিতে রায়কত দর্পদেব ভূটীয়াদের সাহায্য করার সুবাদে কুচবিহারের কিয়দংশ তাঁরা আত্মসাৎ করেন। সেই সময় ভূটীয়াদের থেকে পেনশু তোমা কুচবিহার রাজ্যে হরেশ্বর কার্যী ও যদুনাথ ভান্ডার ঠাকুরকে নিযুক্ত করেন।

অন্যদিকে ধৈযেন্দ্র নারায়ণের আদেশে কাশীনাথ লাহিড়ী ও সর্ব্বানন্দ গোস্বামী ধৈযেন্দ্র নারায়ণকে রাজা করার জন্য নাজিরকে অনুরোধ করেন। কুমার বীজেন্দ্র নারায়ণকে রাজা হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নাজিরদের মনপূত ছিল না। তিনি কাশীনাথ লাহিড়ী সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর অনুরোধে ধরেন্দ্র নারায়ণকে রাজা সম্মত করেন। তাঁর সৈন্যদলের শক্তির দ্বারা ভুটীয়াদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন।

পেনশু তোমা নাজিরদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দেবযধুরের কাছে ফিরে যায়। দেবযধুরের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ভূটীয়া সৈন্য বক্সা দুয়ারের পথে কুচবিহার রাজ্যের সৈন্যরা আক্রমণ করেন। দেবযুধ জ্যেষ্ঠ ভাতা ভগবন্ত নারায়ণ ভুটীয়াদের আক্রমন প্রতিহত করতে চেকাখাঁতায় উভয় পক্ষ যুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিল। ভগবন্ত নারায়ণের সৈন্যের কাছে পরাভূত হয়ে ভুটীয়ারা বক্সাদুয়ারের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।[১৪]

বক্সাদুয়ার হতে ভুটীয়ারা পলায়ন করলেও তারা একেবারে শান্ত হয়ে যায় নি। তাঁরা ভুটানে নানা স্থানে থাকা ভুটীয়া সৈন্যদের একত্রিত করে পূনরায় কুচবিহারে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রায়কত দর্পদের নিজের সমস্ত সৈন্য নিয়ে ভুটীয়াদের পক্ষ্যে যোগদান করেন। ছত্র নাজির খগেন্দ্র নারায়ণের নেতৃত্বে সর্ব্বানন্দ গোস্বামী ও কাশীনাথ লাহিড়ী যুদ্ধে যোগদান করেন। ভুটান সেনাপতি সক্রিয় অধিকারে গীদালদহ, বালাডাঙ্গা, মশুয়ামারী, মরাঘাট, লক্ষ্মীপরে দূর্গনির্মাণ করেছিলেন এবং বিশেষ করে রাজধানীর বিশেষ সুরক্ষা বৃদ্ধি করেন। যদিও

এই জাগাগুলি দখল করেন কিন্তু দক্ষিণে ভুটানের সাথে ভাষার অমিল থাকায় সমস্যার সন্মুখীন হতে হয় ভুটানের সৈন্যদের।[১৫] ভুটানের দ্বারা একাধিকবার তাঁরা রায়কত ও কুচবিহার রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দখল করে। এই দখলাকৃত বিচ্ছিন্ন অংশগুলি কুচবিহার রাজ্যের 'চাকলা' রূপে ভুটানের অধিগ্রহণে বহুদিন থেকে যায়।

২.৫. ১৭৭২ সালে সন্ধিস্থাপন: ভুটান ও ইংরেজ

১৭৭০ সালের গোড়ার দিকে ভুটানের সৈন্যরা রহিমগঞ্জ পরগণা বাদ দিয়ে প্রায় কুচবিহার রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজেদের দখল করে নেয়। এই পরিস্থিতির সামনে দাড়িয়ে কুচবিহার রাজ্যের কাছে ব্রিটিশদের সাহায্য ছাড়া ভুটান সৈন্যদের বিতাড়িত করা সম্ভব ছিল না।

১৭৭৪ সালে সন্ধির পূর্বে ভুটানের দেবরাজ আপত্তির বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল নাজির খগেন্দ্র নারায়ণকে কেন্দ্র করে। দিনাজপুরের প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের বিচারে ১৭৭৪ সালে ভুটানের অধিকৃত জায়গাগুলি কুচবিহার রাজ্যের সীমানা বিষয়ক চুড়ান্ত দলিলে গৃহীত হয়। এর ফলে রাজ্যের অনেকাংশ ভুটিয়ারা তাহাদের অধিকার স্থাপন করেন ও কুচবিহার রাজ্যের কাছে ১৩১৭ বর্গমাইল জমির পরিমানে সঙ্কুচিত হয়।[১৬]

কুচবিহার-ভুটিয়া সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী কুচবিহার রাজ্যের শাসকেরা চিহ্নিত ছিল। যার সাথে কোম্পানীও একই ভাব প্রদর্শন করেছিল। এই পরিস্থিতিতে কুচবিহারের রাজ পরিবার ও প্রজারা কোম্পানীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। ভুটানে আবদ্ধ রাজার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ধরেন্দ্র নারায়ণ অভিভাবক রূপে সন্ধিতে স্বীকৃতি হত। কিন্তু সন্ধি সংক্রান্ত আলোচনার নিস্পত্তি হওয়ার পূর্বেই কোম্পানীর শাসক ক্যাপ্টেন জোন্স সৈন্য সহ কুচবিহারে আগমন করেন। ভুটিয়ারা কোম্পানীর সাথে যুদ্ধে পিছিয়ে যায়। তারা কুচবিহার দূর্গে একত্রিত হয়েছিল। কোম্পানী এই

সুযোগে ভুটীয়া সৈন্যদলকে বাঁধা প্রদান করে। ভুটানের সৈন্যরা ও রায়কত সন্ন্যাসী ও বরকন্দাজ সৈন্যগন পূর্বে আসাম সীমান্ত থেকে পশ্চিমে তীরহুত পর্যন্ত নিজেদের সুরক্ষিত করেন।[১৭]

প্রসঙ্গত ১৭৭২ পরবর্তী ১৮৬৪-৬৫ সালে ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধ হয়। আবার ভুটানের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কে নির্ধারণ করেন। ফলত, ভুটানের অধিকৃত অঞ্চলগুলি নির্ধারণ হয়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য গোসাইরহাট, গাদং, চিকলিগুড়ি, মাগুরমারী ইত্যাদি জায়গাগুলি কুচবিহার রাজ্যের ছিটমহলরূপে থেকে যায়।[১৮]

২.৬. ঔপনিবেশিক বাংলার শাসন ও ব্রিটিশ কুচবিহার

১৭৭৩ সালে ভুটানের সাথে কুচবিহারের সন্ধির ফলে কুচবিহার রাজ্যের চিরাচরিত শাসন ক্ষমতায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাংলার দক্ষিণাংশে কুচবিহারের ছিটমহলগুলি ও উত্তরাংশের কিছু অংশ ভুটানের অধীনে থেকে যায়। অন্যদিকে কুচবিহারের রাজস্বের অর্ধেক ৯৯,৫৬০ নারায়ণী মুদ্রা ব্রিটিশ শাসকদের রাজস্ব হিসাবে প্রদান করা হয়।[১৯] কুচবিহার রাজ্যের শাসন কোম্পানীর শাসনের সমর্থনে '*করদমিত্র রাজ্যে* পরিণত হয়ে ওঠে।[২০] কুচবিহারের রাজ্যের অধীনে থাকা জমিগুলি থেকে যে রাজস্ব সংগ্রহ করা হত তাকে বলা হয় '*রাজওয়ারা*' এবং মুঘল অধীকৃত যে অংশগুলি থেকে রাজস্ব নেওয়া হত যাকে বলা হত '*মোগলান*'। ছিটমহলের সমীক্ষার নিরিক্ষে তাদের সমস্যা অনুসন্ধানের সাপেক্ষ্যে কিছু ছিটে পরিভ্রমণের সময়ের কেউ কেউ নিজেদের আজও 'মোগলান' বলে সম্বোধন করতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

কুচবিহারের শাসক হিসাবে ধীরেন্দ্র নারায়ণ (১৭৭২-৭৫) তাঁর রাজ্যের আভ্যন্তরীন স্বাধীন শাসক রূপে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ধৈরেন্দ্র নারায়ণ (১৭৭৫-১৭৬৩) কুচবিহারের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই উভয় শাসক ধীরেন্দ্র নারায়ণ ও ধৈরেন্দ্র নারায়ণের

সময়ে রংপুরে অবস্থিত কুচবিহারের চাকলা জোত বা ছিটমহলগুলির মধ্যে নতুন করে উন্নতির চিত্র পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। তাদের শাসনাধীনেও বাংলাদেশের অধীনে থাকা ভূভাগগুলিতে রাজার আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। তারা পাশাপাশি কুচবিহার রাজ্যের কাছেই তাদের রাজস্ব দিতেন। অপরদিকে রংপুরের জমিদারেরা ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে থেকে যায়। কিন্তু কুচবিহারের রাজ্যের অংশ হিসাবে ওই চাকলাগুলি ব্রিটিশদের দেখাশোনায় থাকলেও, আগের মতই চাকলাগুলি কুচবিহার রাজ্যের নাজিরের অধীনেই ইজরা নেওয়া হত।

কুচবিহার 'করদমিত্র' রাজ্য রূপে পরিনত হওয়ার পর, তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। ১৭৭০ সালে ব্রিটিশ সরকার কুচবিহারের রাজসভার অভ্যন্তরে একাধিক রাজনৈতিক মতামত প্রয়োগের সুযোগ পায়। রাজগুরু শতানন্দ গোস্বামী নিজেকে মন্ত্রী ও মোক্তার হিসাবে ঘোষনা করে। তিনি ছিলেন রানীর পরামর্শ দেওয়ার এক অন্যতম প্রতিনিধি।[২১] এর ফলে কুচবিহারে রাজসভার গুরু হিসাবে তিনি ব্রাহ্মত্তোর আদায়ের সুযোগও পেয়েছিলেন। এই রাজস্বহীন ব্রাহ্মত্তোর জমিগুলির কিছু কিছু অংশ রংপুরের অভ্যন্তরে ছিটমহল রূপে স্বাধীনতার পরেও থেকে যায়। একমাত্র নাজিরদেও ছাড়া কেউ রাজগুরুর প্রতি বিরোধ প্রদর্শন করেন নি। এই রকম পরিস্থিতিতে ১৭৮৩ সালে ধৈরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হয়। এই মত অবস্থায় তাঁর নাবালক পুত্র হরেন্দ্র নারায়ণ (১৭৮৩-১৮৩৯) সিংহাসন অধিষ্ঠিত হয়।

এই অস্থির পরিস্থিতির সুযোগ বুঝে ব্রিটিশ শক্তি কুচবিহারের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। ব্রিটিশ শাসকরা দ্রুত রাজ্যের রাজস্বের হিসাব সংক্রান্ত তদন্ত শুরু করলেন। এতে দুর্নীতি গ্রস্থ আমলা সহ রাজগুরুকে রংপুরে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। এর ফলে কুচবিহার রাজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে 'নাজির'। কিন্তু এই সময় কোম্পানীর আমলা পির্টার মুরে রংপুরের রাজস্ব সংগ্রাহকের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি করদ মিত্র রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে

কুচবিহারের রাজার সমর্থন তারা আদায় করে নিয়েছিলেন। এরপর নাজিরকে বন্দী করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ কারাগার থেকে কোন মতে নাজির মুক্ত হয়ে নিম্ন আসামে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাইরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর থেকেই কুচবিহার রাজ্যে নাজির-গোস্বামী সংঘর্ষ কুচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে দুর্বল করে।

এই অভ্যন্তরীণ অরাজকতার পরিস্থিতিতে মাত্র ৩বছর ৯ মাসের হরেন্দ্র নারায়ণের সিংহাসনে বসেন। তাঁর এই বয়সের স্বল্পতার সুযোগে ব্রিটিশ শাসকেরা কুচবিহার রাজ্যের সরাসারি নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠলেন। কারণ ১৭৮৩ থেকে ১৮০১ এই সময়কালে তিনি ছিলেন নাবালক। এর ফলে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণকে বজায় রাখার জন্য কুচবিহারে ব্রিটিশ কমিশনার নিয়োগ করা হয়। মিষ্টার হেনরী ডগলাস দেখলেন যে কুচবিহারে রাজস্ব আদায়ের পরিমান ১৭৭২ সালে ১,৯৯,১২০ নারায়নী মুদ্রা, ১৭৮৯ সালে, রাজস্ব কমে দাড়ায় ১,২৮,৫৩৪ নারায়নী মুদ্রায়। এই রাজস্বের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে মহারানীর জমিও করের আওতায় নিয়ে আসে। এই অঞ্চলগুলিকে '*আদারণভূমি* বলে বলা হত। একইসাথে '*পেটভাটাজমি*' (রাজার আত্মীয়দের স্বজন পোষনের জন্য ব্যবহৃত হত) ও '*নাজিরনজমি* ' (নাজিরের জমি) ও রাজগুরু এবং কাশিনাথ লাহিড়ী (কুচবিহার রাজ্যের আর এক কর্মকর্তা) জমিগুলিও ব্রিটিশ শাসনাধীন আওতায় নেওয়া হয়। যে সমস্ত খাস জমিগুলো ছিল ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে, সেই জমিগুলিতে কুচবিহারে ইজরা প্রথা চালু করা হয়। যদিও মিষ্টার ডগলাস রংপুরের অভ্যন্তরে থাকা চাকলাগুলির (ছিটমহল) ওপর সেভাবে দৃষ্টিপাত করেননি।

১৮০১ সালে কুচবিহার রাজ্যের প্রশাসনিক দ্বায়িত্বভার হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী গ্রহণ করেন। তৎক্ষণাৎ কুচবিহার থেকে ব্রিটিশ কমিশনারকে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু রংপুরের রাজস্ব সংগ্রহক কুচবিহারে ব্রিটিশদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। লর্ড কর্নওয়ালিশ

বাংলার গর্ভনর জেনারেল (১৭৮৬-১৭৯৩ ও ১৮০৫) হিসাবে দ্বায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি কুচবিহারে স্থায়ী আমলা নিয়োগ করেন ও সেখানকার পুরানো নীতি পুনঃরুদ্ধারের প্রচেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে গর্ভনর জেনারেলরাও যেমন, লর্ডমিন্টো (১৮০৭-১৮১৩) ও লর্ডমায়রা (১৮১৩-১৮২৩) একই নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। তবে এর কিছুদিন পর কুচবিহারে প্রশাসনিক কর্মে ১৮১৩ সালে নরম্যান ম্যাকোল্ডকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে কুচবিহারে রাজা ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী। তিনি আরো বলেন যে নেপালের রাজার তাঁর রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে। এই প্রসঙ্গে '*Anglo-Nepal*' যুদ্ধকে অভিযোগ হিসাবে দেখিয়েছিলেন। এই যুদ্ধই ব্রিটিশদের ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার নিরাপত্তার ওপর প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু মিষ্টার ম্যাকোল্ডের এই যুক্তিকে ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেয়। ম্যাকোল্ডোকে কাউন্সিলের গর্ভনর পদ সরিয়ে দেন। তাকে কুচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কার্য থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই কাউন্সিল কার্যে ডেভিডস্কফকে প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করেন।

১৮২২ সালে ব্রিটিশ গর্ভনরের পাঠানো কর্মচারী নিযুক্ত হওয়ার পর উত্তর-পূর্ব ভারত সহ আসামের গোয়ালপাড়া কুচবিহার রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে ব্রিটিশ শাসনাধীনে আনা হয়। গোয়ালপাড়াতে ক্যাপ্টেন্ জেকিন্সন্কে পাঠানো হয় উত্তর-পূর্বের সাথে কুচবিহার রাজ্যের ভালো সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। কুচবিহার রাজ্যের সাথে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। ফলত, জেকিন্সসের সময়ে ১৮২২ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত কোনরূপ বিবাদ লক্ষ্য করা যায় নি।

শিবেন্দ্রনারায়ণ (১৮৩৯-১৮৪৭) সময়কালে কুচবিহার রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি ঘটে। ১৮৪৭ সালে শিবেন্দ্রনারায়ণ কুচবিহার রাজ্যের সিংহাসন আরোহন করেন। কিন্তু শিবেন্দ্র নারায়ণের সমসাময়িককালে তাঁর নাবালকত্বের সুযোগে কুচবিহারের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বায়িত্ব দেওয়া হয় ব্রিটিশ সরকারের ওপর। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যেমন–

শিক্ষার বিষয়ক এর পাশপাশি বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভাগগুলি ব্রিটিশ গর্ভনরের প্রতক্ষ্য শাসনাধীনেই ছিল।[২২] শিবেন্দ্র নারায়ণের পুত্র নরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর ১৮৬৩ সালে নৃপেন্দ্র নারায়ণ সিংহাসনে বসেন। এই সিংহাসনের আরোহণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সর্মথন জানিয়ে ছিলেন। কুচবিহারের রাজ্যের রাজার পাশে নৃপেন্দ্র নারায়ণের সমর্থনে কামেশ্বরী বিন্দেশ্বরী ও নিস্তারিণী রানীরাও নাবালক নৃপেন্দ্র নারায়ণের ছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার খুব একটা ভালো চোখে দেখেন নি। এই বিরোধের প্রতিত্তরে ব্রিটিশ সরকার ১৮৬৪ সালে মিষ্টার জেসি হজসন্‌কে সরকারের প্রশাসনিক কার্য দেখশোনায় নিযুক্ত করলেন। তিনি ছিলেন একই সাথে উত্তর-পূর্ব ভারতে গর্ভনর জেনারেলের প্রতিনিধি। ১৮৬৪ সালে কুচবিহারের রাজনৈতিক ও পরিবহণ সংক্রান্ত কাজে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। ১৮৬৫ সালে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলাকে বাংলা বিভাগের অর্ন্তভূক্তিতে সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু কুচবিহার রাজ্যকে বাংলার কোম্পানীর শাসনের বাইরে রাখা হয় এবং ব্রিটিশ গর্ভনর জেনারেলের হাতে যে দ্বায়িত্ব ছিল তা ব্রিটিশ কমিশনারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সুতরাং, ডেপুটি কমিশনার হয়ে উঠল কুচবিহার রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদের অভিভাবক।

১৮৮৩ সালে নৃপেন্দ্র নারায়ণ তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ১৮৮৩ সালে রাজ্য পরিষদের দ্বায়িত্বভার তিনি স্বয়ং দেখাশোনা করতেন। রাজ কার্যের সুবিধার্থে আরো তিনজনের সদস্যপদ গঠন করেন। এই পরিষদের প্রধান সভাপতি ছিলেন রাজা এবং তিনিই ছিলেন প্রশাসনিক ক্ষমতার মুখ্য। নৃপেন্দ্র নারায়ণের আমলে অধীক্ষক ছিলেন ‘দেওয়ান’ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার তত্ত্বাবধায়ন হিসাবে দেওয়ান নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি রাজস্ব অধিগ্রহণ নিজের হাতে নিয়ে এসেছিলেন। এই রাজ্যের পুলিশী, অপরাধমূলক বিচার, সৈন্যবাহিনী, সংশোধনাগার পূর্ত কাজ, শিক্ষা ও নিরীক্ষণ মূলক সমস্ত কাজ নির্ভর করত রাজ্যের অধীক্ষকের ওপর। নৃপেন্দ্র নারায়ণ রাজ্যের পরিবহণ ও যোগযোগ ব্যবস্থার ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব

আরোপ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সাথে কুচবিহারের রাজ্যের সংযোগ রক্ষা করার জন্য রাস্তাঘাট ও রেলপথ বিস্তারের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯১১ সালে তিনি ইংল্যান্ডে মারা যান। তিনি মৃত্যুর প্রাককালে কুচবিহার ও বাংলার (রংপুর ও জলপাইগুড়ি) জেলার সাথে যথাযথ সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন।[২৩]

নরেন্দ্র নারায়ণের উত্তরসুরী হিসাবে রাজেন্দ্র নারায়ণ (১৯১১-১৯১৩) কুচবিহার রাজ্যের সিংহাসন আরোহন করেন। তার সময়ে কুচবিহারে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির তেমন কোন পরিবর্তন চোখে পরে নি। নরেন্দ্র নারায়ণের পর জিতেন্দ্র নারায়ণ (১৯১৩-১৯২২) সিংহাসনে বসে কুচবিহারের আধুনিকীকরণের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ নিয়েছিলেন, যা অনেকটাই নৃপেন্দ্র নারায়ণের চিন্তা ধারার পরিপূরক। তিনিও তার মৃত্যুকাল ইংল্যান্ডে কাটিয়ে ছিলেন ও সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কুচবিহার রাজ্যের সর্বশেষ রাজা জগৎদিপেন্দ্র নারায়ণ (১৯২২-১৯৭০) যে সময়ে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন নাবালক। সুতরাং তারা নাবালক অবস্থায় রিজেন্সী কাউন্সিলের দ্বায়িত্বভার সামলায় রাজমাতা ইন্দিরাদেবী সে নিজেও জগৎদিপেন্দ্র নারায়ণকে প্রশাসনিক ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। তার আমলে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

২.৭. উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কুচবিহারের ছিটমহলের বিকাশ ও বিস্তৃতি

নৃপেন্দ্র নারায়ণের সমসাময়িক সময়ে জলপাইগুড়ি ব্রিটিশ শাসিত বাংলার জেলায় পরিনত হয়। ফলত, কুচবিহার ও বাংলার ছিটমহলগুলির সৃষ্টির সাথে একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের প্রতিফলন চোখে ধরা পরে। ব্রিটিশ বাংলার জেলা হিসাবে জলপাইগুড়ি যুক্ত হওয়ার পর থেকে কুচবিহার রাজ্যের অনেকগুলি ছিট জলপাইগুড়ির সাথে সংমিশ্রীত হয়। আবার একই ভাবে ব্রিটিশ

বাংলার জেলা হিসাবে কুচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে ছিটমহলগুলি যুক্ত হয়। কুচবিহার রাজ্যের উওরাংশে পশ্চিম ডুয়ার্সের অঞ্চলগুলি জলপাইগুড়ি ও আলিপুর মহকুমায় অন্তর্ভূক্ত হয় ও কুচবিহার রাজ্যের বিক্ষিপ্ত ছিটমহলগুলি ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের মধ্যেই থেকে যায়।

ব্রিটিশ বাংলার জলপাইগুড়ির দক্ষিণাংশে (বোদা, পাটগ্রাম ও দেবীগঞ্জ) কুচবিহারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ভূভাগ হিসাবে যুক্ত হয়। কুচবিহার রাজ্যের সবোর্চ্চ বৃহৎ তহশিল চাকলা জোত তালুকটি কুচবিহার রাজ্যের অধীনেই থেকে যায়। এবং কুচবিহারের দক্ষিণাংশে জলপাইগুড়ির ‘পাটগ্রাম’ থানাটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে কুচবিহারে যুক্ত হয়।

১৯০৩ সালে হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি জলপাইগুড়ি অভ্যন্তরে কুচবিহার রাজ্যের ছিটমহলগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন- (i) বাইশচালা এলাকাটি তিনটি তহশিলে ভাগ করেন – ময়নাগুড়ি , গোসাইহাট ও গাদাং অঞ্চলটি জলপাইগুড়ির মগরাহাট পরগনায়, এরই ছয় থেকে আট কিলোমিটার উত্তরে মরঙ্গ ও ক্ষেত্রী; (ii) তেলধর ছিল পূর্বে গার্ড তেলধর, কোটভাজনী ১২টি ছিট নিয়ে গঠিত হয়, ছয়টি তালুক ও বোদা পরগনাটি জলপাইগুড়ি জেলার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল; মেখলীগঞ্জ পশ্চিম সীমান্তে পাঁচ থেকে বারোমাইল দূরে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল হলদিবাড়ী; (iii) পাটগ্রাম ছিটটি মেখলিগঞ্জ পরগনায় অবস্থিত, যা ছিল পাটগ্রাম পরগনার জলপাইগুড়ি জেলার অভ্যন্তরে; (iv) এছাড়াও পরগনা পাটগ্রামের বাঁশকাটার ছিটগুলি মেখলিগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার খুব নিকটস্থ ছিল।[২৪]

হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর মতে বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রংপুর জেলায় কুচবিহার রাজ্যের বিক্ষিপ্ত ভূখন্ডগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রথমটি রংপুর জেলার অভ্যন্তরে পূর্বভাগ

পরগনা যা দিনহাটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত; এই ছিটগুলি হল– বাঁশপেচাই, ডাকুরহাট ও দাশিয়ারছঁড়া এবং দ্বিতীয় ভাগটি রংপুর জেলার ভিতারবন্দ পরগনা, এটি দিনহাটার পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলের খুবই পার্শবর্তী, এর অংশভূত তালুকগুলি হল– মাইদাম, গাঁওচুলকা ও ভাগভান্ডার। এছাড়াও কুচবিহারের অধীকৃত একটি ছিট লাউকুঠী পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় ছিল।[২৫]

কুচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে মোট ১০০ টির মত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ছিটমহল ছিল। যদিও সেগুলি রংপুর , জলপাইগুড়ি ও গোয়ালপাড়ার জেলার নিয়ন্ত্রক ছিট রূপেই ছিল স্বীকৃত। রংপুর জেলার ছিটগুলি কুরিগ্রাম, হাতিবান্দা পুলিশথানা সহ ভূরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ি ও লালমনিহাট জেলার অধীনে ছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশের রংপুর জেলার ছিটগুলি ভারতীয় ভূখণ্ডের কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ও দিনহাটা মহকুমায় বিচ্ছিন্ন ভাবে থেকে যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জলপাইগুড়ির দক্ষিণাংশের ছিটগুলিকে পাটগ্রাম, বোদা, দেবীগঞ্জ ও পঞ্চগড় পুলিশী থানার সাথে যুক্ত করা হয়। ফলত, ওই ছিটগুলি মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জের সাথে সংযুক্তিকরণ ঘটে। ব্রিটিশ ভারতের তৃতীয় বিভাগ হিসাবে কুচবিহারের ছিটমহলটি ছিল গোয়ালপাড়া। এখানে তিনটি ছিটের আত্মপ্রকাশ ঘটে– ছিট পোকালাগি, গোবরাকুঠী ও ছিট রামরায়ের কুঠী, বর্তমানে তা কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার অবস্থিত।

ব্রিটিশ ভারতে কুচবিহার রাজ্যের ছিটমহলগুলির মধ্যে বারবার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাদের সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে কুচবিহার ও ব্রিটিশ ভারতের (বাংলা ও আসাম) মধ্যে। রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারের সীমানা নির্ধারণের জন্য রাজস্ব জরিপ ও জরিপ সংক্রান্ত বন্দোবস্তকারী আধিকারিকদের ভূমিকা ছিটমহলের ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখেছে। তবে জলপাইগুড়ি জেলার সীমানা নিরীক্ষণের দ্বায়িত্বে ছিলেন জেএইচ ও ডোনাল্ড (১৮৬৬-৭০) এবং

সীমানা চিত্র তৈরি করেছিলেন ও.এইচ. হার্ট। জে.এন. মিলিগন (১৯০৬-১৬) কুচবিহার-জলপাইগুড়ির কমিশনের (১৯১৯-২০) দ্বায়িত্ব নেওয়ার পর এই দুই অঞ্চলের ছিটমহলগুলির চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণ হয়। একই ভাবে রংপুর ও কুচবিহারের ছিটমহলগুলির মধ্যে সীমানা নির্ধারণের কাজ করেছিল এম.ও. ক্যাটার। পরবর্তীকালে এ.সি. হার্টলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। আসাম ও কুচবিহারের ক্ষেত্রেও এই একই পথ ব্যবহার করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের তত্ত্বাবধানে কুচবিহার-আসাম সীমানা নির্ধারক কমিটি (*Cooch Behar- Assam Boundary Commission*) এর পরিচালনায় আসামের গোয়ালপাড়া জেলার কুচবিহারের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি চিহ্নিত্ব হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সীমানা নির্ধারণ হলেও ছিটগুলি নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের উদাসিনতার ফল স্বরূপ উভয় রাষ্ট্রে এই সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়।

২.৮. ভারতের সাথে কুচবিহার রাজ্যের সংযুক্তিকরণ

১৯৪৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে দুটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টির সাথে চিরাচরিত চাকলা বা ছিটমহলের ইতিহাসের যে ধারাবাহিকতা ছিল তার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মহারাজা জগৎ দিপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর শেষ শাসক হয়েও দেশভাগের মত পরিস্থিতিতে কুচবিহার রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করেননি। কারণ দেশভাগের পরেও কুচবিহারের '*হিতসাধনী সভা*' রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকার কুচবিহারকে 'ভারত ভূক্তির' মধ্যে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দুটি কারণ দেখা যায়, একটি কুচবিহার রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ছিল ব্রিটিশ বাংলা (পরবর্তী বাংলাদেশ) ও অন্যদিকে ছিল আসামের সীমানা যা ভারতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। এই অবস্থায় কুচবিহার রাজ্যের সংযুক্তিকরণ ছিল ভারতের কূটনৈতিক জয়। কুচবিহারের রাজ্য প্রশাসনও ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে সমর্থন জানায়। একই সাথে

১৯৪৭ সালেও কুচবিহারে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তলিত হয়।[২৬] ভারতের সাথে কুচবিহারের সম্পর্কের সুস্থিতি দেখানোর জন্য ১৯৪৭ সালে ২রা অক্টোবর কুচবিহারের রাজা ভারতের জাতির পিতা মহত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) জন্মদিনটিতে ছুটি ঘোষনা করে।[২৭] ভারত সরকার কুচবিহারকে প্রধান কমিশনারের প্রদেশ হিসাবে ঘোষনা করেন ও কুচবিহার ভারতের অর্ন্তভুক্ত হয়।[২৮]

কুচবিহারের রাজা ও ভারতের গর্ভনরের মধ্যে ১৯৪৯ সালে ৩০ সে আগষ্ট ভারতের সাথে সংযুক্তিকরণের চুক্তি সাক্ষরিত হয়। ভি.পি. মেনন (১৮৯৩-১৯৬৬) ভারতের সাথে সংযুক্তির ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি নিজে লিখেছিলেন যে 'কুচবিহার রাজ্য ভারত সরকারের সাথে প্রধান কমিশনারের প্রদেশ হিসাবে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সালে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ডিসেম্বরে সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০) পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত করার ব্যাপারে মতপ্রকাশ করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন দ্বারা *২৯০A এর ধারায়* ১লা জানুয়ারী ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের সাথে জেলা হিসাবে যুক্ত হয়।[২৯] ভারতের সাথে কুচবিহার সংযুক্ত হলেও ছিটমহলগুলি ভারতীয় ইউনিয়নের অবিছেদ্য অঙ্গ হয়েই থেকে যায়। যা ফলস্বরূপ দেশভাগের পরেও ভারত ও পাকিস্তানের ছিটমহল সমস্যা এক আর্ন্তজাতিক রূপ ধারণ করে।

২.৯. পর্যবেক্ষণ

কুচবিহারের ইতিহাসের সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটগুলির উৎপত্তিগত ইতিহাস ওতপ্রত ভাবে যুক্ত। উপনিবেশিক সময়ের পূর্ব থেকেই কামরূপ, কামতা ও কুচবিহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। ছিটমহলের আলোচনা প্রসঙ্গে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে কামরূপের শাসক ভাস্কর বর্মার সময় থেকে মধ্যযুগে সন্ধ্যা রায় ও পৃথু রায়ের শাসনের পরেও আধুনিক কুচবিহারের মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের সময়কাল পর্যন্ত বিশাল রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এই রাজ্যের

অভ্যন্তরে ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বের ফলে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সুযোগ নেয়। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তিনটি চাকলা কাকিনা, কার্জিহাট ও ফতেপুর কুচবিহারের অধীনে থেকে যায়। অপরদিকে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ ছিল মুঘল শাসনাধীন। কুচবিহারের অধীনে যে অংশগুলি থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা হত তাকে '*রাজওয়ারা*' ও মুঘল শাসনাধীনে থাকা অংশগুলি '*মোগলান*' নামে পরিচিত ছিল। অন্যদিকে ভুটানের রাজা কুচবিহারের উত্তর দিকে বেশ কিছু অংশ দখলে নেয়। সেই দখলাকৃত ভূভাগগুলি ভুটানের রাজা রাজস্ব আদায় করতেন বৈকুণ্ঠপুর (জলপাইগুড়ি) থেকে। এরফলে কুচবিহার রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চল ভুটানের অধীনে ছিটমহলের স্বীকৃতি পায়। যা ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের ইতিহাস পর্যালোচনায় অনন্য স্থান অধিকার করে আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশ শাসন শক্তিশালি হতে শুরু করে। আবার '*Anglo-Cooch Behar Treaty' (1773)* -এর মধ্যদিয়ে কুচবিহারে ব্রিটিশ শক্তি করদ মিত্রতায় যুক্ত হয়। কুচবিহার ব্রিটিশ সরকারের *Semi-Colonial* শাসনাধীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কুচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শক্তি যথাযথ থাকলেও, পূর্বভাগে অহমদের ক্ষমতার প্রাধান্য ছিল। আবার কুচবিহার রাজ্যের উত্তরে ভুটানের রাজা দেবরায়ের দখলাকৃত ছিল। ফলত কুচবিহার ও ভুটানের মধ্যে অস্থিরতা লেগেই থাকত। দেশ স্বাধীন হলে সীমানা নির্ধারণের দ্বায়িত্বভার যায় স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের হাতে। সেই কুচবিহার রাজ্যের চাকলা কিংবা আজকের ছিটমহল নিয়ে পরিচিত ভূভাগগুলি নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানায় আসে নি। ভারত-পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) মাঝে পরে থাকা এই বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলির সীমানা নির্ধারণের সমস্যা থেকে যায় অমীমাংসিত। এই অসম্পূর্ণতাই দুই দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনোত্তর পর্বে ছিটমহলে রূপান্তরিত হয়।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. দেবব্রত চাকী: *ব্রাত্যজনের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গ: ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল,* (সোপান, কলকাতা), ২০১১।

২. ধর্মনারায়ণ বর্মা ও ধনেশ্বর মান্তা; *কামরূপ, কমতা ও কুচবেহার রাজ্যের ইতিহাস,* প্রকাশক মিনতি আধিকারী, (কুচবিহার, ২০০৫), পৃ.পৃ. ২৪-২৫।

৩. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ: *কোচবিহারের ইতিহাস* প্রথম খন্ড, (মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা) পূর্নমুদ্রণ, ১৯৯০, পৃ. ১১৪।

৪. তদেব, পৃ. ১১৬।

৫. দেবব্রত চাকী, ২০১১, পৃ. ৩৩।

৬. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ, পৃ. ১৬৫)

৭. রূপ কুমার বর্মণ: ছিটমহল বৃতান্ত: উত্তরবঙ্গের ছিটমহল ও ছিটমহলবাসীদের প্রান্তিকতার বিবরণ, *অর্ন্তমুখ – বাংলা গবেষণা পত্রিকা* (সম্পাদনা খোকন কুমার বাগ), বর্ধমান, (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ. ৪৮)।

৮. দেবব্রত চাকী: প্রসঙ্গ ছিটমহল-৭ ব্রাত্যজনের বৃতান্ত: ছিটমহল সৃষ্টির উৎসমুখ, *বর্তমান,* ২২সে জুন ২০০৮।

৯. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ, তদেব, পৃ. ১৮০।

১০. তদেব,পৃ. ১৭৮-১৭৯।

১১. রূপ কুমার বর্মণ, (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩) পৃ. ৪৮, প্রাগুক্ত।

১২. তদেব, পৃ.পৃ. ২০৬-২০৯।

১৩. রূপ কুমার বর্মণ: *অর্ন্তমুখ* (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ.৪৯, প্রাগুক্ত।

১৪. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ, পৃ.পৃ. ২০৬-২০৯।

১৫. জয়নাথ মুন্সী; *রাজোপাখ্যান* (সম্পাদিত বিশ্বনাথ দাস), (মালা পাবলিকেশন, কলকাতা), এপ্রিল ১৯৮৫, পৃ.পৃ. ৪৭-৪৮।

১৬. তদেব, পৃ.পৃ. ২১৮-২১৯।

১৭. Clements R. Markham: *Narratives of the Mission George Bogle to Tibet and of the Journey of the Thomas Manning Lhasa; mission*, (Trubner and Co. Ludgate Hill), পৃ. ১৩৬, Introduction p. LXVII।

১৮. রূপ কুমার বর্মণ: *অন্তর্মুখ* (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ.৪৯।

১৯. C.U.Aitchison*: A Collection of Treaties and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries, (14 vols.),* পুনমুদ্রণ, সম্পাদনা, (New Delhi, Mittal Publications, 1983), *Vol. II*, পৃষ্টা. ১৮৯-১৯২।

২০. Messieurs Mercer and Chauvet's The Cooch Behar Select Records: Report on Cooch Behar in 1788, Volume 2; Cooch Behar State Press, 1869, পৃ.২৪।

২১. Harendra Narayan Chaudhury; The Cooch Behar state and its land revenue settlements: Printed at the Cooch Behar State Press, 1903. পৃ.২৮৩।

২২. তদেব, পৃষ্টা. ২৯০।

২৩. Government of West Bengal: *West Bengal District Gazetteer, Jalpaiguri,* (Calcutta, The Government of West Bengal, 1981), পৃ.পৃ. ৪-৭।

২৪. Harendra Narayan Chaudhury, পৃ.৩, প্রাগুক্ত।

২৫. তদেব, পৃষ্টা.৫।

২৬. *Cooch Behar Darpan*, *Bhadra 1354*, *Rajashaka 438*; as quoted in Debabrata Chaki: *Bratyajaner Brittyanta,* (Kolkata, Sopan, 2011), পৃষ্টা. ১৭১।

২৭. *Notification no G/35,* dated 1st October, signed by G.C. Goon, Assistant Secretary, General Secretariat, Cooch Behar; *The Cooch Behar Gazette,* 1st October, 1947.

২৮. V.P.Menon: *Integration of the Indian States,* পুনমুদ্রণ (সম্পাদনা)., (Madras, Orient Longman Ltd., 1995), পৃষ্টা.৯।

২৯. তদেব।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি (১৯৪৭-২০১৫)

১৯৪৭ পরবর্তী সালের পর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই বছরে একদিকে যেমন উপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়, অপরদিকে ভারত (১৫ই আগষ্ট) এবং পাকিস্তান (১৪ই আগষ্ট) দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই রাষ্ট্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল। এই সকল সমস্যার মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যবর্তী ছিটমহল সমস্যা ছিল অন্যতম।[১]

ছিটমহল হল দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত এমন একটি ভূখণ্ড যার কারণে এই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিবাদের সূচনা হতে দেখা যায়। অপর দিকে এই সকল ভূখণ্ডের বসবাসকারী মানুষদের ক্ষেত্রে তৈরি হয় নাগরিকত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার। যার ফলে উঠে আসতে দেখা যায় ছিটমহলে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিরোধী বিক্ষোভ ও আন্দোলন। এই সকল বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সভা-সমিতি, সংগঠন, প্রচার, পুস্তিকা প্রকাশের মধ্যদিয়ে। এই অধ্যায়ে ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রহীন মানুষদের [ছিটমহলের নাগরিক] জীবন-সংগ্রামের কাহিনী/ চিত্র/ অখ্যান, তাদের মানবাধিকার রক্ষা করার প্রয়াস, রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩.২. আর্ন্তজাতিক স্তরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা: ভারত ও পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)

ভারত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ছিটমহল সমস্যা নিয়ে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ফল স্বরূপ দেশ দুটি একাধিকবার দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সন্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু উভয় রাষ্ট্র থেকে সমাধান সূত্র বার করতে প্রায় ৬৮ (১৯৪৭-২০১৫) বছর অতিক্রম করতে হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, কিংবা ১৯৭১ সালে ভাষা ভিত্তিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠন, অভিবাসন সমস্যা, ফারাক্কা চুক্তি, তিস্তা জলবন্ঠন চুক্তির মত বিষয়গুলি অমীমাংসিত থাকার পাশাপাশি ছিটমহল সমস্যা উপেক্ষিত থেকে যায়। *Bangladesh Institute of Peace and Security Study (BIPSS)* এর রিপোর্টে *Indo-Bangladesh Summit : A Security Agenda for Bangladesh* এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে উপকূলবর্তী নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি বাংলাদেশের পক্ষে একটা বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ এই উপকূলবর্তী অঞ্চলের ওপর তাদের অর্থনীতির একটা বড় অংশ নির্ভর করে। এক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দ্বারা গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টির ওপর আলোচনা করা হয়েছিল। এছাড়াও দুই রাষ্ট্রের নদীর অববাহিকা ও হাইড্রোলজিকাল কালচক্রের মত প্রকল্পগুলিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।[২] ছিটমহলগুলি মূল রাষ্ট্রীয় সীমানার সাথে থাকার ফলে অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে অবৈধ্য কার্যকরণের সুযোগ ঘটে। যা উভয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং উপরিউক্ত বিষয়গুলি আলোচনার ক্ষেত্রে দুই দেশের সুসম্পর্কে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। যা পরিসংখ্যানগত ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে।

সরণি:১

তারিখ- সাল	মৃত্যু (ভারতীয় ভূখণ্ডে)
১লা জুলাই থেকে ১১ই জুলাই ২০০৯	৬২ জন
১লা জানুয়ারী থেকে ১লা জুলাই ২০০৯	৭৮৯

সূত্র: ২০০৯ সালে ভারতীয় ভূখণ্ডে বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মৃত্যুর পরিসংখ্যান।[৩]

উপরে উল্লেখিত তথ্যের মধ্যদিয়ে দ্বিপাক্ষিক একাধিক জটিলতা দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টির পরে ছিটমহলের মত সমস্যার ক্ষেত্রেও বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছিল। স্বাধীনোত্তর পর্বে এই সমস্যাগুলির উদ্ভব হতে দেখা গেলেও ছিটমহলের সৃষ্টির পেছেন কুচবিহারের আঞ্চলিক ইতিহাস ছিল অতপ্রত। যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কুচবিহার রাজ্য ও বাংলার ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকা বিচ্ছিন্ন ভূভাগগুলি উপেক্ষিত থেকে যাওয়ায় স্বাধীনোত্তর যুগে ছিটমহল সমস্যা অন্যতম জটিল আকার ধারণ করেছে। এই রাষ্ট্র সৃষ্টির মাঝে সীমানাকে কেন্দ্র করে একাধিক বিষয় অবহেলিত থেকে যায়। এই অবহেলার বিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের বর্ষিয়ান অধ্যাপক আনন্দ গোপাল ঘোষ বলেছেন, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারত ও পাকিস্তান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। এই বিভাজনের ফলে দুই রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রান হারায়। যা তাদের স্মৃতিতে স্বাধীনতার ষাট বছর অতিক্রম করলেও মুছে যায় নি।[৪]

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত 'The Origin and Evolution of the Enclave of India and Bangladesh : A Historical Study' এই গ্রন্থে দেশভাগ প্রসঙ্গে 'সিরিল র‍্যাডক্লিফের দ্বারা সীমানা নির্ধারণকে মূখ্য কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সীমানা নির্মাণে দুই দেশের সীমানা সংক্রান্ত একাধিক বিষয় থেকে যায় অমীমাংসিতই। সেক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালে ১৭ই আগষ্ট কুচবিহার রাজ্যের অধীনে থাকা বহু বিছিন্ন ভূ-ভাগগুলি যেমন পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্থানের)

অধীনেই থেকে যায়। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচটি থানা (পাটগ্রাম, বোদা, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া ও পঞ্চগড়) ও অবিভক্ত রংপুর জেলায় 'কুচবিহারের ছিটমহল' গুলি যুক্ত হয়। একই সাথে দেখা যাবে ব্রিটিশদের সাথে কুচবিহার ছিল 'করদ মিত্র' রাজ্যে। দেশভাগের সমসাময়িক সময়ে কুচবিহার রাজ্যের অবস্থান কি হবে তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। যে জটিলতায় তাঁরা কোন রাষ্ট্র ভারত না পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবে তা নিয়ে বির্তক তৈরি হতে দেখা যায়। ভারত স্বাধীনতার পরেও কুচবিহারের রাজস্ব ভূমি ১৯৪৯ সালে 'গ' শ্রেণি বিভাগের রাজ্য হিসাবে অর্ন্তভূক্ত হয়। ফলত, দেশভাগের পরে কুচবিহারের ছিটমহলগুলি ভারত ও পাকিস্তানের (পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান) দ্বিপাক্ষিক সমস্যা রূপে স্থান করে নেয়।[৫]

দেশ বিভাজনের পর সীমানা নির্ধারনের দ্বায়িত্ব দেওয়া হয় স্যার র‍্যাডক্লিফ্ সাহেবের হাতে। যার ফলস্বরূপ জন্ম হয় ছিটমহল সমস্যার পাশাপাশি তৈরি হয় দক্ষিণ বেরুবাড়ি অঞ্চলের 'বিরূপ অবস্থান' (Adverse Possession) । সিরিল র‍্যাডক্লিফ্ দ্বারা নির্মিত চিত্রে যেমন জলপাইগুড়ি জেলার বিভাজন হয়েছিল, তেমনি বিরূপ অবস্থানে স্থিত ভূভাগের (Adverse Possession) সৃষ্টি হয়। এরফলে ওই অঞ্চলের ৭০ ভাগ মানুষ ভারতীয় ছিটমহলের জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিল। একই ভাবে ভারতীয় ছিটের ৯০ ভাগ মানুষদের নাগরিকত্বের সমস্যার সম্মুখীন হয়।

১৯৪৭ সালে ২৮শে জুলাই বাংলাদেশের বিচারপতি আবু সালেহ মহম্মদ আক্রাম ও বিচারপতি এস.এ.রহমান রিপোর্ট পেশ করেন যে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার এলাকা তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। আবার অপরদিকে পাটগ্রাম থানা সংলগ্ন রংপুর জেলার উত্তরভাগের অমুসলিম প্রধান দুটি থানা ডিমলা ও হাতিবান্দাকেও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যেই রাখা হয়েছে যা ছিল একেবারেই অনভিপ্রেত। এই বিভাজনের সমস্যা ছিটমহলের পাশাপশি অ্যাডভার্স

পজিশনের জন্ম দিয়েছিল। তার ফলে জলপাইগুড়ি জেলার বিভাজনের সময় সদর থানা এলাকাকে খতিয়ে না দেখে সীমান্ত সংলগ্ন বড়শশী, নেউতরী দেবোত্তর, নেউতরী নবাবগঞ্জ, কাজলাদিঘী-পরানীগ্রাম, চিলাহাটি ও সিংপাড়া গ্রামগুলি ভৌগলিক ও ধর্মীয় কারণে দক্ষিণ বেরুবাড়ি ও নগর বেরুবাড়ি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্যদিকে বেরুবাড়ি মৌজার ২৫,২৮, ২৯ ও ৩০ নং ছিট এলাকা অংশ বিশেষ পূর্ব পাকিস্তানের বড়শশী অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই বে-দখলী এলাকা গুলিই সরকারী ভাষায় বিরূপ অবস্থানে বিচ্ছিন্ন ভূভাগ (Adverse Possession) হিসাবে গন্য হয়। ছিটমহলের সমস্যার সাথে একই ভাবে বিনিময় পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত তাঁরা নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।[৬]

Land Under Adverse Possession along the India and Bangladesh (acres)

সরণি: ২

ভারত ও বাংলাদেশের সাথে যুক্ত বিরূপ অবস্থানে থাকা ভূখন্ড (একর)

বাংলাদেশের দখলে থাকা ভারতীয় ভূখন্ড (Indian Land under adverse possession of Bangladesh)	**ভারতের দখলে থাকা বাংলাদেশের ভূখন্ড (Bangladesh land under adverse possession of India)**
পশ্চিমবঙ্গ ২,৬০২	পশ্চিমবঙ্গ ১,৪৩৭
আসাম ও মেঘালয় ৭৯১	আসাম ৭.০০ মেঘালয় ৫৪৮
ত্রিপুরা ০.১৭	ত্রিপুরা ১৬১.৯০
২,৮৫৩.৫০	২,১৫৪.৫০

** Ministry of Home Affairs, Government of India.

২০১৫ সালের ছিটমহল বিনিময়ের দ্বারা সীমান্ত সমস্যার পরিনতি হিসাবে ছিটমহলের পাশাপাশি ‘বিরূপ অবস্থানে’ (Advarse Possition) থাকা ভূভাগগুলিরও নিস্পত্তি ঘটে। *The Hindu* পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের বিক্ষিপ্ত ভূ-ভাগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১৩০টি

ছিটমহল অস্তিত্ব ধরা পরে। যার আয়তনের পরিমান ২০,৯৫৭.০৭ একর। আবার বিপরীত দিকে ভারতীয় ভূ-খন্ডের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের বিক্ষিপ্ত ছিটমহলের সংখ্যা ছিল ৯৫ টি। ভারতীয় সীমানার অভ্যন্তরে থাকা ১২,২৮৯.৩৭ একর বা ৪,৯৭৩.৪ হেক্টর বাংলাদেশের অংশ। Rule of Jungal গ্রন্থের তথ্য অনুসারে এই উভয় দেশের ছিটমহলের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লক্ষ।[৭]

ছিটমহল মানুষেরা তাদের নাগরিকত্ব হীনতার বিষয়টি বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁরা নিজেরাই তুলে ধরার চেষ্টা করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'যৌথ কর্মী গোষ্ঠী' বা '*Join Working Group*' গড়ে তোলেন। তাদের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে ছিটমহলের সমস্যাকে সমাধানের উদ্দেশ্যে উভয় দেশে বিনিময় প্রস্তাব রাখা হয়। এছাড়াও ভারতীয় ১১১ টি ও বাংলাদেশের ৫১ টি ছিটের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

দেশভাগের পর থেকে সীমানা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুটি দেশের মাঝে ৬৮ বছরের সমস্যা সেই রাষ্ট্রের কাছে দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যা হিসাবে এসেছিল। কিন্তু তার পূর্বে দেশভাগের পরেও ভারতীয় ১১১টি ছিটের ৯৭টি ছিট ছিল বাংলাদেশের আলোচ্য ৬ টি থানার অন্তর্গত অর্থাৎ বোদা, পাটগ্রাম, দেবীগঞ্জ, ডিমলা, পঞ্চগড়, হাতিবান্দার অভ্যন্তরে ছিল। আর যে ১৪টি ছিট ছিল তা হল লালমনিরহাট, ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম ও ভুরুঙ্গাবাড়ি থানা এলাকায়। প্রসঙ্গত র‍্যাডক্লিফ্ রোয়েদাদ যদি সীমানা নির্ধারন সঠিক ভাবে করতেন তাহলে ভারতীয় ৯৭টি ছিটের জমির পরিমান (১৭,১৫৮.১৩ একর) বাদ দিয়ে আজ ১৪টি ছিটের ২১৭৯.৬৫ একর জমিই শুধুমাত্র বিবাদের মধ্যে পরে থাকতো। এই প্রসঙ্গে ১৯৬০ সালে র‍্যাডক্লিফ্ একটি সাক্ষাৎকারে অতি দুঃখের সাথে বলেছিলেন--- *"I was so rushed that I had not time to go into the details. Even accurate district maps were not there and what material there was, was also inadequate. What could I do in one and a half months?"* [৮] আবার একই সাথে

বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান হত ৫১টি ছিটের মধ্য দিয়ে। ১৯৯২ সালে 'তিনবিঘা চুক্তি' যদি কার্যকর না হতো তাহলে প্রায় ভারতের হাতে আজ ৪,৬১৬.৮৫ একর ভূভাগ নিজের দখলে থেকে যেতো।[৯] যা আলোচ্য অধ্যায়ে গবেষণাধর্মী দৃষ্টিতে সম্পৃক্ত হয়েছে।

এই ছিটমহলগুলির সমস্যা ও সমাধানের বিষয়গুলি আলোচনা করার পূর্বে তাদের ভৌগলিক অবস্থান ও পরিচয় নিয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত অধ্যায়ে প্রথম পর্যায়ে ভারত ও বাংলাদেশের ১৬২ ছিটমহলের বিস্তৃতি নিয়ে আলোচনা করা হল।

৩.৩. ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশী ছিটমহল ও তাদের অবস্থান

বাংলাদেশের ছিটমহলগুলি ভারতীয় ভূভাগের অভ্যন্তরে পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলায় চারটি মহকুমায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বিস্তৃত ছিল। এই চারটি মহকুমায় মোট ৫১ টি ছিটমহলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে মাথাভাঙ্গায় ১৮ টি, দিনহাটায় ১৯, মেখলীগঞ্জে ১১ টি ও তুফানগঞ্জে ৩টি ছিটমহল ছিল। এই সবগুলি ছিটমহলের ভূখন্ডগত আয়তন ছিল ৭১১০.০২ একর। এই বিস্তৃত ভূভাগে ২০১১ সালে জনগণনার অনুযায়ী প্রায় ৩৭,৩৩৪ জন বসবাস করত। এই বৃহৎ ভূপরিসরে ছিটমহলগুলির বিস্তৃতি ও আয়তনের ওপর নিম্নে আলোকপাত করা হল।[১০]

৩.৩.১. মাথাভাঙ্গা মহকুমার ছিটমহলের অস্তিত্ব

কুচবিহার জেলার পশ্চিমে মাথাভাঙ্গা মহকুমা অবস্থিত। এই মহকুমার আয়তন ৮৯৬.২৬ বর্গকিলোমিটার। ২০১৫ সালের পূর্বে মাথাভাঙ্গা মহকুমায় ছোট বড় মিলিয়ে ১৮টি ছিটমহলের অস্থিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই ছিটগুলি বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার অধীনে ছিল।

ছিটমহলগুলিতে ধর্মীয় দিক থেকে উভয়ে সম্প্রদায়ের মানুষের (হিন্দু ও মুসলামান) অস্থিত্ব ধরা পরে। তবে কিছু কিছু ছিটে লোকবসতি দেখা যায় না। এই ছিটগুলির আয়তন হল যথা- ছিট জগতবের ৩নং (জে এল নং: ৩৭, একর: ৬৯: ৮৪), ছিট জগত বের ১নং (জে এল নং: ৩৫, একর: ৩০:৬৬), ছিট জগত বের ২নং (জে এল নং: ৩৬, একর:২৭:০৯), ছিট কোকয়াবাড়ি (জে এল নং: ৪৭, একর: ২৯:৪৯), ছিট বন্দরদহ (জে এল নং: ৬৭, একর: ৩৯:৯৬), ধবলগুড়ি (জে এল নং: ৫২, একর: ১২:৫০) ছিট ধবলগুড়ি (জে এল নং: ৫৩, একর: ২২:৩১), ছিট ধবলগুড়ি ৩নং (জে এল নং: ৭০, একর: ১:৩৩), ছিট ধবলগুড়ি ৪নং (জে এল নং: ৭১, একর: ৪:৫৫), ছিট ধবলগুড়ি ৫নং (জে এল নং: ৭২, একর: ৪:১২), ছিট ধবলগুড়ি ১নং (জে এল নং: ৬৮, একর: ২৬: ৮৩০), ছিট ধবলগুড়ি ২নং (জে এল নং: ৬৯, একর: ১৩:৯৫), নলগ্রাম (জে এল নং: ৬৫, একর: ১৩৯৭: ৩৪), ছিট নলগ্রাম (জে এল নং: ৬৬, একর: ৪৯: ৫০), মহিশমুড়ি (জে এল নং: ৫৪, একর: ১২২: ৭৭), বুড়া সারাডুবি (জে এল নং: ১৩, একর: ৩৪: ৯৬), ফলনাপুর (জে এল নং: ৬৪, একর: ৫০৬: ৫৬), আমজল (জে এল নং: ৫৭, একর: ১:২৫)। এই ১৮ টি ছিটের মোট আয়তন ২৩৯৫.০১ একর।[১১]

৩.৩.২. দিনহাটা মহকুমায় ছিটমহলের অস্তিত্ব

কুচবিহার জেলার দক্ষিণে দিনহাটা মহকুমা অবস্থিত। এই মহকুমার মোট আয়তন ২৪৮.৫৪ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের মোট ৫১ টি ছিটমহলের মধ্যে দিনহাটায় সব থেকে বেশি ছিটমহলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই মহকুমায় মোট ১৯টি ছিটমহল আছে। আয়তনের দিক থেকে ছিটমহলগুলির আয়তন যথাক্রমে কিশমৎ বাত্রিগাছ (জে এল নং: ৮২, একর: ২০৯: ৯৫), দুর্গাপুর (জে এল নং: ৮৩, একর: ২০: ৯৬), বাশুঁয়া খামার গিতালদহ (জে এল নং: ০১, একর: ২৪: ৫৪), পোয়াতুর কুঠি (জে এল নং: ৩৭, একর: ৫৮৯: ৯৪), পশ্চিম বাকালির ছড়া (জে এল

নং: ৩৮, একর: ১৫১: ৯৮), মধ্য বাকালির ছড়া (জে এল নং: ৩৯, একর: ৩২: ৭২), পূর্ব বাকালির ছড়া (জে এল নং: ৪০, একর: ১২: ২৩), মধ্য মশালডাঙ্গা (জে এল নং: ৩, একর: ১৩৬: ৬৬), মধ্য ছিট মশালডাঙ্গা (জে এল নং: ০৮, একর: ১১: ৮৭), পশ্চিম ছিট মশালডাঙ্গা (জে এল নং: ৭, একর: ৭: ৬০), উত্তর মশালডাঙা (জে এল নং: ০২, একর: ২৭: ২৯), কাচুয়া (জে এল নং: ০৫, একর: ৪৭: ১৭), বাত্রিগাছা (জে এল নং: ৮১, একর: ৫৭৭: ৩৭), করলা (জে এল নং: ০৯, একর: ২৬৯: ৯১), শিবপ্রসাদ মুস্তাফী (জে এল নং: ০৮, একর: ৩৭৩: ২০), দক্ষিণ মশালডাঙ্গা (জে এল নং: ০৬, একর: ৫৭১: ৩৮), পশ্চিম মশালডাঙ্গা (জে এল নং: ০৪, একর: ২৯: ৪৯), পূর্ব ছিট মশালডাঙ্গা (জে এল নং: ১০, একর: ৩৫: ০১), পূর্ব মশালডাঙ্গা (জে এল নং: ১১, একর: ১৫৩: ৮৯)। বাংলাদেশের এই ছিটগুলি কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ও দিনাজপুর জেলার অধিনে ছিল। দিনহাটার অভ্যন্তরে থাকা ছিটগুলির মোট আয়তন ৩২৬২.২ একর।[১২]

৩.৩.৩. মেখলীগঞ্জ মহকুমায় ছিটমহলগুলির অস্তিত্ব

কুচবিহার জেলার পশ্চিমে মেখলীগঞ্জ মহকুমা অবস্থিত। যার মোট আয়তন ২৮৮.৬৪ বর্গকিলোমিটার। মেখলীগঞ্জ মহকুমার সর্বমোট ১১টি ছিটমহল ছিল। এই ছিটমহলগুলি হলো ছিট কুচলিবাড়ি (জে এল নং: ২২, একর: ৩৭০: ৬৪), ছিট ল্যান্ড কুচলিবাড়ি (জে এল নং: ২৪, একর: ১:৮৩), বালাপুখরি (জে এল নং: ২১, একর: ৩৩১: ৬৪), ছিট পানবাড়ি ২নং (জে এল নং: ২০, একর: ১: ১৩), ছিট পানাবাড়ি (জে এল নং: ১৮, একর: ১০৮: ৫৯), ধবলসতী মৃর্গীপুর (জে এল নং: ১৫, একর: ১৭৩: ৮৮), বামনদল (জে এল নং: ১১, একর: ২: ২৪), ছিট ধবলসতী (জে এল নং: ১৪, একর: ৬৬: ৫৮), ধবলসতী (জে এল নং: ১৩, একর: ৬০: ৪৫), শ্রীরামপুর (জে এল নং: ০৮, একর: ১: ০৫), জোত নিজজমা (জে এল নং: ০৩, একর: ৮৭: ৫৪)। এই ছিটমহলগুলি

বাংলাদেশের বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার সাথে যুক্ত ছিল। মেখলীগঞ্জের ১১টি ছিটের মোট আয়তন ১২০৪.৯৩ একর।[১৩]

৩.৩.৪. তুফানগঞ্জ মহকুমার অধীনে ছিটমহলের অস্তিত্ব

কুচবিহার জেলার পূর্বে অবস্থিত তুফানগঞ্জ মহকুমা। এই মহকুমায় সব থেকে কম মাত্র ৩টি ছিটের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই মহকুমার আয়তন ২.৪৯ বর্গ কিলোমিটার। তুফানগঞ্জের ছিটমহলগুলি উত্তর বাঁশজানি (জে এল নং: ০১, একর: ৪৭: ১৭), ছিট তিলই (জে এল নং: ১৭, একর: ৮: ৫৬), উত্তর ধলডাঙা (জে এল নং: ১৪, একর: ২৪: ৯৮) । তুফানগঞ্জের মোট ৩টি ছিটমহলে জমির আয়তন ৮০.৭১ একর। যা বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার অধীনে ছিল।[১৪]

৩.৪. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল ও তাদের অবস্থান

ভারতের অভ্যন্তরে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের মত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের মোট ১১১ টি ছিটমহলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় (১৯৯৬-৯৭ সালের যৌথ তালিকা অনুযায়ী) । এই ছিটমহলগুলি মূলত বাংলাদেশের চারটি জেলার মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। ভারতীয় কুচবিহার জেলার অধীনে ছিল এই চাকলা বা ছিটমহলগুলি। যারা কুচবিহারের রাজার কাছে রাজস্ব দিত। কুচবিহারের অধীনে থাকায় এই ছিটমহগুলিকে 'রাজওয়ারা' বলে সম্বোধন করা হত। এই ১১১টি ভারতীয় ছিটমহলের আয়তন ছিল ১৭১৫৮.১৩ একর। এছাড়াও ছিল ২১টি ছিটমহল পরিবেষ্টিত ছিটমহল (Counter Enclave) আয়তনে যার পরিমান ছিল (২.১বর্গ কিলোমিটার)। এর বাইরে একটি ছিল নিয়ন্ত্রক দেশ পরিবেষ্টিত ছিটমহল (Counter-Counter Enclave) দহলা খাগড়াবাড়ি (১/৫১), যা বিশ্বের রাষ্ট্রহীন জায়গাগুলির মধ্যে ছিল অন্যতম।[১৫]

ভারতীয় ছিটমহলের আয়তন ছিল বাংলাদেশী ছিটমহলের জমির পরিমানের থেকে প্রায় ১০ হাজার একরের উর্দ্ধে।[১৬]

ভারতীয় ছিটগুলির বৃহৎ অংশ যেমন ভারতীয় মুল ভূভাগের পার্শ্ববর্তী ছিল তেমনী কিছু কিছু ছিটমহল ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের থেকে ছিল অনেকটাই দূরে। তাই বিভিন্ন ছিটমহলগুলিতে জনসংখ্যার যেমন পার্থক্য ধরা পরে, তেমনী ছিটমহলগুলিত আকৃতিগত বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব অংশে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ছিটগুলির পরিসংখ্যান মহকুমার ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে। উল্টোদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ছিটগুলি জেলা/উপজেলার ছিটের পরিসংখ্যানকে তুলে ধরা হয়েছে।

৩.৪.১. বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার অধীনে ভারতীয় ছিটমহলের অস্তিত্ব

কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী ও ফুলবাড়ি থানার অধীনে ২৩ টি 'ভারতীয় ছিটমহল' এই জেলার অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল। এই জেলার ২৩ টি ছিটমহলের আয়তন ছিল ১৭৭৮.৮৫ একর। এছাড়াও বাংলাদেশের চন্দ্রকোনা ছিল ছিটমহল পরিবেষ্টীত ছিটমহল (Counter Enclave) । এই ছিটমহলটির আয়তন ছিল ৩৪.৬৪ একর। যা দাশিয়ার ছড়ার ১১৭ নং ছিটের ভিতরে অবস্থিত ছিল। কুড়িগ্রাম জেলার সবচেয়ে বেশি দূরত্ব সম্পন্ন ছিটটি ছিল ডাকুরহাট ডাকিনির কুঠী যা বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রায় অনেকটাই দূরে অবস্থিত ছিল। এই ছিটের পূর্বের জে.এল নং ২৫৩, পরবর্তী জে.এল. নং ১৫৬। এই ছিটের আয়তন ছিল ১৪.২৭ একর। ১৯৬১ ও ১৯৭১ এর আদমসুমারী অনুসারে এই ছিটমহলে কোন বসবাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। যা ভারতীয় দিনহাটা মহকুমার অধীনে ছিল।[১৭] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই ছিটমহলগুলির মানুষেরা মূল পেশা ছিল কৃষিকাজ। এছাড়াও ফসলের চাষ ভালো হওয়ার দরুন জনবসতি ভালোই গড়ে উঠেছিল।

৩.৪.২. বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার অধীনে ভারতীয় ছিটমহলের অস্তিত্ব

বাংলাদেশের উত্তর দিকে অবস্থিত লালমনিরহাট জেলা। এই জেলার আয়তন ১২৪৭.৩৭১ বর্গকিলোমিটার। এই জেলার মধ্যে বাংলাদেশের সবথেকে বেশি ছিটমহলের অস্তিত্ব ধরা পরে। এখানে সর্বমোট ৫৮ টি ছিট আছে। যার মোট আয়তন ছিল ৩১৯৫.০৬ একর। যা হাতিবান্দা থানার পাশাপাশি পাটাগ্রাম উপজেলার মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই ছিটমহলগুলি ছিল ভারতের মেখলীগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটা মহকুমার অধীনে।

বাংলাদেশের উপজেলা পাটগ্রামে ভারতীয় ছিট ছিল ৫৬টি, এর মধ্যে মেখলীগঞ্জ মহকুমার অধীনে ছিল ৩১ টি, মাথাভাঙ্গা মহকুমার অধীনে ছিল ২৪টি ও দিনহাটা মহকুমায় ছিল ২টি (যা লালমনিরহাট জেলার মধ্যেই ছিল) । পাটগ্রাম উপজেলার সীমানার অভ্যন্তরে থাকা ৫৬টি ছিটের আয়তন ২৮৯৬.০৬ একর।[১৮] পাটাগ্রাম উপজেলায় মূলত ৪টি বড় ছিটমহল ছিল এগুলি হল, লোথামারী (জে.এল. নং ২০, আয়তন ২৮৩.৫৩ একর) ভারতীয় মেখলীগঞ্জ থানার অধীনে, মাথাভাঙ্গা থানার অধীনে বাঁশকাটা (জে.এল. নং ১১৯, আয়তন ৪১৩.৮১), বাঁশকাটা (জে.এল. নং ১১২, আয়তন ৩১৫.০৪ একর), এবং মাথাভাঙ্গা মহকুমা শিতলকুচী ব্লকের অধীনে গোতামারী ছিট (জে.এল. নং ১৩৫, আয়তন ১২৬.৫৯ একর) ।[১৯] এছাড়া লালমনিরহাটের মোট দুটি ছিট বাঁশপেচি ছিট (জে.এল. নং ১৫১, আয়তন ২১৭.২৯ একর) ও অপর একটি ছিট বাঁশপেচি ভিতরকুঠি (জে.এল. নং ১৫২, আয়তন ৮১.৭১ একর) । এর দুটি ছিটের প্রথম ছিটটি আয়তনে বড় হলেও সেখানে কোন জনবসতি গড়ে ওঠে নি, কারণ ভূভাগটি বাসবাসের অযোগ্য ছিল।[২০]

৩.৪.৩. বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার অধীনে ভারতীয় ছিটমহলের অস্তিত্ব

পঞ্চগড় জেলায় ভারতের ৩৩টি ছিট বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ১৯৪৭ সালে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ কর্তৃক নির্দেশিত এই জেলার সীমান্ত রেখা নিদিষ্ট করা হয়। এই জেলার তিন দিক ভারতীয় সীমানার সংস্পর্শে ছিল। পঞ্চগড় জেলার সাথে ভারতীয় সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য ২৮৬.৮৭ কিলোমিটার। এ জেলার উত্তরে ভারতের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি, উত্তর পূর্ব ও পূর্বে জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং বাংলাদেশের নীলফামারী জেলা, পশ্চিমে ভারতে পুর্নিয়া ও উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে ঠাকারগাঁও ও দিনাজপুর জেলা অবস্থিত।[২১] এই জেলার অভ্যন্তরে থাকা ছিটমহলগুলির মোট আয়তন ছিল ৬৩৫৭.৬৩ একর।[২২]

এই ছিটগুলি ভারতের মেখলীগিঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ি থানার অধীনে ছিল যথা বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলায় ৭টি ছিটমহল (গরাতি গুচ্ছ ছিটমহল, জে. এল. নং-৭৫,৭৬,৭৭,৭৮,৭৯,৮০/ শিঙ্গিমারী ১ম খন্ড জে.এল. নং ৭৩), এই ছিটগুলির মোট আয়তন ১১১৭.২৪ একর। এছাড়াও বোদা উপজেলার অধীনে ছিল ২৫টি ছিটমহল (নাজিরগঞ্জ জে.এল. নং ৪১,৪২,৪৪,৪৫,৪৬,৪৭,৪৮,৪৯,৫০,৫১,৫২,৫৩,৫৪,৫৫,৫৬,৫৭,৫৮,৬০/ পুটিমারী জে.এল. নং ৫৯, দইখাতা ছিট জে.এল. নং ৩৮/ শালবাড়ি ছিট জে.এল. নং ৩৭/ কাজলদিঘি জে.এল. নং ৩৬/ নাটকটকা ১ জে.এল. নং ৩২ ও নাটকটকা ২ জে.এল. নং ৩৩/ বেউলাডাঙ্গা ছিট জে.এল. নং ৩৫), এই ছিটগুলির মোট আয়তন ৩৫১৪.৯৫ একর। এছাড়া পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানার অধীনে ছিল একটি ছিট বালাপারা খাগড়াবাড়ি (জে.এল. নং ০৩, আয়তন ১৭৫২.৪৪) নামে পরিচিত।[২৩]

৩.৪.৪. বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার অধীনে ভারতীয় ছিটমহলের অস্তিত্ব

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এই জেলা আয়তন ১৬৪৩.৪০ বর্গকিলোমিটার। এই জেলায় ভারতীয় ৪টি ছিট বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। এই ছিটগুলি বাংলাদেশের ডিমলা থানা ও অপরদিকে ভারতীয় ভূখন্ডে মেখলীগঞ্জ জেলার হলদিবাড়ী থানা অধীনে ছিল। এই চারটি ছিট আয়তনে ছিল অনেকটাই ছোট। এই ছিটগুলি হল, বড়খেনকি খারিজা গিতালদহ (জে.এল. নং ৩০, আয়তন ৭.৭১ একর), অন্য একটি ছিট একই নামে ছিল বড়খেনকি খারিজা গিতালদহ (জে.এল. নং ২৯, আয়তন ৩৬.৮৩ একর), বড় খেঙ্গির (জে.এল. নং ২৮, আয়তন ৩০.৫৩ একর) ও নগর জিকাবাড়ি (জে.এল. নং ৩১, আয়তন ৩৩.৪১ একর) ।[২৪] এই চারটি ছিটের মোট আয়তন ১০৮.৪৮ একর। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে এই ছিটমহলগুলিতে কোন লোকবসতি ছিল না।[২৫]

৩.৫. মানবাধিকারের সংকট: ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল

ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলে ৬৮ (১৯৪৭-২০১৫) বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে অন্যতম সংকটপূর্ণ বাস্তবতা ছিল দুই দেশের অভ্যন্তরে ছিটমহলে থাকা মানুষের রাষ্ট্রহীন জীবন। প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির সাথে সেই ভূপরিসরে থাকা মানুষেরা নাগরিকত্ব গ্রহণের অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় একেবারেই ভিন্ন রূপ ধরা পরে 'ছিটমহল' প্রসঙ্গে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের সীমারেখা সেই মানুষগুলোকে করেছিল রাষ্ট্রহীন। ২০১৫ সালের পূর্বে তাদের কাছে না ছিল রাজনৈতিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার, অর্থনীতির অধিকার, কিংবা সামাজিক নূন্যতম সন্মান। এই অধিকারহীন জীবনে নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে নিত্যদিনের জীবন সংগ্রাম ছিল তাদের কাছে খুবেই বেদনাদায়ক। যাদের কাছে মানবাধিকার ছিল অধারা।

প্রসঙ্গক্রমে মানবাধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে ছিটমহলে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসা তথ্য থেকে, যদিও এক্ষেত্রে একধিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল অনবরত, কিন্তু 'অ-নাগরিকদের' (Non-Citizen) অজানা ইতিহাস জানার কৌতুহল আমায় সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করতে সক্ষম করে তোলে। ভারতের অভ্যন্তরে যেমন মশালডাঙ্গা, পোঁয়াতুরকুঠি, নলগ্রাম, ফলনাপুর, জোংড়া, ইত্যাদি ছিটমহলগুলিতে প্রবেশের সুযোগ ঘটে, একই ভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল থেকে পালিয়া আসা ছিটমহলের অধিবাসীদের অভিজ্ঞতা ও ভারতীয় ছিটমহলের বাস্তবিক চিত্র জানা যায়। যাঁরা আজও ভারতের মূল ভূখন্ডের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে একাধিক প্রতিকূলতায়।

৩.৫.১. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের মোট ১১১টি ছিটমহল ছিল। যে ছিটমহলগুলি ভারতের অধীনে থেকেও প্রতিবেশী দেশের (Host Country) সীমানার পরিসরে থাকায় তারা বঞ্চিত ছিল ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের নাগরিকত্বের স্বাদ থেকে। ফলত, তাদের একাধিক প্রতিকূলতার সন্মুখীন হতে হয়েছিল।

বলরাম বর্মনের কথায় উঠে এসেছিল ছিটমহলের বাস্তবিকতা ও তার প্রতিরোধের ইতিহাস। ভারতীয় ছিটে থাকার দরুন তাঁর ওপর অত্যাচার এতটাই বেশি ছিল যে, তার পক্ষে ছিটে টিকে থাকাতাই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। তার ব্যাক্তিগত স্থাবর সম্পত্তির পরিমান ছিল ২৬ বিঘা। দেশভাগের পূর্বে পরিবারের পূর্ব পুরুষেরা কুচবিহার রাজ্যের অধিনস্থ জমিদারদেরকে খাজনা পরিশোধ করতেন। কিন্তু ২০১০ সালে ১৮ই জানুয়ারী মৌলবাদী দুস্কৃতিরা তাঁর বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাঁর অপরাধ ছিল যে তিনি স্বাধীনতা দিবসের দিন বাঁশকাটা ছিটে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

তিনি আরো জানান যে বাংলাদেশ প্রশাসনকে যেমন জানিয়ে কোন কাজ হয়নি তেমনী রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ এই বিষয়ে নিশ্চুপ ছিলেন। বরং তার ওপর অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি তাঁর স্ত্রীকেও শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়।[২৬]

বলরাম বর্মনের মত বেহুলডাঙ্গার ছিটের হৃদয় নাথ বর্মনের কথায় একই অভিমত উঠে এসেছে। তিনি বলেন ১৯৭১ সালে নব্য একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকলেও ছিটমহলের মানুষ হিসাবে তাঁরা যে আলাদা তা তিনি কখনই অনুভব করতে পারেন নি। তাঁরা খুব সহজেই ভারতে আসতে পারতেন এবং জমির খাজনাও দিতেন। কিন্তু ১৯৭৮ সালের তার বাড়িতে দুস্কৃতিদের দ্বারা প্রথম হামলা হয়। এবিষয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের দেবীগঞ্জ থানায় হামলাকারীদের বিরূদ্ধে অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের প্রতিশোধ স্বরূপ হামলাকারীরা তাঁর জমির ধান বলপূর্বক কেটে নিয়ে যায়। ফলত, ছিটমহলের মানুষ হিসাবে অসহায়তার সুযোগে নিয়ে বারং বার তাদের অত্যাচারের স্বীকার হতে হত। যখন তাঁর ওপর দিনের পর দিন অত্যাচার বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি ছিট কমিটির প্রেসিডেন্ট আব্দুল সাহেব কে বিষয়টি নিয়ে অবগত করেন। ছিট কমিটি বিষয়টি নিয়ে একটা ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি বাংলাদেশ থানায় পুনরায় জানালেও ভারতীয় ছিটের অধিবাসী ছিল বলে বিষয়টির ওপর তারা কোন গুরুত্ব দেয় নি।

হৃদয় নাথ বর্মনের জমির পরিমান ছিল প্রায় ৬৫ বিঘা। তাই জমি ছিল তার একমাত্র আয়ের উৎস। ভারতীয় ছিটের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রানে বাঁচার জন্য তাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ৯মাস লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। তিনি ও তার পরিবারের তিন ভাই ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন।[২৭]

ছিটমহলের একটি অন্যতম সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা। এই ছিটমহলগুলি যেহেতু কুচবিহার রাজ্যের অধীনে ছিল তাই সেই সময় দাড়িয়ে ছিটমহলের (পূর্বতন চাকলা)

অধিবাসীরা রাজাকেই রাজস্ব দিতেন। নতুন রাষ্ট্র গঠনের পর সীমানা তাদের কাছে বাঁধা হয়ে দাড়িয়ে ছিল। তবুও ছিটমহলবাসীরা কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার পূর্বে ভারতীয় মূল ভূখন্ডে এসে জমির খাজনা দিয়ে যেতেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে সীমানাকে কেন্দ্র করে কঠোরতা দেখা যায়। ফলত, এই কঠোরতার কারণে সবচেয়ে বেশি যারা সমস্যার মধ্যে পরেছিল তারা হলো ছিটমহলবাসী। তাদেরকে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থেকেই সেই রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের মানুষদের সাথে মানিয়ে নিয়ে চলতে হতো। এই ক্ষেত্রে এক একটি ছিটে এক একরকম চিত্র উঠে এসেছে। কোথাও সহনুভূতি লক্ষ্য করা গেলেও কোথাও তার বিপরীত পরিস্থিতি দেখা যায়। বাঁশকাটা ছিটের অধিবাসী প্রমোদ বর্মন (৫৫) কথায় উঠে এসেছে ভারতীয় ছিটমহলের সেই প্রতিচ্ছবি।

বাঁশকাটা ছিটের অধিবাসী প্রমোদ বর্মনের কথায় ছিটমহলের নিদারুণ বর্ণনার কথা জানতে পারি। তিনি জানিয়েছেন বাঁশকাটা ছিট থেকে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের দূরত্ব ছিল এক কিলোমিটারের থেকেও কম। সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পূজো পার্বন তাদের ছিটে হতো এবং বাংলাদেশের মূল নাগরিকরাও সেই ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু এই ছিটে যে পরিবারগুলি ছোট ছিল তাদের ওপর অত্যাচার করা হত, অর্থাৎ জনসংখ্যাগত দিক থেকে যারা প্রান্তিক মূলত তাদের ওপরেই অত্যাচারের পরিমান ছিল বেশি। এই ছিটে জমির কেনাবেচা হত মুখে মুখে। একাধিক পরিবার নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। ফলে জমির উপযুক্ত মূল্য ভারতীয় ছিটের অধিবাসীরা কখনই পেতেন না। [২৮]

একই রকম কথা শোনা যায় শিবেন্দ দেব সিংহের বর্ণনা থেকে, তিনি বলেন ভারতীয় ছিটে অত্যাচার এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তাঁরা ছিটমহল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও

আগে এই ছিটের জমির রেজিষ্ঠী ভারতীয় ভূখণ্ডের হলদিবাড়ীতে হত, তবে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জমির খাজনা দেওয়া একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। শিবেন দেব সিংহের পরিবার স্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে ভারতে চলে আসেন।[২৯]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক অন্যরকম ছবি ধরা পরে কাজলদিঘি ছিটের ক্ষেত্রে। এই ছিটমহলটি বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলায় বোদা উপজেলার অধীনে ছিল। এর আয়তন ছিল ৭৭১.৪৪ একর (জে.এল. নং ৩৬) । ১৯৫১ সালের কুচবিহার জনগণনার ভিত্তিতে এই ছিটটিতে ৭৮৯ জন অধিবাসী বসবাস করতেন।[৩০]

কাজলদিঘি ছিট সম্পর্কে বিরেন রায় (৬০) অভিমত প্রকাশ করেছেন। কাগলাদিঘী ছিটে ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় তিনি জানান, যে এখানে সন্ত্রাসের পরিমান অত্যাধিক বেশি ছিল। ১৯৭২ সালে ছিট থেকে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ ভারতের মূল ভূখন্ডে চলে আসে। এই ছিটমহলটির জমিদার ছিলেন নগেন্দ্র বক্সী। এখানে তাঁরা কুচবিহারের রাজাকে রাজস্ব দিতেন। ১৯৬০ সালের ভারতে গিয়ে খাজনা দেওয়ার রসিদও আছে তাদের কাছে। কিন্তু মৌলবাদী অত্যাচারে বাধ্য হয় দেশ ছেড়ে আসতে। এই সমস্যা সমাধানে বিমল চক্রবর্তী নেতৃত্বে প্রথম ‘People Committee’ গঠিত হয়।

২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময় নিয়ে ভারতীয় ছিটের বাস্তুচ্যুত অধিবাসীদের মনে আতঙ্ক থেকে যায়। কারণ ছিট বিনিময় হলে যারা দখল করে তাদের স্থাবর সম্পত্তি নিয়েছেন আখের তাদেরই সুবিধা করে দেওয়া হবে। তারা দাবি করেছেন যদি তাদের দেড় বিঘা জমি বাংলাদেশ সরকার দেয় তাহলে কাজলদিঘি সহ ১৩ টি ছিটের প্রায় ১০০০ এর মত মানুষকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করা সম্ভব হবে। এই ভূভাগের বেশির ভাগ মানুষ ছিল হিন্দু রাজবংশী

(ক্ষত্রিয়), এদের প্রত্যেকেই কামতাপুরী ভাষায় কথা বলেন। এই ছিটে রাজবংশী হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা থাকতেন।[৩১]

বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায় ২৩টি ছিটমহল ছিল। যা আয়তনে ২৬৫০.৩৫ একর। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুসারে দাশিয়ার ছড়ার মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৪৪৬ জন।[৩২] ছিটে ছোটখাটো কোন বিবাদের ঘটনা ঘটলে বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা বাংলাদেশের স্কুলে পড়াশুনার জন্য মূল ভূখণ্ডের মানুষকে বাবা কিংবা মা সাজিয়ে ভুয়ো পরিচয়ে ভর্তি করানো হত। তাদের হাটে যাওয়ার ক্ষেত্রেও ছিল নিষেধাজ্ঞা। তারা পাশ্ববর্তী দেবিগঞ্জ থানায় জানালেও বিশেষ সহায়তা পাননি। এই সমস্ত পরিস্থিতি তাদের ছিট থেকে বাস্তচ্যুত হতে বাধ্য করেছিল। ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে তারা ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু সমিতি (Indian Enclave Refugee Association) তৈরি করেন। বাংলাদেশে কোন সংগঠনের সাথে তারা যুক্ত ছিলেন না।[৩৩]

এই ছিটমহলগুলিতে কোন সরকারী সুযোগ সুবিধা তাঁরা ভোগ করতে পারত না। নূন্যতম চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য শিবির যেমন ছিল না, তেমনী ছিটমহলে শিশুদের জন্য ছিল না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যদি কেউ বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তবে তাকেও অনুপ্রবেশকারী হিসাবেও প্রশাসনের দৃষ্টিতে আনা হত। যদিও তাঁরা বাংলাদেশের সীমানার অভ্যন্তরে থাকলেও সেটা তাদের দেশ ছিল না। এই পরিস্থিতির আতঙ্কে ভারতীয় হিসাবে থাকার জন্য বিশ্বেশ্বর বর্মন (৫৮) ও সুবোল চন্দ্র বর্মন বাঁশকাটা ছিটকে করিডোরের মাধ্যমে ভারতীয় ভূখণ্ডের অধীনে আনার দাবি জানায়। ‘বিনিময় নয় করিডোর চাই, আমারা ভারতীয় হয়েই থাকতে চাই’।[৩৪]

৩.৫.২. ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল

২০১৫ সালের পূর্বে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ছিল। এই ছিটমহলগুলিতে ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন একাধিক অভাব অভিযোগ উঠে এসেছে। যা ছিটমহল মানুষদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিকূলতাকে প্রতক্ষ্য করাবে। এই ছিটমহলগুলিতেও ভারতীয় ছিটমহলগুলির মতো কিছু সাদৃশ্য চোখে পরে। ছিটমহলে ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন কুচবিহার জেলার অধীনে থাকা বাংলাদেশের ছিটমহলগুলির জীবন যাত্রার সংকট তুলে ধরা হয়েছে।

এই ছিটমহলগুলির অধিবাসীদের না ছিল রাজনৈতিক অধিকার, না ছিল নিরাপত্তা জনিত কোন ব্যবস্থা। ২০১৫ সালের পূর্বে তাদের ব-দ্বীপের মতোই আবদ্ধ থাকতে হতো। তবে ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে দেখা যায় যে ভারতীয় ছিটের নাগরিকদের বেশির ভাগ মানুষেই নামমাত্র নাগরিক (Proxy Citizen) রূপে থেকে যায়। যাদের বাড়ি কিংবা চাষাবাসের জমি ছিল ছিটমহলে কিন্তু ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের জমি কিনে তাঁরা ভারতীয় (মিথ্যা পরিচয়) হিসাবে বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত থাকতেন।

পোঁয়াতুর কুঠি ছিটমহল সম্পর্কে সেই ছিটের অধিবাসী মনসুর আলি মিঞার গলায় শোনা যায় একাধিক অভাব অভিযোগ। তাঁর বয়স প্রায় ৮০ এর কাছাকাছি। তিনি ভারত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি পোঁয়াতুর কুঠি ছিট নিয়ে বলেন এই ছিটমহলটি বাংলাদেশের রংপুরের কুরিগ্রাম জেলার অধীনে ছিল। মনসুর আলির বাড়িতে দুই বার দুস্কৃতিদের হামলা হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রথমবার ১৯৪৬ সালে ও ১৯৬৬ সালে আবারো ডাকাতি হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার Foreigners Act (1946) এর ধারায় তাদের কেই উল্টে গ্রেপ্তার করেন। এই নিরাপত্তাহীন জীবন সংকটের মনসুর আলির বাবার শরীর অসুস্থ বোধ করায় তাকে কুচবিহারের এম.জে.এন. হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেহেতু এম.জে.এন. হাসপাতাল ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের

মধ্যে স্থিত। ফলত, যারাই হাসপাতালে ছিলেন তাদের ছিটমহলের অধিবাসী বলে গ্রেপ্তার করা হয়। একই সাথে রোগীর চিকিৎসা করিয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উকিলের সাহায্যের ফলে হাসপাতাল থেকে ছুটি মঞ্জুর হয়। ছিটমহলের অধিবাসী হওয়ায় তাকে ৫টাকা জরিমানা ও ৭দিনের জেল দেওয়া হয়। দিনহাটা পোঁয়াতুর কুঠির ছিটমহলের অধিবাসীদের অনেককেই এই পরিস্থিতির স্বীকার হতে হয়।

পোঁয়াতুর কুঠির অধিবাসীদের নিত্যদিনেই এই ধরনের সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মূল ভূখণ্ডের তৎকালীন ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের (অমর রায় প্রধান, দীপক সেনগুপ্ত) কাছে ছিটমহল সমস্যার নিস্পত্তির জন্য তাঁরা একাধিকবার অনুরোধ করেন। ১৯৯০ এর দশকে দুই রাষ্ট্রের ছিটমহল থাকা অধিবাসীদের নিয়ে 'ভারত ও বাংলাদেশ ছিটমহল সমন্বয় সমিতি' গঠিত হয়। ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেব দিনহাটায় আসেন। তার কাছে বাংলাদেশের ছিটমহল পাশাপাশি ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসীদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ২০১১ সালে ৫ই জানুয়ারী পোঁয়াতুর কুঠিতে ছিটমহল নিয়ে জনগণনা শুরু হয়। এই জনগণনায় ছিটের অধিবাসী কারা এই নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। কারণ পোঁয়াতুর কুঠির অনেকেই আছেন যাদের ছিটের পাশাপাশি ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে জমি ও বাড়ি আছে, শুধু তাই নয় আবার অনেক সরকারী কর্মে যুক্ত। পোঁয়াতুর কুঠি ছিটমহলে তাদের কৃষি নির্ভর জীবন যাপন করতে হত। কিন্তু এক্ষেত্রে উৎপাদন বেশি হলে বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে গেলে মূল নাগরিকদের কাছে হুমকির সন্মুখীন হতে হত। তাদের বলা হতো 'ছিটের লোক তোমাদের আবার কি, ছিটে চলে যাও'। বাংলাদেশের জমির অংশ থাকায় তাদের ছিল না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না কোন সরকারী নিরাপত্তা। এই সুযোগে কখনো কখনো ছিটের মধ্যে সমাজ বিরোধীরা ছিটের জমিতে গাঁজার চাষ করত।[৩৫]

পোঁয়াতুর কুঠির একদম পার্শ্ববর্তী ছিল ছিট মশালডাঙ্গা। আকবর আলি মিঞার অভিব্যক্তিতে এই ছিটের কথা উঠে এসেছে। মশালডাঙ্গার মানুষের একমাত্র অর্থনীতির জোগান দিত কৃষি জমির থেকে উৎপাদিত ফসল। কিন্তু সমাজ বিরোধীদের উপদ্রপ এতটাই বেশী ছিল যে তাঁরা ছিটমহলের প্রশাসনিক দূর্বলতার সুযোগে চুরি , ডাকাতির পাশাপাশি গবাদি পশু পর্যন্ত তুলে নিয়ে চলে যেত। এই ছিটের অধিবাসীদের কাছে একমাত্র নিকটস্থ হাট ছিল দিনহাটা চৌধুরীহাট। সেখানেই তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করত। কিন্তু হাট থেকে বাড়ি ফিরে আসার সময় ছিটের অধিবাসী বলে কারণহীন ভাবে ১০০ থেকে ৫০ টাকা নেওয়া হত।

আকবর আলি জানায় যে এই ছিটে হিন্দু ও মুসলমান সকলে একসাথে একে অপরের প্রতি সহযোগীতার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতেন। তাই তাঁরা ছিটমহলে বিনিময়কেই স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। তাঁরা এও মনে করতেন যে জন্মসূত্রে ভারতীয় ভূপরিমন্ডলে বড়ো হয়েছেন তাই তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণে অস্বীকার করেন।[৩৬]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আর একটি ছিটমহল হল শিবপ্রসাদ মোস্তফী। এই ছিটটি আয়তনে প্রায় ৩৭৩.২০ একর হলেও খুব বেশি মানুষ এই ছিটে বসবাস করতেন না। শিবপ্রসাদ মোস্তফীর জমির কৃষকরা মূলত ভূমিহীন কৃষক বা খুবেই স্বল্প জমির মালিক ছিলেন। তাদের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের কোন পরিচয়পত্র ছিল না। ছিটমহলের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার দরুন তারা অনেকেই গাঁজার মত নিষিদ্ধ উদ্ভিদ চাষ করত। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ছিটমহলের বাসিন্দারা ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং, তারা 'ভারত বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির আন্দোলনে' স্বতস্ফুর্ত ভাবে যোগদান করেন।[৩৭]

দিনহাটায় অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যান্য ছিটমহলের পরিস্থিতি মশালডাঙ্গা, পোঁয়াতুরকুঠি ও শিবপ্রসাদ মুস্তাফীর মতই ছিল। কিসমৎ বাত্রিগাছ, করলা, পশ্চিম বাকালির ছড়া এবং কচুয়া ছিটমহলের বাসিন্দারাও এই একই রকম প্রতিকূলতার স্বীকার হতেন।

মাথাভাঙ্গা মহকুমায় ১৮টি বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল। এই ১৮টি ছিটের মোট আয়তন ছিল ২৩৯৫.০১ একর। ফলনাপুর ছিটের অধিবাসী বিরেন্দ্র নাথ বর্মন বলেন, স্থানীয় পরিচিতি হিসাবে এই ছিটমহল অধ্যুষিত অঞ্চলটিকে সোনার চালুন বলে লোকমুখে পরিচিত। ফলনাপুরে মোট ৩,০০০ মত অধিবাসী স্থায়ী ভাবে বসবাস করত। যাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই স্থানীয় রাজবংশী (ক্ষত্রিয়) সম্প্রদায়ের। এছাড়াও ৬০ জন ছিলেন এই ছিটে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিবাসী। এই অঞ্চলটি বাইরে থেকে দেখলে একেবারেই বোঝার উপায় নেই কোনটি ভারত ও কোনটি বাংলাদেশ। ফলত, মুল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সাথে তাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক কোন ভিন্নতা না থাকায় একে অপরের প্রতি তেমন কোন বিরোধ চোখে পরে নি। কিন্তু যেহেতু ছিটের জমি ছিল প্রশাসনিক ক্ষমতা বলয়ের বাইরে তাই ছিটে চুরি কিংবা ডাকাতি মাঝে মাঝেই হয়ে থাকতো।

ছিটমহলের অন্যতম সমস্যার মধ্যে ছিল বিবাহের ক্ষেত্রে। যা বাকি ছিটের মতো ফলনাপুরের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ছিটের মেয়েদের কেউ বিয়ে করতে চাইতো না, কারণ তাঁরা ভারতীয় নাগরিক নয়। এই পরিস্থিতিতে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য অধিক পরিমান অর্থব্যয়ের পাশাপাশি যৌতুক সহ পন দিতে হত।

এই ফলনাপুর ছিটের জমি ছিল খুবেই উর্বর তাই অনেক উৎপাদন হত। কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে গেলে মূল ভূখণ্ডের নাগরিকদের থেকে বাঁধার সম্মুখীন হতে হত। ছিটের জমির মানুষের যেহেতু কোন কাগজ ছিল না তাই তাদের উৎপাদিত ফসল কম

দামে বিক্রি করতে বাধ্য হতেন। ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময় নিয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে ফলনাপুর ছিটমহলবাসীরা ভিন্ন মত প্রসন করেছিলেন। তাদের মতে যদি বাংলাদেশের মধ্যে তিনবিঘাকে কেন্দ্র করে আঙ্গারপোতা ও দহগ্রামের মধ্যে করিড়োর সংযোগ করা যেতে পারে তাহলে ভারতের সাথে মাত্র দেড় বিঘার বিনিময়ে অনেকগুলি ছিটকে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করা সম্ভব হবে।[৩৮]

ফলনাপুরের সাথে লাগোয়া অপর একটি ছিটমহল হলো নলগ্রাম। এই ছিটটি আয়তনের দিক থেকে সবথেকে বড় (১৩৭৯.৩৪ একর)। এই ছিটের অধিবাসীরা নিজেদের ভারতীয় বলেই মনে করেন। তাঁরা মনে করেন যে জন্ম থেকেই তাঁরা এখানেই থাকছেন, ফলত ভারতীয় ভূখণ্ড ছেড়ে অনত্র যেতে তাঁরা সকলেই অস্বীকার করেন। এখানেও এক-দুটি পরিবার ছিল মুসলিম সম্প্রদায়, বাকি সবই ছিল রাজবংশী (ক্ষত্রিয়) হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে একাধিক সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়। তাদের কথায় দাবি উঠেছিল যে তাদের যেন কুচবিহারের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়।[৩৯]

এই দুটি ছিটের পাশে মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিতলখুচী ব্লকের অধীনে অপর একটি ছিট জোংড়া। এই ছিটটি আয়তেন ছিল খুবেই ছোট। এই ছিটটিতে সরকারের ভূমিকা না থাকায় ছিটের ভালো মন্দ সব কিছুই তাঁরা নিজেরাই ঠিক করত। ছিটে অথবা ছিটের অধিবাসীদের কোন সমস্যা হলে তাঁরা একত্রিত ভাবে সমাধান করতে উদ্দ্যোগী হতেন। এখানকার মানুষের মূল অর্থনীতির জোগান দিত কৃষিকাজ। তবে ভারতীয় হিসাবে নিজেদের পরিচিতি প্রাপ্তির জন্য তাঁরা ছিটমহল সংক্রান্ত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতেন।[৪০]

মেখলিগঞ্জ মহকুমার অধীনে ছিল ১১টি ছিটমহল। এই ১১টি ছিটের আয়তন ছিল ১২০৪.৯৩ একর। এই ছিটগুলির পাশেই তিনবিঘা করিডোর তৈরি হয়। যা ১৯৯২ সালে

আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, মেখলিগঞ্জের অভ্যন্তরে কুচলিবাড়ি, পানবাড়ি, বালাপুখুরি ছিটগুলির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন নিয়ে আসে নি। বরং উল্টে তাদের কাছে তিনবিঘা করিডোর আরো অধিক জটিলতা তৈরি করেছিল। ক্ষেত্র সমীক্ষায় তিনবিঘা পাশ্ববর্তী ছিটমহলগুলির মানবাধিকারের সংকট ও তাদের দৈনন্দিন জীবনকে তুলে ধরা হলো, যেখানে একাধিক সমস্যা পাশাপাশি অধিকারহীন আবদ্ধতাকে তাঁরা ব্যক্ত করেছেন।

বিনয় কুমার রায় (বালাপুখুরী) জন্মসুত্রে ছিটমহলের বাসিন্দা। তার মূল পেশা ছিল কৃষিকাজ। তাদের চাষের জমি থাকলেও সেচের ব্যবস্থা ছিল না, এতে চাষ আবাদে ঘার্তি দেখা দেয়। যদিও তাদের মূল ভূখণ্ডের নাগরিকত্বের সুযোগ সুবিধা ছিল না, তবুও তাঁরা ভারতীয় মূল ভূখন্ডে থাকা অধিবাসীদের থেকে নেওয়া নথি দেখিয়ে মোবাইলের সিম কার্ড তুলে ব্যবহার করতেন।

বালাপুখরী ছিটে কোন শিক্ষা প্রতিষ্টান ছিল না। তবে ছিটের একেবারে ১ কিলোমিটারের মধ্যে উপেনচৌখি হাই স্কুলে সকলেই শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেতেন। তবে ছিটের বাচ্চাদের কোন রকম ভারতীয় ভূখণ্ডের স্কুলগুলোতে শিক্ষা লাভের অধিকার ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁরা ভারতের কাউকে মিথ্যে অভিভাবক সাজিয়ে স্কুলে ভর্তি হত।

বালাপুখুরী ছিটের অধিবাসীদের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের মানুষের সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক হলেও তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়। যার বহিঃপ্রকাশ পায় দূর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে। দুই পক্ষের মধ্যে তা হাতাহাতিতে পৌঁছায়। এরফলে অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছিলেন।[৪১]

বালাপুখুরী ছিটের অরুন রায় (৪০) বলেন যে এই ছিটের ১ কিলোমিটারের মধ্যে ৪টি স্কুল আছে। এখান থেকে কলেজের দূরত্ব প্রায় ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার। এই ছিটে মোট

৬২টি হিন্দু পরিবার বসবাস করেন। এখানকার অধিবাসীরা নিজেস্ব জমির যে কর দিতেন না। কারণ বাংলাদেশে ছিটের ভূমি দপ্তরের অফিস হওয়ায় সেখানে যাওয়ার অনুমতি তাদের দেওয়া হত না। তাই সেই জমিগুলি কেনাবেচা হলে তার রেজিস্ট্রি হতো না। যা কিছু জমি সংক্রান্ত কেনাবেচা সবই হতো মৌখিক ভাবে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে।[৪২]

বালাপুখুরী ১নং ছিটের বাসিন্দারা বলেন তাদের ছিটের অভ্যন্তরে কোন স্কুল না থাকলেও ভারতীয় স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তেমন কোন বাঁধার সন্মুখীন হতে হয়নি। তাঁরা মূলত কুচলিবাড়ী হাই স্কুলে পড়াশুনা করতেন। তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য ছিটের মত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহন করতে হত। আবার হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এই একই রকম ভাবে ভারতীয় কাউকে বাবা-মা সাজিয়ে ভর্তি করানো হত।[৪৩] এই ছিটের ময়নাথ বায় (৪০) ও বালাপুখুরী (১০৬A ছিটের) অধিবাসীদের মূখেও শোনা গিয়েছিল একই সুর। এই দুটি পরিবারের অধিবাসীরা কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। কৃষি নির্ভর হওয়ায় তাঁরা তামাক, পাট, ধান চাষ করতেন। পার্শ্ববর্তী ধাপরা বাজারেই বিক্রি করত। তবে ছিটে কোন সমস্যা হলে স্থানীয় প্রধান, পঞ্চায়েতদের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান করা হতো। এই সমস্ত কিছু পরিবেশে তাঁরা ভারতীয় হিসাবে নিজেদের উপস্থাপন করতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।[৪৪]

বালাপুখুরী ছিটের পার্শ্ববর্তী ছিট ছিল পানবাড়ি। ওই ছিটে খুবেই অল্প সংখ্যক অধিবাসী থাকেন। এই ছিটের খোকা রায়ের কথায় তাদের নির্ম্মম জীবন অভিজ্ঞতার উঠে এসেছে। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭জন। যাদের প্রত্যেকেই পানবাড়ি ছিটের ভূমিতেই বাসবাস করে আসছেন। এই পরিবারের সকলেই নিজেদের ভারতীয় হিসাবে পরিচিতি দিয়ে থাকেন। কিছু জমি জায়গা থাকার দরুন কৃষিকাজই ছিল তাদের একমাত্র পেশা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য

তাঁরা মেখলীগঞ্জ মহকুমার ধাপরা বাজারে যান। এবং জোর গলায় বলেন সরকারের চুক্তি যাই হউক তাঁরা ভারতের সাথে যুক্ত থাকবেন বাংলাদেশে যেতে চান না।[৪৫]

এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সুযোগে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশের সমস্যা অথবা চোর চালানকারী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। সীমানার সুরক্ষার স্বার্থে কাঁটাতারের সীমানা দেওয়া শুরু করলেও ছিটমহলের মধ্যে কোন রকম কাঁটাতার দেওয়ার অধিকার উভয় রাষ্ট্রের ছিল না। এরফলে সীমান্ত প্রহরী বিএসএফদের দ্বারা মূল ভূখন্ডে অনুপ্রবেশের আশঙ্খায় প্রায়শই ভারতীয় ছিটের অধিবাসীরা বাঁধার সন্মুখীন হতেন। এই পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে ছিটমহলের মানুষেরা সংগঠিত হতে শুরু করে। যার ফল স্বরূপ তাঁরা আন্দোলনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

৩.৬. রাষ্ট্রহীনতা সংকট ও ছিটমহল আন্দোলন

ভারত-বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন ভূভাগে থাকা অধিবাসীদের প্রতিকূলতার উৎস ছিল 'রাষ্ট্রহীনতার সংকট'। দেশ দুটি স্বাধীন হলেও সাত দশক পথ যন্ত্রনার স্মৃতি আজও তাদের তাড়িত করে। রাষ্ট্রীয় পরিচিতির অভাবে তাদের করে তুলেছিল ব্রাত্য। যে ব্রাত্যতার মূখ্য বিষয় ছিল মানবাধিকার হীনতা। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারের বিষয়টি খুবই চর্চিত হয়ে উঠলেও ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিটমহলের আদিবাসীদের কাছে মানবাধিকারের বিষয়টি ছিল অমীমাংসিতই থেকে যায়। এই বিষয়টি দুই দেশকে আন্তর্জাতিক দরবারে প্রশ্নের মুখে দ্বারা করিয়েছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারত ভূখন্ড স্বাধীন হলেও ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসীরা নিজেদের স্বাধীন বলে কখনই ভাবতে পারতেন না। তাঁরা রয়ে গেছে দেশের বিচ্ছিন্ন ভূমিতে পরে থাকা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিবাসী। অথচ, তাঁরা কাগজে কলমে ভারতীয়। রাষ্ট্রহীনতায় এই

দৈনন্দিন প্রতিকূলতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে অনেকেই ছিটমহল বিনিময়কে উপযুক্ত সমাধান বলে মনে করেছিলেন।[৪৬]

দেশবিভাজনের পরে ছিটমহলের মানুষের জীবন দোটানার মধ্যে পরে যায়। যেখানে নাগরিকত্বের সমস্যাই প্রথম জটিলতার সৃষ্টি করে। যদিও নাগরিকতার প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সালে *United Nation Human Rights Commission* (UNHCR) দ্বারা বলেছে '*Everyone has the right to nationality*'. যা কার্যকরী করতে ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রহীন মানুষদের রাষ্ট্রীয় নাগরিকের মর্যাদা প্রদানের জন্য *Convention on the Reduction of Stateless* এর আইনী অনুমোদন দেওয়া হয়।[৪৭] প্রতিটি ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকার তৈরী হয় দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে (*jus sanguinis-A rule of law that a child's citizenship is determined by that of his or her parents*) 'যখন কোন ব্যাক্তির নাগরিকত্ব নির্ধারণ হয়, তার জন্ম গ্রহনের স্থানের ওপর' ও (*jus soil- A person acquires citizenship of a nation*) 'একটি মানুষের নাগরিকত্ব নির্ধারণ হয় তার জন্ম গ্রহনের স্থানের ওপর'। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের অধিবাসীদের কোন রাষ্ট্রীয় পরিচয় ছিল না। মূলত তাদের জন্য নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ভূখন্ড কিংবা পিতা মাতার পরিচয়ে তাদের নাগরিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হত না। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তারা একটি ভিন্ন শ্রেণীর মত বসবাস করতেন। তাদের না ছিল ভোটাধিকার, জমির অধিকার, বাজার-ঘাট, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার অধিকার, না ছিল চিকিৎসা পরিষেবা কিংবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা। তাই কখনো কখনো নকল নথি মাধ্যমে অন্য কোন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান হিসাবে তাদের শিশুদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো হত। William Van Schandal এর ভাষায় এদের ভুয়ো নাগরিক (*Proxy Citizen*) বলা যেতে পারে। যারা তার নিজের সন্তানের মূল পিতৃ-মাতৃ পরিচয়কে গোপন করতেন।[৪৮] এই ভাবে ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনই ছিল তাদের একমাত্র হাতিয়ার। তারা সংগঠিত হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে আবার কখনবা দেশীয় স্তরে কিংবা আঞ্চলিক স্তরেও

নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন। তাদের মধ্য থেকেই তৈরি হয়েছিল নেতৃত্ব, পোঁয়াতুরকুঠির মনসুর আলি মিয়া, মশালডাঙ্গা মহঃ বেলাল, নলগ্রামের বিন্দেশ্বর বর্মন, মানিকগঞ্জের জগদীশ রায় প্রধান, বাঁশকাটার বিশ্বেশ্বর বর্মন, বলরাম বর্মন ইত্যাদি ছিটমহল অধিবাসীদের নেতৃত্বে ও আত্মত্যাগে তাদের আন্দোলন সফল হয়।

এই প্রসঙ্গে ছিটমহল আন্দোলনে যুক্ত সংগঠনগুলি নিয়ে নিম্নে পর্যালোচনা করা হল—

(ক) ছিটমহল নাগরিক কমিটি:

১৯৭২ সালে 'ছিটমহল নাগরিক কমিটি' গঠিত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দেবীগঞ্জের কোটভাজনী ছিটমহল সমস্যাকে কেন্দ্র করে ৩৩ জন সদস্য নিয়ে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভারত স্বাধীনতার ২৪ বছরে বাংলাদেশের ভিতরে থাকা মানুষের নাগরিকত্বহীনতা, নিরাপত্তাহীন জীবন ও অসহায়তা নিয়ে এই সমিতিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই সমিতির সভাপতিত্বে ছিলেন মৌলভি মো. মফিজউদ্দিন সরকার ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বিমল কুমার চক্রবর্তী। ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসী হিসাবে তাদের দাবিদাবা গুলি যেহেতু ভারত সরকারের কাছে পেশ করতে হতো তাই এই সমিতির মূল অফিসটি কুচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে স্থাপিত হয়। এভাবে তাঁরা খুব সহজেই তাদের দাবিগুলি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করতেন। ছিটমহল নাগরিক কমিটির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ছিল----

১) পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের অত্যাচারে দেশ ত্যাগের পর, যেসব ছিটমহলের নাগরিক পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তাঁদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান, লুঠতরাজকৃত মালামালের অনুসন্ধান, জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ এবং প্রকৃত মালিকের দখল প্রতিষ্ঠা করা।

২) ছিটমহলগুলিতে সরকারী প্রশাসন প্রবর্তন করা, গ্রাম্য পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত নির্বাচন করা এবং গ্রাম্য চৌকিদার নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো।

৩) উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসনের ব্যাপারে সরকারের কাছে দাবি পেশ করা এবং পুনর্বাসনের কাজে সরকারকে সহযোগীতা করা।

৪) ছিটমহলগুলিতে নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আগের মত পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

৫) ছিটমহলগুলির প্রত্যেক নাগরিক যাতে আগের মতো বাংলাদেশের ভূখণ্ড দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন, অনতিবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা।

৬) মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিনা বাধায় ছিটমহলের হাট-বাজারে আমদানি করার ব্যবস্থা করা এবং ছিটমহলে উৎপন্ন কৃষিপণ্য ভারতের মূল ভূখণ্ডের হাটে-বাজারে কেনাবেচার অধিকার আদায় করা।

৭) ছিটমহলের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও ন্যায়সংগত মর্যাদা রক্ষা করা এবং ছিটমহল গুলোতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিরসন করা।

৮) ছিটমহলগুলিতে শিক্ষা ও দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

৯) সম্প্রদায়গত কোন ভেদাভেদ না করে যোগ্যতার ভিত্তিতে ছিটমহলের শিক্ষিত বেকারদের জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী চাকরির ব্যবস্থা করতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

১০) বিধানসভা নির্বাচনে ছিটমহলের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটদানের ব্যবস্থা করা। ছিটমহলের অধিবাসীদের স্বার্থে বিধানসভা নির্বাচনে ছিটমহল থেকে সদস্য মনোনয়ন দেওয়া এবং ছিটমহলগুলির সমন্বয়ে আলাদা নির্বাচনী এলাকা গঠনের দাবি করা।

দেশভাগের পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি দেখা গেলেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলগুলির সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় ছিল। ১৯৭৪ সালে স্থল সীমানা চুক্তির পরবর্তী সময়ে নতুন করে ছিটমহলের বিনিময় নিয়ে আন্দোলন তিব্র হতে শুরু করে।[৪৯]

(খ) ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি

ছিটমহল আন্দোলনে সবচেয়ে পরিচিত নাম 'ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি'। দীপক সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ১৯৯২ সালে এই কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে সীমান্ত চুক্তি (*Land Boundary Agreement*) এর পর মধ্য মশালডাঙ্গার ২০০০ নাগরিকগন যখন ভারতীয় নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন তখন ছিটমহলের নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দীপক সেনগুপ্ত বিনিময় কমিটির কথা তৎকালীন বামফ্রন্ট্রের চেয়ারম্যান শ্রী বিমান বসু, বাংলাদেশের হাই কমিশনার ও বিদেশ মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে স্মারক পত্রের মাধ্যমে পেশ করেন। দীপক সেনগুপ্তের প্রয়াণের পরবর্তী সময়ে তারই পুত্র দীপ্তিমান সেনগুপ্ত ছিটমহল আন্দোলনের দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৫০] ১৯৯৪ সালে ছিটমহল আন্দোলনকে বিনিময় করণের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বর্গীয় দীপক সেনগুপ্ত প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন ভারত ও বাংলাদেশের ছিটগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তাই রাষ্ট্রহীন নাগরিকদের মুক্তির একমাত্র পথই ছিল ছিটমহল বিনিময়। এই কমিটির নেতৃত্বে ছিটমহল বিনিময়ের আন্দোলন ২০০২ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ পায়।[৫১]

বৃহৎ এই বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের আন্দোলনের কথা তারা দেশে ও বিদেশে বহু সরকারী দপ্তরে তুলে ধরেছিলেন।

(গ) ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল

২০০৫ সালে ১৮ ই নভেম্বর ভারতীয় ছিটমহলের ৪২ জন প্রতিনিধি জমায়েত হয়ে উকিল চন্দ্র বর্মনের সভাপতিত্বে *'ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল'* বা *ছিটমহল ঐক্য পরিষদের* ভিত্তি স্থাপন করেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলগুলি দুষ্কৃতিদের বিচরন ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছিল। ছিটমহলবাসীদের প্রতিনিয়তই নানা অজুহাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, ঘরবাড়ি অগ্নিসংযোগের মত পরিস্থিতির সন্মুখিন হতে হত।[৫২] এই রকম পরিস্থিতির সাক্ষী ছিলেন ১১৯ নং বাঁশকাটা ছিটের বলরাম বর্মন। তার নিজেস্ব প্রায় ২৬ বিঘা ৯কাটা জমি ছিল এবং এই জমির খাজনা দিতেন কুচবিহারের রাজ্যের শাসকদের। ভারতীয় ভূভাগের সাথে যুক্ত হওয়ার পরে ভারত সরকারকে জমির খাজনা দিতেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন ও কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার পর নিজের দেশে আসার পথও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। দিন বদলের সাথে সাথে তাদের ওপর অত্যাচারের পরিমাণও বাড়তে শুরু করে। ২০০১ সালের ১৮ই জানুয়ারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটের অধিবাসী হয়েও বলরাম বর্মনের বাড়িঘর পুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলত, একপ্রকার বাধ্য হয়ে ভিটে মাটি ত্যাগ করে তিনি পরিবারসহ প্রান ভয়ে ভারতে চলে আসেন।[৫৩] এই নিপীড়িত মানুষের দাবি পূরণের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে এই সংগঠনের প্রভাব বাংলাদেশের বাকি ছিটগুলিতেও পরতে থাকে। ফলত বাঁশাকাটা ছিটের পাশাপাশি দাশিয়ারছড়াতেও 'ছিট ঐক্য পরিষদ' তার প্রভাব বিস্তার করে। তবে এই ছিটমহল কমিটি জমি (ছিট) বিনিময়ের প্রসঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল সমন্বয় কমিটির সাথে সহমত প্রকাশ করেনি। তাদের মূল দাবী ছিল ভারতীয় ছিটগুলিকে মূল ভূখন্ডের সাথে করিডোর এর মধ্য দিয়ে সংযুক্ত করা। কিন্তু ছিটমহল

সমস্যা সমাধানের বিষয়ের ওপর সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ধীরে ধীরে তাদের আন্দোলনের গতি শিথিল হতে থাকে।[৫৪]

(ঘ) নলগ্রাম, ফলনাপুর ও জোংড়া নাগরিক সুরক্ষা কমিটি

২০০৪ সালে নলগ্রাম, ফলনাপুর ও জোংড়া এই তিনটি ছিটমহল মিলে 'ছিট নাগরিক সুরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। এই তিনটি ছিটমহল ভারতীয় সীমানার অভ্যন্তরে কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিতলখুচী অঞ্চলের মধ্যে পরে। তাঁরা দাবি করে যে তাদের কাছে থাকা জমির নথিগুলি কুচবিহারের রাজার সম্পত্তির অংশ। পরবর্তীকালে তাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে দিয়ে জগতবেড়ের তিনটি ছিট ও ককোয়াবাড়ি মিলে মোট ৭টি এই কমিটিতে যুক্ত হয়। এই ছিটের সন্তানেরা পার্শ্ববর্তী ভারতীয় ভূখণ্ডে কাউকে পিতা সাজিয়ে শিক্ষার সুযোগ করে নিতেন। পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠ [উচ্চমাধ্যমিক], খলিশামারি ও মহিশমুড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতির অবলম্বনে পড়াশুনার সুযোগ হত। নলগ্রাম, ফলনাপুর ও জোংড়া এই তিনটি ছিটমহলের জমিগুলি ছিল খুব উর্বর। ফলত, জমি কেন্দ্রীক কৃষি কাজ যথেষ্ট উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিপননের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখিন হতে হত। কারণ এই উৎপাদিত দ্রব্যের কোন সরকারী মূল্য নির্ধারণ করা হত না। জ্ঞানেন্দ্র বর্মনের কথায় '*ছিটমহলে জন্মগ্রহণ করাটা একটা অভিশাপ*'। ফলনাপুর ছিটমহল আন্দোলনের অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিজেন্দ্রনাথ বর্মনের (৬০) মতে রাজার আমল থেকেই তাঁরা এই ছিটের অধিবাসী। তাঁরা রাজার কাছেই এই জমির খাজনা দিতেন। তাদের পক্ষে ছিটমহলকে বাংলাদেশের সাথে যুক্ত করা প্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করেন। কুচবিহারের মানুষের সাথে তাঁরা ছিল মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অতপ্রত ভাবে যুক্ত। ছিটমহলের সংগঠনগত দিক থেকে "ছিট নাগরিক সুরক্ষা কমিটি" ছিল ভারতের ভূভাগের অভ্যন্তরে তাদের মতামত/কথা ব্যাক্ত করার একমাত্র নাগরিক মঞ্চ।[৫৫]

(ঙ) ছিটমহল বিনিময় সংগ্রাম কমিটি

হরিপদ মন্ডলের নেতৃত্বে ২০০৯ সালে 'ছিটমহল বিনিময় সংগ্রাম কমিটির' আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন আবুল হোসেন সরকার ও হরিপদ মণ্ডল ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। তাদের কমিটির মুখ্য দাবি ছিল 'ছিটমহলের বিনিময়'। তারা তাদের এই দাবিদাওয়ার কথা সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রীর, জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকের কাছে স্মারক লিপি আকারে প্রদান করেছিলেন। ২০০৯ সালে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির হাতেও ছিটমহলের বিনিময়ের স্মারকলিপি তুলে দিয়েছিলেন।

এই ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছিটমহল বিনিময় সংগ্রাম কমিটি তাদের আন্দোলনকে বাস্তবিক রূপ দিয়েছিলেন। যার ফলস্বরূপ ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে মূল ভূখন্ডের অধিবাসী রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।[৫৬]

(চ) Indian Enclave Refugee Association বা ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু কমিটি

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল থেকে আগত বাসিন্দারা 'ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু কমিটি' গঠন করেন। এই উদ্বাস্তু মানুষদের প্রসঙ্গে প্রাথমিক তথ্য প্রায়ত সাংসদ অমর রায় প্রাধন *Rule of Jungle* গ্রন্থের উঠে আসে। তিনি উদ্বাস্তু বা বাস্তুচ্যুত হতে আসা মানুষগুলোর অভিমত প্রসনের পাশাপাশি তাদের আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বীরেন রায় (৬৩) ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু কমিটির সভাপতি বলেন যে তাদের জমির ধান কেটে নিয়ে যায়। এছাড়াও ঘরের মহিলাদের ওপর অত্যাচার করতো। কিন্তু তাদের অভিযোগ শোনার মত কেউ ছিলেন না।[৫৭]

হৃদয় নাথ রায় (৬৭) বলেছিলেন, ১৯৭৮ সালে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়। তিনি এই বিষয়ে পার্শ্ববর্তী দেবীগঞ্জ থানায় জানিয়েছিলেন। এবং ওই দিনেই মৌলবাদীরা তার বাড়িতে হামলা চালায়। একই সাথে পরিবারের সদস্যদের মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। তবে বাংলাদেশী মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীর সহায়তায় কিছু দিন আত্ম গোপন করে থাকেন। পরবর্তীতে ভারতীয় ছিটের ভূসম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করে বাকিদের মতো ভারতীয় মূল ভূখন্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৫৮]

উপরি উল্লেখিত আলোচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ছিটমহলের সমস্যাকে সামনে তাঁরা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু যদি তিনবিঘা চুক্তি আঙ্গারপোতা-দহগ্রামের মধ্যে সংযুক্ত হতে পারে, তাহলে শুধু দেড়বিঘা জমি বাংলাদেশ সরকার দিলেও ভারতীয় বেহুলাডাঙ্গা, নটকটোকা, কাজলাদিঘি সহ মোট ১৩ টি ছিটমহল সমস্যা সমাধান হয়ে যেতে পারতো।[৫৯] যা বাংলাদেশ সরকার দিতে রাজি হয়নি। ফলত, বাংলাদেশের ভিতরে ভারতীয় ছিট থেকে ভিটে মাটি ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে এসে তাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি মেলে নি। তারা তাদের এই সমস্যার কথা বহুবার ভারত সরকারের সন্মুখে তুলে দাবিদাবার মাধ্যমে ধরেছিলেন। সেই দাবিগুলো ছিল –

(ক) ভারতীয় ছিটমহল থেকে আগত শরনার্থীদের ভারতে পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা।

(খ) ভারতীয় ছিটমহলের শরনার্থীদের দেড় বিঘা করিডোর দিয়ে দেশান্তরণের অধিকার স্থাপন।

(গ) ছিটমহল শরণার্থীদের জন্য রেশন কার্ড জারি করা।

(ঘ) ছিটমহল শরণার্থীদের জন্য প্রশাসনিক এবং চিকিৎসা বিষয়ক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) ছিটমহল শরণার্থী পরিবারগুলির শিশুদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা করা।

(চ) শরণার্থীদের বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করা।

(ছ) ছিটমহল শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা।

বর্তমানে তাদের ভোটার কার্ড থাকলেও সরকারী ভাবে বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হয়নি। তাই ক্ষোভের সাথে জগদীশ রায় প্রধান ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু কমিটির সদস্য বলেছিলেন--

"দুঃখের কথা আজ যখন বিনিময় মুহূর্তে জনগণনা নিয়ে হইচই হচ্ছে তখন ভারতীয় ছিটমহলে তারাই জায়গা পেল যারা ভারতীয় ছিটমহলের মূল অধিবাসীদের বিতাড়িত করেছে'।[৬০]

(ছ) দক্ষিণ বেরুবাড়ি প্রতিরক্ষা কমিটি

হলদিবাড়ী থেকে পশ্চিমে সাঁতকুড়া ছিল একটি দ্বীপের মত জায়গা। দেশভাগের পরে র‍্যাডক্লিফ্ সাহেবের সীমানা নির্ধারণের ত্রুটির কারণে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অ্যাডর্ভাস্ পজিসনের সৃষ্টি হয়। যা দক্ষিণ বেরুবাড়ি সমস্যা নামে পরিচিত। যদিও আগে এই অঞ্চলটিকে ১২ নং এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হত।[৬১] অ্যাডর্ভাস্ পজিশনে ভারতের জমির পরিমান ছিল ২৭৭৭.০৩৮ একর ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিল ২২৬৭.৬৮২ একর। ১৯৫৮ সালের বেরুবাড়ি

বাটোয়ারা নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয় তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৬২ সালে এই অঞ্চলের সীমানা নিরীক্ষণ করতে বাঁধা দেওয়া হয়।

বেরুবাড়ি ১,২,৩,৪ মৌজার মধ্যে অ্যাডর্ভাস্ পজিসনের জমিগুলো অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এই জটিল সমস্যা সমাধানে 'দক্ষিণ বেরুবাড়ি প্রতিরক্ষা কমিটির' আন্দোলনের তিব্রতা এতটাই বেশি যে তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেও বেরুবাড়ীকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রহীনতার বিষয়ে অবগত করেন। ১৯৭৪ সালে স্থল সীমানা চুক্তি হওয়ার দরুন দক্ষিণ বেরুবাড়ির মানুষেরা আসা করেছিল যে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু ১৯৮৯ সালে সাঁতকুড়াতে BSF ক্যাম্পের ৭৬৯ নং পিলার অতিক্রম করে তারা যখন ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে 'প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্যদের' বাঁধার মুখে পরতে হয়। কারণ ১৯৭৪ সালে চুক্তিতে বলা হয় "*দক্ষিণ বেরুবাড়ির দক্ষিণাংশের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে*'। যখন বাংলাদেশ সরকার সীমানা নির্ধারণ করা শুরু করে তখন দেখা যায় সীমানার অভ্যন্তরে কিছু খণ্ড খণ্ড ভূভাগ ভারতের ও বাংলাদেশের মধ্যে থেকে যায়। দক্ষিণ বেরুবাড়ি সমিতি দুই দেশের হাই কমিশনারের সাথে আলোচনায় বসে। এই মিটিং এ তাঁরা দাবি করে যে দুইদেশের বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডগুলি দুইদেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করার ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া হয়। [৬২]

২০১৫ সালে ৩১ শে জুলাই ছিটমহল বিনিময়ের সাথে ভারত ও বাংলাদেশের অ্যাডর্ভাস্ পজিসন এর চিহ্নিত দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নাওতারি দেবত্তর, কাজলাদিঘি-পরানি গ্রাম ৬২৮.৯৮ একর, নাওতারি নবাবগঞ্জ থেকে ৪.৪৭ একর, বরশশী থেকে ৭৪.৪৪ একর এবং চিলাহাটা থেকে ৫৪৫.৭০ একর জমি ভারতের সাথে যুক্ত হয়। আবার উল্টো দিকে বাংলাদেশ ২৬০.৫৫ একর জমি পেয়েছিল। দক্ষিণ বেরুবাড়ি মৌজাকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়। এক নম্বর ভাগে ১৬৩.৬৫ একর, দুই নম্বর ভাগ থেকে ৯.৯৭ একর, তৃতীয় নম্বর ভাগ থেকে

২৩.৭৮ একর, এবং চতুর্থ নম্বর ভাগ থেকে ৬৩.১৫ একর।[৬৩] দক্ষিণ বেরুবাড়ি আন্দোলনের কারণে ছিটমহলের পাশাপাশি অ্যাডর্ভাস্ পজিশনের জমিরও সমস্যার ইতি ঘটে। দক্ষিণ বেরুবাড়ি অঞ্চলের প্রায় ২৫,০০০ মানুষের নাগরিকত্বের পাশাপশি জমির অধিকারও ফিরে পায়।

৩.৭. দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সীমান্ত সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর্ব মিটতেই ১৯৪৯ সালে কুচবিহার 'গ' শ্রেণিভূক্ত রাজ্য হিসাবে ভারত ভুক্তি চুক্তি দ্বারা ভারতের মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব ও অস্থির অবস্থা ভারত ও পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর মধ্যে ছিটমহলের উৎসের যোগসূত্র গড়ে ওঠে।[৬৪] যার ফলে দেশভাগ পরিস্থিতিতে একটা অস্থিরতা উভয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই কাজ করেছিল। আবার সেই সঙ্গে দেশান্তরগত সমস্যা উভয় রাষ্ট্রকেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সামনে দ্বার করিয়ে দিয়েছিল। যে পরিস্থিতিতে একে অপরের প্রতি যেমন দোষারোপের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তেমনি আবার তৈরি হয় উভয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততা। *Train to Pakistan* এই গ্রন্থে Khushwant Singh বলেছিলেন—"*Muslim said the Hindus had planned and started the killing. According to the Hindu, the Muslim were to blame. The fact is both sides killed both shot and stabbed and speared and clubbed. Both tortured raped.*"[৬৫]

দেশভাগ পরবর্তী অধ্যায়ে ছিটমহল সমস্যা থাকলেও তাঁরা উভয়েই আবার সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধান করতে শুরু করে। কারণ দেশভাগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে যে ত্রিপাক্ষিক অবস্থার দ্বারা ছিটমহলের সংযুক্তিকরণ হয়েছিল, ১৯৫০ এর চুক্তির ফলে তা আরো জটিল রূপ নিতে শুরু করে। যদিও স্বাধীনোত্তর পর্বে ছিটমহল পরিদর্শনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ফলত, ভারত ও পাকিস্তানের নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র নিয়ে যাতায়াতের স্বীকৃতির বিষয়টির প্রস্তাব

দেওয়া হয়। আবার ছিটমহলের অধিবাসীরা উভয় ছয় মাস অন্তরে একবার করে জমির কর ও খাজনা আদায়ের অধিকার পেয়েছিলেন। যা উভয় রাষ্ট্রের সমঝোতায় মধ্য নিয়ে সম্ভব হয়েছিল। ফলত, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মূল ভূখণ্ডের সাথে (ছিটমহলের ভূভাগে) কোন কাঁটাতার না থাকায় ছিটের অধিবাসীরা মূল রাষ্ট্রের নাগরিকরা পরিজনদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেত। কিন্তু ২০১০ সালের পর থেকে ছিটমহলের অধিবাসীদের ভারতের মূল ভূখণ্ডে আসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ছিটের মানুষ বলে কটুক্তি করা হত। যার ফলস্বরূপ ছিটের থাকা অধিবাসীদের পন্য কিংবা চাষবাসের কোন জিনিষ মূল ভূখণ্ডের গ্রামের হাটে-বাজারে বিক্রির অনুমতি দেওয়া হত না। এই পরিস্থিতিতে তাদের অনেকেই এক প্রকার বাধ্য হয়েই অসামাজিক কার্যের সাথে জড়িয়ে পরতেন। যা ছিটমহলের নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপহীন দৈনন্দিন জীবনে অস্থিরতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

১৯৫১ সালে যখন পাকিস্তানের প্রথম আদমসুমারীতে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ছিটমহলের অধিবাসীদের কাউকেই সেই জনগনণার আওতায় আনা হয়নি। তার ফলে এই ছিটমহলকে নিয়ে সেই স্থানে থাকা অধিবাসীদের মনে নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। যা দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমস্যার সামাধান খুঁজতে আলোচনা ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল।[৬৬]

৩.৭.১. বেরুবাড়ি কথা- ১৯৫২ সালে জলপাইগুড়ি জেলার ছিটমহল হস্তান্তর

দেশভাগের পর ছিটমহল সমস্যা সামাধানের জন্য বেরুবাড়ি ছিল প্রথম উদ্যোগ। ১৯৫২ সালে ২৭ সে জুন বিজ্ঞপ্তি নং 2427/P1/PI J-4/52-এ কুচবিহার ছিটমহল ১) সিঙ্গিমারী প্রথম খন্ড; ২) সিঙ্গিমারী দ্বিতীয় খন্ড; ৩) সাকাতি; ৪) ছিটবিন্নাগুড়ি; ৫) দৈখাতা ওকড়াবাড়ি ছিটমহলগুলি হলদিবাড়ী থানা থেকে জলপাইগুড়ি থানার সাথে যুক্ত হয়। বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতের অধীনে হয় ছিট বিন্নাগুড়ি, ছিট সাকাতি, দৈখাতা ওকড়াবাড়ি যা ১২ নং ইউনিয়নের অধীনে চলে আসে। এই

সংযোগের ফলে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে বৃহত্তর বেরুবাড়ি মৌজার ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ নং ছিটগুলি বাংলাদেশের দখলে এলেও ২৫, ২৮, ২৯ ও ৩০ নং ছিটের অংশ কুচবিহারের দখলে থাকায় প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই ২৮, ২৯, ৩০ নং ছিট ভারতের দখলে থাকলেও তা পূর্ব পাকিস্তানে সঙ্গে *'হুকুম পাকিস্তান'* নামেই সংযোজিত হয়।[৬৭]

সরণি-৩: জলপাইগুড়ি জেলার ছিটমহল হস্তান্তর

তালিকা

ক্রমিক নং	ছিটের নাম	ছিটের নম্বর
১.	সিঙ্গিমারী	৭১
২.	সিঙ্গিমারী (অংশ I)	৭১
৩.	সিঙ্গিমারী (অংশ II)	৭৪
৪.	সাকাতি	৬২
৫.	সাকাতি	৬৩
৬.	সাকাতি	৬৪
৭.	সাকাতি	৬৫
৮.	সাকাতি	৬৬
৯.	সাকাতি	৬৭
১০.	সাকাতি	৬৮
১১.	সাকাতি	৬৯
১২.	সাকাতি	৭০
১৩.	বিন্নাগুড়ি	৬১
১৪.	বিন্নাগুড়ি	৮১
১৫.	দৈখাতা	৩৯
১৬.	দৈখাতা	৪০
১৭.	দৈখাতা	৪৩

তথ্যটি গৃহীত হয়েছে: Brendan R. Whyte; Waiting for the Esquimo A historical documentary study of the Cooch Behar enclaves of India and Bangladesh, University of Melbourne, পৃ.৩২২।

৩.৭.২. ১৯৫২ সালে ভারত-পাকিস্থানের পাসপোর্ট ও ভিসা চুক্তি

১৯৫১ সালের আদমসুমারীর পর পাকিস্তান সরকারের ছিটমহলগুলির ওপর আগ্রহ যথেষ্ট কমতে থাকে। তার ফলে শীঘ্রই ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণকে ধরে রাখার জন্য পাকিস্তান সরকার নানা রকম কঠোরতম পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। যার প্রভাব ছিটমহলে গিয়েও পরে।

১৯৫২ সালে ১৫ই অক্টোবর পাসপোর্ট আইনের প্রভাব ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসীদের বহিঃরাষ্ট্রের মত করে দেখার প্রবনতা তৈরি হতে দেখা যায়। ফলত, পাকিস্তানে প্রবেশ করাটা অবৈধ হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু ছিটমহলের মানুষদের মূল ভূখন্ডে প্রবেশের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট আইনের আওতায় ভিসা দেওয়া নিষিদ্ধ থাকায় তাদের সমস্যা আরো জটিল আকার ধারন করে। ছিটমহলের মানুষেরা মূল ভূখণ্ডের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। যার পরিনতি হিসাবে অবৈধ অনুপ্রবেশের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা নিজের দেশের ভোটাধিকার থেকেও যেমন বঞ্চিত হয়, তেমনি রাষ্টীয় জনগণনার আওতা থেকেও তার বাদ পরে। যদি মূল রাষ্ট্রের সরকারী কর্মচারী প্রতিবেশী দেশের ছিটমহলে প্রবেশ করে তবে তাকে তাদেরও ভিসা অধিগ্রহণের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। যে প্রতিকূলতার চিত্র ভারতীয় সীমানার অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলগুলিতেও ধরা পরে। ফলে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ছিটের অধিবাসীরা সরকারী সমস্ত রকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।[৬৮] Indo-Pakistan Passport Conference এর (New Delhi,28 January to 1st February 1953) সংক্ষেপে বলা হয়, উভয় দেশের ছিটমহলের বাসিন্দাদের আবেদনের ভিত্তিতে ছিটমহলগুলির মধ্যে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট রুট বরাবর ট্রানজিটের ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও, যারা ক্যাটাগরি 'A' ভিসার ধারক অন্য

যেকোন ভিসাও পেতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসীদের কাছে না ছিল ভোটাধিকার কার্ড কিংবা আধার কার্ড। ফলত, ভিসা দিয়ে যাতায়াতের কথা উল্লেখ করলেও প্রকৃত পক্ষে ভিসা গ্রহন করা সম্ভব ছিল না।[৬৯]

৩.৭.৩. ১৯৫৮ সালের নেহেরু-নুন চুক্তি

১৯৫২ সালের পাসপোর্ট আইনের অধীনে উভয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রহীন নাগরিকদের সমস্যা ক্রমশ কঠিন আকার ধারণ করে। ভারত ও বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার আশ্রয় গ্রহণ করে। যার ফল স্বরূপ ১৯৫৮ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর নেহেরু-নুন চুক্তি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গৃহীত হয়। দিল্লীতে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নেহেরুর পররাষ্ট্র সচিব এম.কে দেশাই এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব এম.কে.বেগ এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ২(১০) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ---

> "*Exchange of old Cooch Behar enclaves in Pakistan and Pakistani enclaves in India without claim to compensation for extra area going to Pakistan is agreed to*".

এই চুক্তির দ্বারা একটা সমাধানের রাস্তা খোঁজা হলেও ভারতে দিক থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পাকিস্তানের হাতে ৪,৯০৫.৭৪ একর অতিরিক্ত দিতে হবে। কিন্তু এই চুক্তিই যে সর্বোচ্চ ছিল এমনটাও এটাও বলা যায় না।[৭০] অন্যদিকে এই দিনেই ভারতের লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নেহেরু-নুন চুক্তির বিষয়টির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই চুক্তিতে ভারতের যে সীমানার অভ্যন্তরে কি ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে তা নিয়ে উল্লেখ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১০ হাজার মানুষ সমস্যার সন্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এই অধিক পরিমান জমি হস্তান্তর করার ব্যাপারে সমর্থন জানিয়ে

ছিলেন। তিনি মনে করেন এই পথ ছাড়া আর কোন বিকল্প রাস্তা তাঁর কাছে ছিল না। যার ফলে ছিটমহল নিয়ে আরও এক সমস্যার উন্মোচন হতে দেখা যায়।

স্বাধীন প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু তৎকালীন সময়ে ছিটমহলের বিনিময়ের গুরুত্ব আরোপ করে দৃঢ় মতামত প্রকাশ করেন। যদি প্রধান মন্ত্রীর মতামতের গুরুত্বকে অনুভব করতেন তাহলে হয়তো ছিটমহল সমস্যার সৃষ্টি হতো না। তাহলে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা ভারতের সাথে একাত্ব হয়ে তিনবিঘা করিডোর থেকে কুচলিবাড়ী কলসির মত গ্রামটিরও করুণ বেদনার সমাপ্তি সেদিনেই হয়ে যেতো।[৭১] নেহেরু-নুন চুক্তির ২ (৩) নং ধারায় বলা হয়েছিল যে ১২ নং বেরুবাড়ি অর্ধেক এলাকা পাকিস্তানকে দিয়ে দিবে। আর যে বাকি অংশ থাকবে তা থাকবে ভারতের দখলে। এই চুক্তিকে এটাও বলা হয় যে বিভাজনের ফলে পাকিস্তানের পঞ্চগড় থানা পশ্চিমবঙ্গের ১২ নং ইউনিয়নের কুচবিহারের ভারতীয় ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত রাখা হবে। [৭২]

১৯৫৮ সালে বেরুবাড়ী চুক্তির পরবর্তীকালে ভারতীয় সিদ্ধান্তের বিরোধে আঞ্চলিক স্তরে ক্ষোভ বিক্ষোভও কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ১৯৫৯ সালে ২২শে মার্চ দক্ষিণ বেরুবাড়ী মানিকগঞ্জে প্রতিবাদী সভা সংগঠিত হয়। নেহেরু-নুন চুক্তির প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের থেকেও প্রতিবাদ সংগঠিত হতে শুরু করে। এই আন্দোলনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব যারা করেন, তাদের মধ্যে নাম - (স্বতন্ত্র পার্টির) স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মী নেতা নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জী, কংগ্রেসের ধীরেন বাগচি, সিপি আই দলের নরেশ চক্রবর্তী, ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত কুমার, অপূর্বলাল মজুমদার, হিন্দু মহাসভার নিত্য নারায়ন ব্যানার্জী প্রমূখেরা। এই নেতৃত্বেরই নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিরোধীতা। তাঁর সূচনার মধ্য দিয়েই বেরুবাড়ী সমস্যা এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ভারতীয় ভূখন্ডের গণ আন্দোলনের রূপ থেকে আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করে। এই আন্দোলনকারীদের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু তবুও

বেরুবাড়ী আন্দোলনকে দমন করা যায় নি।[৭৩] দক্ষিণ বেরুবাড়ি আন্দোলনের ফলেও সরকার ৭৪৫০.০৭ একর জমি বিনিময় করায় নেহেরু-নুন চুক্তিও ছিটমহল সমস্যা সমাধানে অসমর্থ হয়।

৩.৭.৪. ১৯৭৪ সাল ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি

১৯৫৮ সালের নেহেরু-নুন চুক্তির পরবর্তীকালে ক্ষোভ-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্কে অতিবাহিত হয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেন যে ১২ নং বেরুবাড়ী ইউনিয়নের ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সংবিধানের সংশোধন ছাড়া তা বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। ফলত, সরকার সংবিধানের ৯ নং আইনের অনুচ্ছেদটি সংশোধন করে ও ১৯৬১ সালের আইনটি বলবৎ করা হয়। এরফলে সংঘর্ষের মাত্রাও আরোও তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৬২ সালে শুরু হয় ভারত-চীন যুদ্ধ, সমসাময়িক সময়ে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দহগ্রামে ১২ জন নিহত হন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন হলেও এই সন্ধিক্ষণে বেরুবাড়ী সমস্যার কথা চাপা পরে যায়।[৭৪]

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মজিবুর রহমান ১২ই থেকে ১৭ই মে ১৯৭৪ সালে ভারত সফরে আসেন। বাংলাদেশের মত নবীন রাষ্ট্রের পক্ষে সীমান্তের নিরাপত্তা ছিল প্রাথমিক শর্ত। এই সফরে উভয় রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাঝে যোগাযোগ, চোরাচালান কার্য বৃদ্ধি নিয়ে আশঙ্খা, পাট শিল্পের অগ্রগতির জন্য ভারত সরকার কতৃক নবগঠিত বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। একই সাথে সীমানা চিহ্নিতকরণ ও উভয় রাষ্ট্রের ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি নিয়েও এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৭৫]

১৯৭৪ সালে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আলোকপাত করা হয়। ১৯৭৪ সালে ১৬ই মে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী

শেখ মজিবুর রহমান '*ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি* স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ১৪ নং অনুচ্ছেদে এই প্রস্তাবে ১২ নং বেরুবাড়ি ইউনিয়নের দক্ষিণ দিকের অর্ধেক ও সংলগ্ন ৪টি ছিটমহল ভারতে থাকবে বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়। যার আনুমানিক আয়তন ২.৬৪ বর্গ মাইল। এর বিনিময়ে বাংলাদেশকে আঙ্গারপোতা ও দহগ্রাম ছিটমহল দুটি পানবাড়ি মৌজা পাটগ্রাম থানার করিডোর নির্মাণে ব্যবহার করতে দিতে হবে। এই করিডোর মেখলীগঞ্জ মহকুমায় একখন্ড দিয়ে বাংলাদেশের সাথে চিরস্থায়ী লিজ দেওয়া হয়।

ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি ছিল ছিটমহল সমস্যার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমাধানের রাস্তা খোঁজার প্রচেষ্টা। এই দ্বিতীয় পর্যালোচনায় ইন্দিরা-মুজিব চুক্তিতে ১২ নং ধারায় বর্নিত হয়েছে ---

> *The Indian enclaves in Bangladesh and Bangladesh enclaves in India should be exchanged expediously excepting the enclaves mentioned in paragraph 14 without claim to compensation for the additional area going to Bangladesh'.*[৭৬]

বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মুজিব সরকারকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কারণ চুক্তির প্রথম অনুচ্ছেদের ১২ ও ১৪ নম্বর ধারায় দক্ষিণ বেরুবাড়ী সংলগ্ন ৪টি ছিটের ২৫৪৪.৩৩ একর জমি ভারতের দখলে থাকলেও আঙ্গারপোতা ও দহগ্রামের জমির পরিমাণ ৪৬১৬.৮৫ একর 'তিনবিঘা করিডোর' এর গঠন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও তা এক অর্থে বাংলাদেশ সরকারের জমির পরিমান বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাংলাদেশের মূল ছিটমহলের জমির পরিমাণ কমে দাড়ায় ৭,৬৭২.৫২ একর। অপরদিকে ভারতের ছিটের জমির পরিমাণ লক্ষ্য করা যায় তবে তা ছিল ১৭,১৯৮.৪৮ একর। এক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের দিক থেকে বাংলাদেশের সাথে ভারতের জমির পরিমাণ কমে দাড়ায় ৯৫২১.৯৬ একর।[৭৭] এই চুক্তির ফলে এক অর্থে বাংলাদেশ লাভবান হয়।

৩.৭.৫. তিনবিঘা চুক্তি

ভারত সরকার ও বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির আন্দোলন সংক্রান্ত টানাপোড়ণের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে চুক্তিটি হয়েছিল যা হল '*তিনবিঘা চুক্তি*'। আন্তর্জাতিক স্তরে দুই রাষ্ট্রের কাছে এটি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি ছিল। তিন বিঘা চুক্তির মধ্য দিয়ে দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। তিনবিঘায় ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এই সময় আবারো ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর বিদেশমন্ত্রী পি.ভি. নরসিংহ রাও ও বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী জনাব এ.আর. সামসুদ্দোহা নতুন দিল্লীতে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে বলা হয় বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ, আধা-সামরিক ও সামারিক বাহিনী তাদের অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ, সাজসরঞ্জামও সরবরাহ সহ লীজভূক্ত এলাকায় স্বাধীন ও বাঁধাহীন ভাবে চলাচলের অধিকার পাবে। এছাড়াও করিড়োরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বা ভিসার অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। এই লীজ অধ্যষিত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের নিত্য ব্যবহার্য পন্য সামগ্রী কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বহন করতে পারবে। এক্ষেত্রে কাস্টম ডিউটি ট্যাক্স বা অন্য কোন প্রকার লেভি বা ট্রানজিট চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অপরদিকে ভারতীয় নাগরিক, পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনীর লোকজন উভয় দিকে বাধাহীন চলাচলের অধিকার পাবে। লীজ অধ্যুষিত এলাকায় কোন ব্যাক্তি অপরাধমুলক কাজ করলে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী বিচার করা হবে।

আবার অন্যদিকে 'তিনবিঘা চুক্তি' প্রতিবেশী ভারতের মূল ভূখণ্ডে ও তার নিকটস্থ ছিটমহলগুলির মধ্যে বিক্ষোভের পরিবেশ তৈরি করে। তিনবিঘা এলাকা যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ভারতের অভ্যন্তরে কুচলিবাড়ী গ্রামের সার্বভৌমিকতা প্রশ্নের মুখে পরে যায়। ফলে কুচলিবাড়ী গ্রামের অধিবাসীরা বিভোক্ষের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে আন্দোলনকে একমাত্র পথ বেছে নেয়। যে আন্দোলন নেতৃত্বে ছিল 'কুচলিবাড়ি সংগ্রাম সমিতি'।[৭৮] ১৯৮১ সালে 'কুচলিবাড়ী সংগ্রাম সমিতির'

সদস্য সুধীর রায় পুলিশের গুলিতে প্রান হারায়। এই পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারন করে। তিনবিঘাকে কেন্দ্র করে সমিতির আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিজেপি, কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস.এউ.সি.আই (SUCI), শিবসেনা, বজরং দল প্রতক্ষ্য ভাবে আন্দোলনে যোগদান করে। তিনবিঘা মাতৃভূমি রক্ষায় দূর্গা বাহিনীর সমর্থন কুচলিবাড়ী অধিবাসীদের আন্দোলনে মানুষিক শক্তি জুগিয়ে ছিল। [৭৯]

১৯৮৩ সালের চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী সহ ওই অঞ্চলের জনগন আদালতের দ্বারস্ত হয়। কোলকাতা হাইকোর্ট তিনটি পিটিসন করা হয় –

১। ১৯৭৪ সালের স্থল সীমান্ত চুক্তি এবং ১৯৮২ সালের উভয় রাষ্ট্রের বিদেশ মন্ত্রীর তিনবিঘা লীজ চুক্তি ১৯৫৮ সালের নেহেরু-নুন চুক্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

২। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে যেহেতু তাদের চিরস্থায়ী লীজ দেওয়া হয়েছে তাই সেক্ষেত্রে ভারতীয় কুচলিবাড়ী অঞ্চল পরিত্যাগের সমপূরক।

৩। লীজের শর্তাবলী লীজ দেওয়া এলাকায় ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করবে।[২৭]

যদিও ১৯৮৩ সালে ১লা সেপ্টেম্বর সমস্ত পিটিসনকে নাকচ করা হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে সংগঠনের তরফ থেকে আবারো কোলকাতা হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চে আপিল করা হয়। এই রায়ে বলা হয় বেরুবাড়ী ইউনিয়ন যাতে বাংলাদেশকে হস্তান্তর করা না হয়, তার জন্য সংবিধানের সংশোধন জন্য অনুরোধ জানায়। সেখানে বলা হয় ব্যাক্তি মালিকানার জমি অধিগ্রহনের পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ওই এলাকার জন্য ভারতীয় দন্ডবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। এই রায়ের বিরুদ্ধে ভারত সরকার সুপ্রিম কোটে দারস্থ হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয় 'নবম সংশোধনীতে পরিকল্পিত ১২ নং বেরুবাড়ীর ইউনিয়ন সহ অন্যান এলাকা যাতে বাংলাদেশকে হস্তান্তর করা না হয় সেজন্য সংবিধান সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই বলে জানায়। সংবিধানের

নবম সংশোধনী কার্যকর হয়নি। সে কারণে ১৯৭৪ ও ১৯৮২ চুক্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া বা সরকারী গেজেটের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয়নি। ডিভিশন বেঞ্চের অভিমত এই যে এতে কোন এলাকা ছেড়ে দেওয়ার বা পরিত্যাগের প্রশ্ন নেই। সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগের কোন প্রশ্ন নেই এবং এই কারণে পূর্বোল্লেখিত প্রকৃত ঘটনার প্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই'। এই রায়ের ফলে ভারত সরকার চুক্তি রূপায়নে সবরকম পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৮০]

তিনবিঘাকে কেন্দ্র করে মানুষদের মনে একাধিক ক্ষোভ মাথাচাড়া দিতে থাকে। তিন বিঘা নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধ থাকায় পুলিশ, সি.আর.পি.এফ. ও বি.এস.এফ দ্বারা তিনবিঘা করিডোর পরিবেষ্ঠিত করা হয়। তা সত্ত্বেও তিন বিঘার পুলিশ ও জনতা সংঘর্ষ হয়। এই আন্দোলনের ফলে তিন জন শহীদ হন। এর প্রতিবাদে তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি সকাল ৫টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বনধ্ ঘোষনা করে। কিন্তু সেই রাজ্য সরকারে বলপূর্বক তাদের আন্দোলনকে দমন করে।[৮১] তাই কথায় কথায় তিনবিঘার পাশে কুচলিবাড়ির মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে আছে তিনবিঘার সেই মর্মান্তিক দৃশ্য। কিন্তু সমস্ত পরিস্থিতিকে নস্যাৎ করে তিন বিঘায় চুক্তি সম্পন্ন হয়। তিনবিঘা চুক্তির পরবর্তীকালে কুচলিবাড়ি গ্রামের সার্বভৌমিকতার ক্ষেত্রে আজও প্রশ্ন উঠে। তাঁদের কথায়—

> *কুচলিবাড়ির মানুষগুলো তিনবিঘার সবচেয়ে বিরোধীতা করেছিল। তাদের কথায় তিনবিঘাকে চুক্তি আনুযায়ী কার্যকারী করার জন্য মিরগিপুর ছিট সামনে আছে সেখানে থেকে পুলিশে ভারিয়ে দিয়েছিল। আজ বাংলাদেশের অধিবাসীরা নিজেদের জন্য সবেই করে নিল। কিন্তু আমরা সেই কলিসির মতো গ্রাম কুচলিবাড়িতেই পরে থাকলাম।*[৮২]

২০০১ সালে আঙ্গারপোতা ও দহগ্রামের মানুষদের জন্য তিনবিঘা করিডোর এর গেট খোলার সময় সীমা ৬ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ২৪ ঘণ্টা করা হয়। এর কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার

সম্পূর্ন বাঁধাহীন চলাফেরার জন্য উড়ালপুলের জন্য প্রস্তাব জানায়। কিন্তু এই প্রস্তাব তিন বিঘার পার্শ্ববর্তী কুচলিবাড়ী গ্রামের মানুষ মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা মনে করেন সর্বক্ষণ বাংলাদেশের নাগরিকদের ভারতের মূল ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে যাতায়াতের সুযোগ হলে, কুচলীবাড়ি গ্রামের মানুষদের নিরাপত্তগত সমস্যা তৈরি হবে।[৮৩]

৩.৭.৬. স্থল সীমান্ত চুক্তি (Land Boundary Agreement) ২০১১ ও প্রোটকল

ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল আন্দোলনের ফলস্বরূপ ২০১০ সালে ছিটমহলবাসীদের জনগনণা শুরু হয়। যে জনগনণার ভিত্তিতে ২০১১ সালে উভয় দেশের ছিটমহলবাসীর মোট জনসংখ্যা হয় ৫১,৫৪৯ জন। এরমধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসীদের সংখ্যা ৩৭,৩৩৪ জন। উল্টোদিকে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ ছিটে জনসংখ্যা ১৪,২১৫ জন।[৮৩]

ছিটমহলের সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধানের উদ্দ্যেশে ২০১১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মনমোহন সিং দুই দিনের জন্য বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে দুই দেশের সীমানা নিয়ে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে 'সীমানা সংক্রান্ত' নথি (Protocol) স্বাক্ষর করেন। এর ফল স্বরূপ ভারত ও বাংলাদেশের অমীমাংসিত ১৬২ ছিটের সমস্যার সমাধানে উভয়ই উদ্যোগী হয়। ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য উভয় দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এতে তাঁরা কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ছিটমহলে বাঁধাহীন ভাবে বিনিময় করতে সম্মত হন। এই প্রোটকলে্ বিস্তারিত ভাবে বিচ্ছিন্ন ভূভাগের চিত্রাঙ্কন যেমন করা হয়েছিল অন্যদিকে সীমানার বিচ্ছিন্ন ভূভাগ গুলির ওপর আলোকপাত করা হয়। আবার এই চুক্তির ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় হওয়ায় সীমানা নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০১৩ সালে ভারতের মন্ত্রিসভা চুক্তিটির অনুমোদন দেয়। এই প্রোটকলে অনুসারে দুদেশের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ এবং ছিটমহল বিনিময়ের প্রস্তাবে উভয় দেশ সহমত হবে।[৮৫] ২০১৫ সালে লোকসভা নির্বাচনের বিজেপি

সরকার (BJP) ক্ষমতায় আসে এবং ৩৩১ জন সংসদ ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল বিনিময়ের প্রস্তাবিত বিলটি বাস্তবায়িত হয়।[৮৬]

৩.৮. পর্যবেক্ষণ

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে ছিটমহলের রাষ্ট্রহীনতার একটি চিত্র ধরা পরেছে। এই রাষ্ট্রহীনতার মূলে ছিল ব্রিটিশ সৃষ্ট সীমান্ত সমস্যা। রাষ্ট্রহীন দৈনন্দিন জীবনের প্রান্তিকতার দিকটি উঠে এসেছে। যে প্রান্তিকতায় মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি ছিল অধরা। এই মানবাধিকারহীন ছিটমহলের অধিবাসীদের সমস্যা নিয়ে মূল ভূখণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলি খুব বেশি আগ্রহ দেখায় নি। যদিও এই সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে উভয় দেশের সরকারের প্রয়াস অব্যাহত ছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বারংবার ব্যর্থ হতে দেখা যায়। ভারত ও পাকিস্তান সরকার স্বাধীনোত্তর তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, যথা- নেহেরু-নুন চুক্তি (১৯৫৮), স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি (১৯৭৪), এবং তিন বিঘা চুক্তি (১৯৯২)। এই চুক্তি গুলির মধ্যে মতানৈক্য থাকায় বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সন্মুখীন হতে হয়। সেই প্রতিকূলতার সুযোগে সমাজ বিরোধীরা ছিটমহলের মানুষের উপর নির্যাতন চলাতো। যার ফল স্বরূপ ছিটমহলের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ফলত, ছিটমহলবাসীরা নিরাপত্তাহীনতার সমস্যাটি রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা অথবা আঞ্চলিকস্তরে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এই অধ্যায়ে সেই রাষ্ট্রীয় নাগরিক ও রাষ্ট্রহীন মানুষদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক এবং উভয় দেশের চুক্তিগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে ছিটমহল সমস্যার সমাধানকল্পে, সেই অঞ্চলের মানুষেরা নিজেদের মধ্যে একত্রিত হতে শুরু করে। সরকার ছিটমহল সমস্যা যেমন নিজেদের মতো করে পররাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আলোচনা করেছিল, তেমনি ছিটমহলের অধিবাসীরা নিজেরাই নানা

ধরনের সংগঠন তৈরি করেন, যেমন – 'ছিটমহল নাগরিক কমিটি' ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি, ছিট ইউনাইটেড কাউন্সিল ও নলগ্রাম, জোংরা ও পাটগ্রাম নাগরিক সুরক্ষা কমিটি ইত্যাদি। যদিও এই সংগঠন গুলিতে নীতিগত বিরোধের ফলে ছিটমহল সমস্যার সমাধানসুত্র নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়।

এছাড়া এই অধ্যায়টির অন্যতম চরিত্র হল ক্ষেত্রসমীক্ষা। যে ক্ষেত্র সমীক্ষায় ভারত ও বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন ছিটের অধিবাসীদের মতামতকে ইতিহাসের আঙ্গীকে তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় মূলত দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি। যে সুত্রে বলরাম বর্মন (বাঁশকাটা ছিটমহল), হৃদয় নাথ রায় এর মত ভারতীর ছিটের অধিবাসীদের নিরাপত্তাহীন জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। ছিটমহলের মানুষের প্রতি প্রশাসনিক অসহযোগিতা তাদের বাধ্য করেছিল বাস্তুচ্যুত হতে। সেই বাস্তুচ্যুত ভারতীয় ছিটমহলে অধিবাসী হিসাবে বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করেন, যেমন- ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু কমিটি (Indian Enclave Refugee Association), দক্ষিণ বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটিগুলির ইত্যাদি। এই সংগঠনের সাথে যুক্ত মানুষগুলোর মধ্যে অনেকেই বর্তমানে উদ্বাস্তু হয়ে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলার একাধিক জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ছিটমহল বিনিময় (২০১৫) প্রসঙ্গে তাঁরা একেবারেই ভিন্নমত জানায়। কারণ, তাদের মতে ছিটমহল বিনিময় ভারতীয় ছিটের বাংলাদেশের দুস্কৃতি দখলাকৃত জমিগুলি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির আদায় করবে ও ভারতীয় ছিটের মুল জমির মালিকরা আদতে বঞ্চিত হবে। তবুও বলা যেতে পারে যে সমাজের বিভিন্ন সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সংগঠনগুলির যৌথ চেষ্টার ফলে 'ছিটমহল বিনিময়ের' দ্বারা নাগরিক সামাজের অধিকারগুলি বর্তমানে তারা উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছেন।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. আনন্দ গোপাল ঘোষ; ভারত বিভাজনের ৬০ বছর ও স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ, *উত্তরবঙ্গ সংবাদ,* শিলিগুড়ি ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৭।

২. BIPSS Special Report, '*Bangladesh Institute of Peace and Security Studies, Indo-Bangladesh Summit: A Security Agenda for Bangladesh*'.

https://actionguide.info/m/orgs/261/ (এই ওয়েবসাইটটি দেখার তারিখ ১২.০২.২০১৬)

৩. Human Rights in Bangladesh 1997, The University Press Limited, Dhaka.

৪. *উত্তরবঙ্গ সংবাদ,* ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৭, প্রাগুক্ত।

৫. Rup Kumar Barman: *The Origin and Evolution of Enclaves of India and Bangladesh: A Historical Study*, (New Delhi, Abhijeet Publication, 2019), পৃ.পৃ.- ১২৪-১২৫।

৬. দেবব্রত চাকী: সীমান্ত সমস্যার ৬০ বছর: র‍্যাদক্লিফ রোয়েদারের রহস্য আজও আধরা; *বর্তমান সংবাদ,* (১৬.০৯.২০০৭, শিলিগুড়ি)।

৭. Naunidhi Kaur: The Nowhere People; The Hindu, *India National Margarine* (Vol. 19, issue-12, June).2002।

৮. দেবব্রত চাকী: *ব্রাতজনের বৃত্তান্ত: প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল,* (কলকাতা, সোপান,২০১১), পৃ.পৃ.- ৪৪-৫২।

৯. Whyte, Brendan R.: *Waiting for the Esquimo: A Historical and documentary Study of the Cooch Behar Enclaves of India and Bangladesh,* Melbourne, University of Melbourne Press, 2004. পৃ.- ৪৪০।

১০.https://www.google.com/search?q=enclave+india+and+bangladesh+population&rlz=1C1JJTC_enIN1021IN1021&oq=enclave+india+and+bangladesh+popula

tion+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE2MzAzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UT8 (এই ওয়েবসাইটটি দেখা তারিখ ২৯.০৬.২০২৩)।

১১. দেবব্রত চাকী (২০১১), প্রাগুক্ত পৃ. ৫৭-৫৮।

১২. তদেব, পৃ. ১৬২।

১৩. তদেব, পৃ. ১৬১।

১৪. Rup Kumar Barman; *Migration. State Policies and Citizenship: A Historical Study on India, Bangladesh and Bhutan*; (Aayu Publication, New Delhi, 2021) পৃ. ১২৭।

১৫. Whyte, Brendan R, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৮।

১৬. Amar Roy Pradhan: *Rule of Jungle*, (Anuj Print Master, New Delhi, 1995), পৃ. ৪।

১৭. District Census Handbook Cooch Behar; Census 1971, Series 22, West Bengal, Part X-A &B, (Published by The Controller Government Printing, West Bengal, Kolkata, 1977) পৃ. ১৬।

১৮. তদেব, পৃ.পৃ. ১৬৪-১৬৫।

১৯. Rup Kumar Barman (2021), প্রাগুক্ত,পৃ.পৃ. ১২১-১২২, ।

২০. তদেব, পৃ.১২১।

২১. https://www.panchagarh.gov.bd/bn/site/page/zacd দিবস; এই ওয়েবসাইটটি দেখার তারিখ- ৩০.০৬.২০২৩।

২২. দেবব্রত চাকী (২০১৬); প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩, ।

২৩. Whyte, Brendan R, ১৯৬৬ সালে ব্যানার্জী তথ্য অনুসারে ছিটের লিষ্ট থেকে নেওয়া হয়েছে, পৃ.৪৪০, প্রাগুক্ত।

২৪. Rup Kumar Barman (2021); প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪ ।

২৫. District Census Handbook Cooch Behar; Census 1971; প্রাগুক্ত, পৃষ্টা. ৪৬, ।

২৬. সাক্ষাৎকার বলরাম বর্মন, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, ২০১৩।

২৭. সাক্ষাৎকার হৃদয় নাথ বর্মন, বেহুলাডাঙ্গা ছিটের অধিবাসী, হলদিবাড়ী রেলগেট এলাকা, ২০১৪।

২৮. সাক্ষাৎকার প্রমোদ বর্মন, হলদিবাড়ী রেলগেট, ১লা আগষ্ট ২০১৩।

২৯. সাক্ষাৎকার শিবেন দেব সিংহ, হলদিবাড়ী রেলগেট, ৩১লা জুলাই ২০১৩।

৩০. Census 1951 West Bengal District Handbooks Cooch Behar, A Mitra; পৃ.১৫৫।

৩১. সাক্ষাৎকার বিরেন বর্মন, হলদিবাড়ী রেলগেট, ৩১সে আগষ্ট, ২০১৫।

৩২. Census 1951 West Bengal District Handbooks Cooch Behar, A Mitra; (Sree Saraswaty Press, Calcutta, 1953) পৃ.১৫৫।

৩৩. সাক্ষাৎকার জগদীশ রায় প্রধান, মানিকগঞ্জ, হলদিবাড়ী, ২২সে সেপ্টেম্বর ২০১৭.

৩৪. সাক্ষাৎকার বিশ্বেশ্বর বর্মন, ইচ্ছাগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, আগষ্ট ২০১৪ ও সুবোল চন্দ্র বর্মন, শিকারপুর, মাথাভাঙ্গা, ২০১৩।

৩৫. সাক্ষাৎকার, মনসুর আলি মিঞা (৮২), পোঁয়াতুর কুঠি, ২০১৩।

৩৬. সাক্ষাৎকার; আকবর আলি মিঞার (৬০), মশালডাঙ্গা ছিটমহল, দিনহাটা মহকুমা, ২০ জুলাই, ২০১৩।

৩৭. সাক্ষাৎকার; নেতাই দাস (৪২), দেব চন্দ্র বর্মন (৬০), বিশাদু বর্মন (৬৫), রণেন বর্মন (২৬) ছিট শিবপ্রসাদ মুস্তাফী ৩রা জুলাই ২০১৮, (ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন ওই ছিটের অধিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎকার ভিত্তিতে তাদের মতামত সংযোজিত হয়েছে)।

৩৮. সাক্ষাৎকার বিরেন্দ্র নাথ বর্মন ১৯ই অক্টোবর ২০১৪।

৩৯. সাক্ষাৎকার গেনেন্দ্র নাথ বর্মন ১৯ই অক্টোবর ২০১৪।

৪০. সাক্ষাৎকার ক্ষিতেস্বর বর্মন (৬০) গজেন বর্মন (৫0) ১৯ই অক্টোবর ২০১৪।

৪১. সাক্ষাৎকার বিনয় কুমার রায় বালাপুখুরি ছিটমহল, মেখলিগঞ্জ, জুলাই ২০১৩।

৪২. সাক্ষাৎকার অরুন কুমার রায়, বালাপুখুরি ছিটমহল, মেখলিগঞ্জ, জুলাই ২০১৩।

৪৩. সাক্ষাৎকার বালাপুখুরি ছিটমহলের অধিবাসীদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে আসে তাদের সমস্যার কথা, ক্ষেত্র সমীক্ষা, মেখলিগঞ্জ, জুলাই ২০১৩।

৪৪. সাক্ষাৎকার ময়নাথ রায়, বালাপুখুরি ছিটমহলের অধিবাসী, ক্ষেত্র সমীক্ষা, মেখলিগঞ্জ, জুলাই ২০১৩।

৪৫. সাক্ষাৎকার সুভাষ বর্মনের খোকা রায় পানবাড়ি ১ ও ২ নং ছিট, ক্ষেত্র সমীক্ষা মেখলিগঞ্জ, জুলাই ২০১৩।

৪৬. *India and the Challenge of Stateless- A Review of the legal Framework relating to Nationality*, National Law University, Delhi, 2008, পৃ, v.

৪৭. তদেব, *India and the Challenge of Stateless*, পৃ.২।

৪৮. William van Schendal; *Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclaves,* The Journal of Asian Studies 61, no.1 (Feb 2002), প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩০।

৪৯. মোহম্মদ গোলাম রববানী; প্রাগুক্ত,পৃ.পৃ. ৯২-৯৫।

৫০. রক্তিম দাস, *সাংবাদিকের কলমে ছিটমহল আন্দোলন;* নাওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ-১০৯।

৫১. সাক্ষাৎকার *দীপ্তিমান সেনগুপ্ত-* সাক্ষাৎকার প্রাপক ড.রূপ কুমার বর্মণ, ২৫শে অক্টোবর ২০১২।

৫২. হরিপদ রায়, *গন আন্দোলনে কুচবিহার;* সম্পাদনা -অভিজিৎ দাস, (অ্যালবাট্রাস কলকাতা, ২০১৯), পৃ. ২৮২।

৫৩. সাক্ষাৎকার বলরাম বর্মন শিবমন্দির, শিলিগুড়ি ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

৫৪. দেবব্রত চাকী (২০১৬); প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ২৪-২৫।

৫৫. রূপ কুমার বর্মণ: ছিটমহল বৃতান্ত: উত্তরবঙ্গের ছিটমহল ও ছিটমহলবাসীদের প্রান্তিকতার বিবরণ, *অন্তমুখ* -বাংলা গবেষণা পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ: তিন দশক, সম্পাদক- খোকন কুমার বাগ, পর্ব -৩, সংখ্যা-১, পৃপৃ. ৫৭-৫৮।

৫৬. অভিজিৎ দাস (২০১৯); প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ২৮২-২৮৩।

৫৭. সাক্ষাৎকার বীরেন রায়, হলদিবাড়ী, ২০১৩।

৫৮. সাক্ষাৎকার হৃদয় নাথ রায়, হলদিবাড়ী, ২০১৩।

৫৯. Rup Kumar Barman: Statelessness of Enclave Dwellers and Struggle for Survival: A Study on the Indian Enclaves Refugee; *উত্তর প্রসঙ্গ- একটি আর্থ সামাজিক বিশ্লেষনধর্মী জার্নাল,* (আক্টোবর-নভেম্বর, ২০১৫), পৃ.পৃ. ১৮৫-১৮৬।

৬০. সাক্ষাৎকার জগদীশ রায় প্রধান, মানিকগঞ্জ, হলদিবাড়ী, ২০১৭।

৬১. India Bangladesh Land Boundary Agreement, Ministry of External Affairs, Govt. of India, পৃ.পৃ.-১-৪।

৬২. সাক্ষাৎকার; *অন্নকান্ত দাস* (৫৫) সাঁতকুড়া, হলদিবাড়ী, ২০১৩।

৬৩. *উত্তরবঙ্গ সংবাদ*, শিলিগুড়ি, ১৮ই আগষ্ট ২০১৬।

৬৪. Rup Kumar Barman (2021); প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১২৫-১২৬।

৬৫. Khushwant Singh: *Train to Pakistan*, (New Delhi, Penguin) 2002, পৃ. ১।

৬৬. *প্রথম আলো, ইদ্ সংখ্যা*, ২০০৪, ভারত- বাংলাদেশ ছিটমহল, উইলিয়াম ভেন স্ক্যান্ডেল, পৃ.পৃ.- ২৬৫-২৭৯।

৬৭. *উত্তর প্রসঙ্গ, বইমেলা সংখ্যা,*(১৪১৫/২০০৮-০৯, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা), প্রবন্ধ; *স্বাধীনোত্তর উত্তরবঙ্গে গন আন্দোলনের ইতিহাস*, সম্পাদনা- দেবব্রত চাকী।

৬৮. William van Schendal: *Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclave*, The Journal of Asian Studies 61, no.1 (Feb 2002), পৃ.পৃ. ১২৪-১২৫।

৬৯. Ministry of External Affairs: *The Bilateral Treaties and Engagement;* (Delhi, Siba Examination Pvt. Ltd, 1997, পৃ. ৬৫।

৭০. হরিশচন্দ্র রায়: প্রসঙ্গ আড়াই বিঘা করিডোর ও বোদেশ্বরী মন্দির, দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা); *উত্তর প্রসঙ্গ*, (২০১৩/১৪২০, June-July-13, Vol-7, No. 6-7), পৃ.পৃ. -২৪-২৫।

৭১. মোহম্মদ গোলাম রববানী: *বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল আবরুদ্ধ ৬৮ বছর*, (প্রথমা, ঢাকা, ২০১৭) পৃ.পৃ. ৫৩-৫৪।

৭২.Ministry of External Affairs, Govt of India; mea.gov.in/uploads/publicationDocs/24529-LBA-MEA-Booklet-final (এই ওয়েবসাইট দেখার তারিখ: ১৫.১১.২০২০।

৭৩. হরিশ চন্দ্র রায়: স্বাধীনোত্তর উত্তরবঙ্গে গন আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়— "বেরুবাড়ি আন্দোলন"- *উত্তর প্রসঙ্গ, বইমেলা সংখ্যা*, (১৪১৫/২০০৮-০৯, ২য় বর্ষ ৪ র্থ সংখ্যা Vol-II, No -৪), পৃ. ৩৮-৩৯।

৭৪. দেবব্রত চাকী: *এক কুড়ি বর্ষে তিনবিঘা করিডোর, উত্তর প্রসঙ্গ -আত্ম-সামাজিক বিশ্লেষণ জার্নাল,* (প্রাক উৎসব সংখ্যা-২০১২ (ইং) ১৪১৯) পৃ-৬-৭।

৭৫. মোহাম্মদ সেলিম: *ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮৯,* (ঢাকা, বাংলা একাদেমি, ২০০৯) পৃ.পৃ.- ১০৭-১০৮।

৭৬. দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা), *উত্তর প্রসঙ্গ,* (২০১৩/১৪২০, June-July-13, Vol-7, No. 6-7), পৃ.পৃ.২৭-২৮।

৭৭. তদেব (বিস্তারিত তথ্য প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে) ।

৭৮. অভিজিৎ দাশ: তিনবিঘা আন্দোলন: প্রক্ষেপট ও প্রকৃতি, উত্তরের গনচেতনার গতি প্রকৃতি, দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা), *উত্তর প্রসঙ্গ,* (২০১৯) পৃ.পৃ. ১১১-১১৩।

৭৯. তদেব, অভিজিৎ দাস, (২০১৯), পৃ.২০১।

৮০. অভিজিৎ দাশ: তিনবিঘা আন্দোলন: প্রেক্ষাপট ও প্রকৃতি, সম্পাদনা: দেবব্রত চাকী, *উত্তরের গণচেতনার গতি প্রকৃতি–একটি গণ আন্দোলন বিষয়ক সংকলন,* (কোচবিহার বইমেলা; জানুয়ারী ২০১০, ১ম প্রকাশ), পৃ.পৃ.১১১-১১৩।

৮১. দেবব্রত চাকী: *উত্তর প্রসঙ্গ-* একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষনধর্মী জার্নাল, প্রাক উৎসব সংখ্যা, (vol- 6, No-7, July 2012), পৃ.পৃ. ১৮-২০।

৮২. সাক্ষাৎকার বিনয় কুমার রায় (৪৫) কুচলিবাড়ি, ০১.০৫.২০১৩।

৮৩. *উত্তরবঙ্গ সংবাদ,* শিলিগুড়ি, ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১০, *তিনবিঘায় উড়ালপুল চায় না সীমান্তবাসী*।

৮৪.https://indianexpress.com/article/india/india-others/land-swap-deal-no-enclave-dweller-ready-to-move-to-bangladesh/ এই ওয়েবসাইটটি দেখার তারিখ-০১.০৭.২০২৩, সময়: ১১সকাল।

৮৫. The Hindu; (4th June 2015), https://www.lawfareblog.com/throwback-thursday-indo-bangladesh-enclaves-and-indian-constitution-reprise-এই ওয়েবসাইট দেখার তারিখ- ০১.০৭.২০২৩।

৮৬. মহম্মদ গোলাম রববানী (২০১৭), পৃ.৬৩।

চতুর্থ অধ্যায়

বিনিময় ও বিনিময় পরবর্তী ভারতে ছিটমহল অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন ও সংকট

ছিটমহল সমস্যা সমাধানকল্পে ভারত ও বাংলাদেশের ২০১৫ সালের দ্বিপাক্ষিক সীমান্ত চুক্তি প্রতিবেশী রাষ্ট্রদুটির মধ্যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এই সীমান্ত চুক্তির মধ্যদিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মত ছিটমহলের অধিবাসীরাও নাগরিক পরিচিতি অর্জন করে। এই চুক্তিতে ছিটমহল সমস্যার নির্মূল করার জন্য বিনিময়কে উভয় সরকার মেনে নেয়। তবে ছিটমহলগুলির বিনিময় হলেও তাদের প্রতিবন্ধকতা পুরোপুরি নিমূল হয়ে যায় নি। ছিটমহল বিনিময় হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী একাধিক নীতিও কার্যকারী হতে দেখা যায়। কিন্তু তবুও ছিটমহলে সাবেকি বা নব্য নাগরিকদের দৈনন্দিন প্রতিকূলতার পরিসমাপ্তিগত একাধিক মতানৈক্য ধরা পরে ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন।

ছিটমহল বিনিময়ের ফলে ভারতীয় ছিটের মানুষেরা ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নির্ধারিত শিবিরে বসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু তাদের জন্য এই এক স্থান থেকে অন্যত্র রাষ্ট্রের পরিসীমায় অধিবাসী হওয়ার যাত্রা কখনোই সহজ এবং স্বাভাবিক ছিল না। তাঁরা আক্ষরিক অর্থে নতুন আশ্রয়ে এসে 'উদ্বাস্তু' রয়ে যান। ১৯৫১ সালে *Convention Relating to the Status of Refugees* – তে 'উদ্বাস্তু' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে '*যখন উচ্ছেদ হওয়া বিপন্ন মানুষ আন্তর্জাতিক সীমানা পার হয়ে অন্য দেশে প্রবেশ ও তারা আর পুনরায় ওই রাষ্ট্রের ফিরে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না কেবল মাত্র তখন তাকে উদ্বাস্তু বলে*।[১]

ছিটমহলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে ছিটমহল বিনিময় আইনত তাদের ভারতীয় নাগরিক হওয়ার মান্যতা দিলেও উদ্বাস্তু হওয়ার প্রতিকূলতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারে নি।

নিত্যদিন তাদের প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হত। এই অনিশ্চিত জীবনে কখনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ, মৌলবাদী আগ্রাসন, অসামাজিক পরিমন্ডল কিংবা সামাজিক সুরক্ষার প্রতিকূল পরিবেশকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। যা ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর থেকে আরো স্পষ্ট হতে থাকে।

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর দুটি রাষ্ট্রের মাঝে আবারো নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান ১৯৭১ সালে পরিবর্তীত হয় বাংলাদেশ নামে। এই নতুন রাষ্ট্রের সাথে সীমানা কেন্দ্রীক সমস্যাগুলি জটিল হতে শুরু করে। ২০১৫ সালে সীমান্ত চুক্তি প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্রের সীমানায় ছিটমহল সমস্যার নিস্পত্তি ঘটালেও, এর মাঝে একাধিক অসম্পূর্ণতা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করে। এই অসম্পূর্ণতার চিত্র উঠে আসে ছিটমহল বিনিময় হয়ে বাস্তুচ্যুত ছিটমহলের শিবিরের অধিবাসীদের কথায়। তাদের কাছে নতুন রাষ্ট্র প্রাথমিক ভাবে অপরিচিত পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া কিংবা আঞ্চলিক বা প্রতিবেশিদের কাছে তাদের কতটা ভারতীয় বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল ইত্যাদি নানান প্রশ্নের উত্থানের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও সরকারের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ যেমন – ক্যাম্প বা অস্থায়ী শিবিরের পরিবেশ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ব্যবস্থা অথবা স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য যে অবাসনগুলি দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

৪.২. ভারত ও বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময়

ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দ্বারা ছিটমহলের মানুষদের কয়েক দশক কষ্টের নিরাময়ের প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই সমাধান সূত্রের সাথে সাথে নতুন ধরনের সমস্যা উদ্ভব হয়, যা বাস্তুচ্যুত নব্য নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। রাষ্ট্রহীনতা থেকে মুক্তির স্বাদ অনুভব করালেও বাস্তুচ্যুত হয়ে যাওয়ার আতঙ্কের পরিবেশ তাদের কষ্টের নিরাময়

করতে পারে নি। বিগত ৬৮ বছর ধরে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উভয় রাষ্ট্রকেন্দ্রীক একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যেমন ১৯৫৮ সালে নেহেরু-নুন চুক্তি,[২] ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি,[৩] ১৯৯২ সালে তিনবিঘা চুক্তি,[৪] ২০১১ সালে যৌথ কর্মী গোষ্ঠী (Joint action Committee) এর দ্বারা ছিটমহলের জনগনণার সূচনা ইত্যাদি।[৫] ফলত, দেশভাগ পরবর্তী সময়ে উভয় রাষ্ট্রই ছিটমহলের অভিবাসীদের জীবন উন্নিত করার প্রচেষ্টা নিয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ২০১৫ সালের ৩১ সে জুলাই মধ্যরাতে বিনিময় চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রহীন মানুষেরা নাগরিক পরিচয় পান।[৬] ২০১৫ সালে নতুন সরকারের দ্বায়িত্বভার গ্রহণের পর ছিটমহল বিনিময় নিয়ে দুই দেশ ঐক্যমতে পৌঁছায়। চুক্তি অনুযায়ী ভারতে মূল সীমানার অভ্যন্তরে ৫১টি ছিটমহল ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১১১টি ছিটমহল একে অপরের অধীনে থাকবে ও স্বাভাবিক ভাবেই সেই রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হবে।[৭]

এই 'সীমান্ত চুক্তি' দ্বারা উভয় দেশের ছিটমহল অধিবাসীদের কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী হতে চায় তা নির্বাচণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই পুরো প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ সীমান্ত কার্যাবলী গোষ্ঠীর তত্বাবধানে ছিটমহলে থাকা বাসিন্দাদের স্থানান্তর করা হয়। প্রাথমিক পর্বে ভারত সরকার তাদের রাখার জন্য তিনটি 'অস্থায়ী পুনর্বাসন শিবির' গঠন করে। তাদের প্রযোজনীয় দলিলপত্র বন্টনের বিস্তৃত ব্যবস্থা নেয়। দৈনন্দিন জীবনের নূন্যতম চাহিদা অনুযায়ী থাকার জন্য টিনের ঘর, রান্নাঘর ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, খেলাধুলার উপকরণসহ ইত্যাদি দেওয়া হয়। প্রত্যেক পরিবারের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, বায়োমেট্রিক পঞ্জিকরণ, মুদ্রা, বিনিময় এবং ব্যাগ সামগ্রী প্যাকেটের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম বিনিময়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। একই সাথে যারা ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তাদের নিয়ে আসার জন্য

সরকার থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্বে চ্যাংরাবান্দা (ভারত)- বুড়িমারী (বাংলাদেশ) অভিবাসন চেকপোষ্ট্ দিয়ে ৬২ জনের মত ভারতীয় ছিটের অধিবাসীদের আগমন ঘটে। তাদের জন্য কুচবিহারের জেলাশাসক নির্দেশে অয়োজিত হয় আনন্দমুখর অনুষ্ঠান এবং তাদের সম্মানের সাথে ভারতে আনা হয়। কুচবিহার জেলার সাংসদ, জেলার বিধায়ক, জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, রাজশাহীতে অবস্থিত ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার এবং অন্যান্য বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ছিটের 'নব্য নাগরিকদের' প্রত্যাবর্তন অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাতে। ওই দিন নির্ধারিত চূড়ান্ত সময়সীমা অনুযায়ী ২০১৫ সালের ৩০ শে নভেম্বরের মধ্যে অবশিষ্ট ইচ্ছুক মানুষদের আটটি পর্যায়ে ভারতে আনা হবে বলে নিশ্চিত হয় (নয়াদিল্লী ২০১৫)।[৮] ছিটমহলে বসবাসরত অধিবাসী/ বাসিন্দারা নাগরিক হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। যা বিগত ৬৮ বছরের বেদনাকে তাদের আবারো স্মরণ করিয়েছিল। ২০১৫ তে উভয় রাষ্ট্রের এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ছিল ছিটমহলের অধিবাসীদের এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা।

৪.৩. বিনিময়মুখী অভিযান

২০১৫ সালে ভারত ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রহীন ছিটমহলবাসীরা নব্য নাগরিক রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। ছিটমহলের বিনিময় চুক্তি অনুয়ায়ী রাষ্ট্র নির্বাচনের বিষয়টিতে ছিটমহলের অধিবাসীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে "যারা ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটের নাগরিক তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে ও যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটে বসবাস করতেন তারা বাংলাদেশের নাগরিক" হিসাবে স্বীকৃত হবে।[৯] এই পরিচিতিতে দুই দেশের সম্পর্কের মাঝে নিজভূমির স্মৃতি মিশ্রিত আবেগের প্রতিফলন ঘটে অনেকের মনে। যা তাদের আর একবার দেশভাগের মনস্তাতিক দ্বান্দ্বিকতার সম্মুখে দ্বার

করিয়েছিল। আর যারা ভারতে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তারা নতুন করে মূল ভূখন্ডের প্রতিবেশীদের কাছে '*নব্য নাগরিক*' রূপে পরিচিতি পায়। বিনিময় প্রক্রিয়া যেমন নতুন রাষ্ট্র বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল তেমনী তাদের মনে জাগিয়েছিল একাধিক প্রশ্ন। ক্ষেত্র সমীক্ষায় তাঁদের মুখেই উঠে আসে বিনিময় মুহূর্তে দুঃশ্চিন্তার কথা। তাঁরা কিভাবে নতুন এই শিবিরের পরিবেশে অথবা নতুন রাষ্ট্রের নিজেদের মানিয়ে নেবেন ইত্যাদি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে। এই একাধিক আশঙ্কায় ছিটমহল বিনিময়ে প্রাক কালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতীয় ছিটের অধিবাসীদের মধ্যে স্বস্তি এবং অস্বস্তির উভয়ের সংমিশ্রণ ধরা পরে।[১০]

৪.৩.১. ২০১৫ সালের ছিটমহল বিনিময় নিয়ে উভয় সরকারের দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া

ভারত ও বাংলাদেশের উভয় ছিটমহলে প্রায় ৫১,০০০ মানুষ ছিলেন। ২০১৫ সালের পর বিভিন্ন সংবাদপত্র, গবেষণাধর্মী লেখনীর মাধ্যমে এই নাগরিকত্বহীন মানুষগুলি প্রচারের আলোয় আসেন। পূর্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তিতে ভারত ও স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পর তাদের সীমানা সংক্রান্ত দুই রাষ্ট্রের জটিল সমস্যার সমাধানের পথ তৈরি হয়। যে পথ আবার ছিটমহল বিনিময় ও আডর্ভ্যাস পজিসনের মত বিষয়ে দুই দেশকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসে।[১১]

এই প্রতিকূলতা উভয় রাষ্ট্রের কাছে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার স্তরকে সম্প্রসারিত করতে সহায়তা করে।[১২] ২০১১ সালে ঢাকায় শীর্ষ বৈঠকে স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৩ সালে ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন UPA সরকার স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করলেও বিরোধীরা সেই পদক্ষেপকে সমর্থন করেনি। ২০১৪ সালের সরকার পরিবর্তন হয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ২০১৩ সালে বিলটি নিয়ে পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়েছিল। এবং ২০১১ সালের প্রোটোকল ভিত্তিতে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত

হয়। ২০১৫ সালে ৫ই মে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৯৭৪ সালের চুক্তির ভিত্তিতে বিলটি পাস করেন। পার্লামেন্টের অধিবেশনে লোকসভা ও রাজ্যসভার অনুমোদনের দ্বারা ছিটমহলের রাষ্ট্রহীন মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রস্তাব উভয় কক্ষ সমর্থন দেয়। এই কক্ষে ছিটমহলের বিনিময় নিয়ে সীমান্ত চুক্তির সমর্থন ১৮১ টি জন সাংসদ সমর্থন জানায়। ২০১৫ সালের ৭ই মে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি লোকসভায় পাশ হয়।[১৩] যা উভয় রাষ্ট্রের ছিটমহলে নাগরিকদের কাছে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

৪.৩.২. আঞ্চলিক স্তরে ছিটমহল বিনিময়ে পর্যালোচনা

ছিটমহল সমস্যা নিয়ে জাতীয় স্তরের (ভারত ও বাংলাদেশ) পাশাপাশি আঞ্চলিক স্তরের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ছিটমহল বিনিময় প্রসঙ্গে জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক দলগুলোর যেমন তাদের মতামত রেখেছিল ঠিক তেমনী আঞ্চলিক স্তরে সমসাময়িক রাজনৈতিক দলগুলির দাবিও ছিটমহল বিনিময়ের আলোচনা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। সেক্ষেত্রে ছিটমহলের সমস্যা সমাধানে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৭ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর KPP *(Kamtapur People's Party*) সরকারের কাছে ১০ দফা দাবিপত্র পেশ করে। এই দাবিতে আঞ্চলিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার পাশাপাশি ছিটমহল বিনিময়ের বিষয়টি তুলে ধরেন। কামতাপুর পিপলস্ পাটির ১০ নং দাবিতে বলা হয়েছে-

> *"ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল ও ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিটমহলগুলি আর কোন রকম বিলম্ব ছাড়াই বিনিময় করতে হবে'* ।[১৪]

গ্রেটার কুচবিহার পিপলস্ পার্টির বন্দী নেতা বংশীবদন বর্মন কারাগারে থাকাকালীন ছিটমহল আন্দোলনের নেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত তার সাক্ষাৎ করেন। তিনিও ছিটমহলের অধিবাসীদের আন্দোলনকে স্বাগত জানান।[১৫] ছিটমহল বিনিময় নিয়ে ২০১৩ সালে (*United Progressive Alliance)* UPA প্রধান বিরোধী দল ছিটমহল বিনিময় নিয়ে বিস্তর আলোচনা করে। বাংলার ফরওযার্ড ব্লক্ এই সিদ্ধান্তে স্বাগত জানায়। এক্ষেত্রে তৎকালীন মেখলীগঞ্জের বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী "ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলগুলিতে নিয়োম শৃঙ্খলার কিংবা নিরাপত্তার অভাবের বিষয়টির ওপর দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি বলেন ছিটমহলে কোন আইন বলে কিছু ছিল না, সেখানে জঙ্গল শাসন চলত। তাদের না ছিল দেশ না ছিল কোন রাষ্ট্রীয় পরিচিতি। এই পরিস্থিতিতে তারা তাদের রাজনৈতিক দলের থেকে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের ব্যাপার দাবি করেন। তাই ছিটমহল বিনিময়ের দাবিকে জাতীয় রাজনীতির পাশপাশি আঞ্চলিক স্তরের রাজনৈতিক দলগুলি একই রকম গুরুত্ব দিয়ে ছিটমহল সমস্যার নিষ্পত্তি চাইছিল, যা এই পর্যায়ের আলোচনায় উঠে এসেছে।[১৬]

৪.৪. বিনিময় পরবর্তী ছিটমহলের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন

বিনিময় পরবর্তী ছিটমহলের মানুষগুলি যারা মূল ভূখণ্ডে এসেছিল এখানে তাদের দৈনন্দিন জীবন আলোচিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে যারা নব্য নাগরিক হিসাবে ভারতের মূল ভূখণ্ডে এলেন তাদের মনে তৈরি হয়েছিল একাধিক প্রশ্ন। তারা ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে নিজেদের কিভাবে মানিয়ে নেবেন সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতেন। তাদের পক্ষে নতুন রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া খুবেই কঠিন মনে হয়েছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পূর্বতন একাধিক অভিজ্ঞতা তাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। বর্তমানে ছিটমহল বিষয়ক প্রকাশিত কিংবা অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে ছিটমহলের দৈনন্দিন ইতিহাস চর্চার ওপর

আলোকপাত করা হয়। এছাড়াও ছিটমহলে থাকা মানুষ কিংবা আঞ্চলিক স্তরের একাধিক প্রবন্ধে তাদের দৈনন্দিন চিত্র তুলে ধরা পরে।

৪.৪.১. নব্য নাগরিকদের জনজীবনের অভিজ্ঞতা

সাবেকি ছিটমহলের নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে জানতে গিয়ে ছিটে থাকা মানুষগুলোর সাথে কথাপোকথন ও ক্ষেত্রসমীক্ষার ওপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ নিয়ে যেমন নতুন উদ্দীপনার জন্ম তৈরি হয়েছিল, 'ছিটমহল বিনিময়' হয়ে আসা রাষ্ট্রহীন মানুষগুলোর ক্ষেত্রে একই রকম অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছিল। এই অংশে ছিটমহল বিনিময় পরবর্তী সময়ে ভিটেমাটি ছেড়ে আসা 'নব্য নাগরিকদের' জীবন যাত্রার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে।[১৭]

৪.৪.২. ছিটমহল বিনিময় পরবর্তী শিবিরের জীবনঃ প্রসঙ্গ ভারতীয় ছিটের নাগরিক

(ক) হলদিবাড়ী পুনর্বাসন শিবির: ছিটমহল বিনিময় হয়ে আসা শিবিরের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। নব্য নাগরিকদের জীবন কাহিনীর জীবন্ত প্রমান হিসাবে গবেষণায় উপস্থাপিত হয়েছে। এই দেশান্তর হয়ে আসা নব্য নাগরিকদের জীবনের ছোট বড়ো বিষয়গুলি ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুন উঠে এসেছে। যেখানে ধরা পরেছে সদ্য দেশান্তর হয়ে আসা নাগরিকদের আনন্দ ও বিষাদের মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত।

হলদিবাড়ী পুনর্বাসন শিবির বা *Haldibari Resettlement Camp* এর আলোচনা প্রসঙ্গে সেই অঞ্চলের মানুষের রাষ্ট্রহীনতার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভৌগলিক পরিচিতির বিচারে এই শিবিরটি ছিল কুচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার মধ্যে হলদিবাড়ী ব্লকের অধীনে।[১৮] এই শিবিরে আসা 'নব্য নাগরিকরা' বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটে একসাথে থাকতেন। ছিটমহলের বিনিময় হওয়ার পর প্রথম পর্বে হলদিবাড়ীতে ৪৮৪ জন

এসেছিল। পরে শিবিরে ৫জন নব্যজাত সন্তান (২০১৬) জন্মগ্রহণ করে। মূলত ২০১১ সালের জনগণনার পরে পরেই তাঁরা ভারতে আসার জন্য আবেদন করেন। তাঁরা জানায় ছিটমহল বিনিময় জীবন স্মৃতিতে নানান অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছিল। এ বিষয়ে-

সোমার রায় বয়স (৬০) নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেছিলেন যে ছিটে তাদের নিজস্ব মন্দির ছিল, কোন পূজা উপলক্ষ্যে তারা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এক সাথে মিলিত হতেন। আবার ছিটের মধ্যে ছিল মসজিদ্। এই ছিটে তাদের দৈনন্দিন জীবনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কখনই বিভেদ ধরা পরেনি। বরং একই সাথে বড় হয়ে ওঠার সাথে তারা ছিল একে অপরের পরিপূরক। সেই ফেলে আসা মুহূর্তের সাথে তাকে বার বার নারা দিয়েছিল শৈশব থেকে বড় হয়ে ওঠার জীবনের স্মৃতি।[১৯]

পুনর্বাসন শিবির (*Settlement Camp*) এর ক্ষেত্রে মূলত শিবিরগুলিতে হিন্দু পরিবারগুলি ভারতীয় ছিটমহল থেকে ভারতে এসেছিল। জাতিগত পরিচিতিতে তারা ছিলেন রাজবংশী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে ছিটমহল জনগণনার (২০১১) সময় ভুলে অনেকে সাঁওতাল হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই সমস্যার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল জনগণনার সময় পদবী ভুল করায় কারো কারো ক্ষেত্রে হেমব্রম পদবী চলে আসে।

সাম্প্রদায়িক সাম্প্রতির পাশাপাশি বিপরীত মত উঠে আসে বলরাম বর্মনের কথায়। তাঁর 'বাস্তুচ্যুত' হয়ে আসা স্মৃতি ও সংগ্রামের কঠিন ইতিহাস অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতায়। যে কারণে বলা যায় দেশ ছেড়ে আসতে তিনি একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন। মূল ভূখন্ডে প্রান হাতে করে পালিয়ে আসার সেই অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রহীনতার কঠিন বাস্তবতার মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন।[২০]

ভারতীয় ছিটের সংগ্রাম কিংবা বর্তমান 'নব্য নাগরিক' হয়ে ওঠা পুনর্বাসন শিবিরের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ছিল না। সোমার রায় জানান ভারতীয় ছিটমহলের অনেককেই আবার মৌলবাদীদের বিরূপ আক্রোশের মুখেও পড়তে হত। এছাড়াও প্রতিনিয়তই ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসী বলে সামাজিক ভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সহ সমাজ বিরোধীরা জমি দখল পর্যন্ত করে নিত। কারণ ভারতীয় মূল ভূখন্ডে চলে গেলেই এই জমিগুলো তারা নিজেদের দখলে নিবে। এই বিদ্বেষমূলক ব্যবহার ভারতীয় ছিটের অধিবাসীদের মনে বারবার আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। ফলত, একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভারতীয় ছিটের অধিবাসীরা ভারতীয় মূল ভূখন্ডে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সোমার রায় সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে ৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ভারতীয় ছিটের জমি বিক্রি করতে বাধ্য হন। নচেৎ পৈত্রিক সম্পত্তি দুস্কৃতিদের দখলে যাবে এতে কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না।[২১]

এই পুনর্বাসন শিবিরে জয়প্রকাশ রায়ের অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকম। তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও ছিটমহল সাথে থাকা পরিবারের সদস্যদের জীবন সংকট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ছিটমহলের রাষ্ট্রহীনতাকেই দায়ি করেছেন। এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মত বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন দেশভাগের পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ভাগাভাগির সাথে কুচবিহার রাজ্যের নাগরিকরা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পায়নি। ঔপনিবেশিক সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়ে তাঁরা রাষ্ট্রহীনতার শিকার। কুচবিহার রাজ্যের অধীনে থাকা ভূখণ্ড ভারতীয় সীমানার অধীনে না হয়ে বাংলাদেশের সীমানায় যুক্ত হওয়াকে তারা মেনে নিতে পারেননি। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাদের অত্যাচার ও ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির বাস্তবায়িত না হওয়ার দরুন তাদের অনেকে ভারতীয় ছিট থেকে প্রান ভয় ভারতীয় মূল ভূখন্ডে নিরাপত্তার আশায় চলে আসে। ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩,০০০

হাজারের মত। এই সকল মানুষেরা প্রকৃতঅর্থে রাষ্ট্রহীনতা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। ওই একই বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে সারা দিয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ঢাকায় ছিটমহল নিয়ে আলোচনা বসলেও ছিটমহল সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ তাকেই মেনে নিতে হয়েছিল। যার পরিনতি স্বরূপ এই বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে বিনিময় হয়ে আসা ছিটমহল অধিবাসীদের কথায়।[২২]

(খ) মেখলীগঞ্জ ছিটমহল পুনর্বাসন সমিতি

হলদিবাড়ি ব্লকে মধ্যে অবস্থিত ছিটমহল পুর্নবাসন শিবিরের মত মেখলীগঞ্জেও একটি পুনর্বাসন শিবির তৈরি হয়। হলদিবাড়ি শিবিরের মত একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এই শিবিরে। মেখলীগঞ্জ শিবিরের অধিবাসী স্বপন বর্মনের (২৯) কথায়, ভারতীয় ছিটমহলের জীবন ও নব্য নাগরিকরূপে পুনর্বাসন শিবিরের আসার অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তিনি ভারতে আসার সময় বাকিদের মতো ভাগ্যের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই ছিটের মানুষেরা দইখাতা ছিটের অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রামে মোট ১৭-১৮টি পরিবার থাকতেন। তাঁরা বিনিময় হওয়ার সাথে সাথে ভারতের মূল ভূখণ্ডের নাগরিক হয়ে উঠতে চান। এবং ভারত সরকারের থেকে অনুমতি পত্র তুলে দেওয়া হয়। তাদের সাথে ছিল একটি যাত্রী পরিবহনের বাস ও তাদের অস্থাবর সম্পত্তির কিছু জিনিষ নিয়ে আসার জন্য অন্য একটি পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশের সীমান্ত বাহিনী (BDR) ইচ্ছুক ভারতীয় ছিটবাসীদের সীমানা নিয়ে আসে। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভারতের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে তাদের নিয়ে আসে। ভারতীয় বি এস এফ (BSF) দের হাতে 'ট্রেভেল পাশগুলি' তুলে দিয়েছিল। ভারতে পৌছেই তাদের কুচবিহার জেলা প্রশাসকের তরফ থেকে স্বাগত জানানো হয়। তাদের

স্বাগত জানানোর জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মনগ্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ভারতীয় প্রশাসনের তরফ থেকে।

ভারতে প্রবেশ করে মেখলীগঞ্জ মহকুমার চ্যাংরাবান্দা চেক পোষ্ট থেকে ভারতীয় ছিটের অধিবাসীদের মেখলীগঞ্জ ছিটমহল পুনর্বাসন শিবিরে (*Mekhliganj Enclave Resettlement Camp*) নিয়ে যাওয়া হয়। এই শিবিরে বসবাসের জন্য দুটি ঘর বিশিষ্ট একটি আবাসন, দুটি কম্বল, কিছু ব্যবহারিক বাসনপত্র দেওয়া হয়। এভাবেই শিবিরে বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা মানুষগুলোর নতুন দেশ ও নাগরিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ভারতীয় ছিটের থেকে নব্য নাগরিকরূপে শিবিরের ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবন ছিল একবারেই আলাদা। বাংলাদেশের ভারতীয় ছিটের থেকে আসার জন্য কিছুটা সন্দেহের বসে অথবা নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর (BSF)-নজরদারিতে রাখা হত। যদি কেউ শিবিরের বাইরে যেতে চায় তবে তাকে সুরক্ষা বাহিনীর কাছে নাম নথিভূক্ত করতে হত, আবার ফিরে আসার পর স্বাক্ষর করে শিবিরে প্রবেশ করতে হত। এই সকল পরিস্থিতি তাদের নাগরিক সমাজের কাছে এতটাই বেমানান করে তুলেছিল যে প্রতিবেশীরা তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। প্রসঙ্গত, কেউ যদি মুল ভূখণ্ডের নাগরিকদের সাথে কথা বলতে চায়, তবে শিবিরের দ্বায়িতে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীরা সেই সুযোগটুকু তাদের দিতেন না। তবে ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। মূল ভূখন্ডের নাগরিকদের সাথে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ বিনিময় একে অপরকে অনেকটাই কাছাকাছি নিয়ে আসে।

প্রথম পর্যায়ে এই শিবিরে মোট ৪৭ টি পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। যার মধ্য ১০৫ জন পুরুষ ও ১০০ জন মহিলা ছিল ও এদের সাথে একটি মুসলিম পরিবারও এসেছিল। এই পুরুষদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন অল্প বয়সের তারা স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দেওয়া সুযোগ পায় ও প্রত্যেকেই উত্তীর্ণ হয়। অপর একজন সাধারণ বিভাগে স্নাতক হিসাবে মেখলীগঞ্জ কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু কর্ম সংস্থানের অভাব থাকায় লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পূনর্বাসন শিবিরে আসা একটি পরিবারের ভারতীয় মূল ভূখন্ডে আত্মীয় থাকায় সে তার পরিবারসহ সেখানে চলে যায়। স্বপন বর্মনের এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পুনর্বাসন শিবিরে থাকা অধিবাসীদের সম্পর্কে জানতে পারি যা ছিটমহল বিনিময়ের স্মৃতিকে প্রতক্ষ্য করিয়েছিল।[২৩]

স্বপন রায়ের পাশাপাশি মাধুরী বালা বর্মণের (৬২) কথায় একই রকম অভিমত উঠে আসে। তিনি শুরুতেই বলেছিলেন *'বাপের দেশ, নাড়ী পোতা জাগা, খারাপ নাগে'* (কামতাপুরি ভাষা)- আমার পিতৃভূমি, আমার ওখানেই নাড়ীপোতা, যা আমায় আজও ব্যাথিত করে (বাংলা)। সেই দেশে (ভারতীয় ছিটমহল) জন্মের সাথে জরিয়ে আছে তার আবেগ, মাধুরী দেবীর মত পুনর্বাসন শিবিরের অনেকের কথায় উঠে এসেছিল। তাদের মনে পড়ত ফেলে আসা মাতৃভূমিতে বড় হওয়ার দিনগুলি, ওপারের প্রতিবেশি, তাদের পিতা-মাতা এবং আত্মীয় পরিজনদের কথা। দুটি দেশের কাঁটাতার এতদিন ভারতীয় ছিট থেকে নিজের (ভারতীয় মূল ভুখন্ড) দেশে আসতে বাঁধা দিয়েছিল, ঠিক তেমনি নাগরিকত্বের মর্যাদা পেলেও জন্মস্থলের আবেগ নতুন মাত্রা বিনিময়ের ইতিহাসে সংযোজিত করেছে।[২৪] যা বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা মানুষের ইতিহাস, পুনর্বাসন শিবিরে থাকা নাগরিকদের কাছে দেশভাগের স্মৃতিকে আরো একবার উস্কে দিয়েছিল।

(গ) দিনহাটা ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির: ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সকলের মনে বহুদিনের সীমাহীন আক্ষেপের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারতীয় ছিটমহলে থাকা অধিবাসীদের দেশভাগের অভিশাপ থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষদের 'দিনহাটার ছিটমহল পুনর্বাসন শিবিরে' নিয়ে আসে। শিবিরের বাইরে থেকে প্রতিবেশিদের কাছে পুনর্বাসন ক্যাম্প নিয়ে নানা রকম কটুক্তি

শুনতে হত ‘নব্য নাগরিক’ হয়ে আসা ভারতীয় ছিটের মানুষগুলোকে। তাই ছিট বিনিময়ের পূর্বে ও পুনর্বাসন শিবিরের কথা জানতে চাইলে ৬৮ বছরের নাগরিকত্বহীন প্রতিকূলতার কথা এবং একই সাথে পুনর্বাসন শিবির নিয়ে অভাব অভিযোগ তুলে ধরতেন।

দিনহাটা শহরে পশ্চিম দিকে গোসানী রোড দিনহাটা কৃষি ফার্মের জমিতে অস্থায়ী ভাবে এই শিবির তৈরি হয়েছিল। সেই শিবিরে মোট ৫৮ টি পরিবারের ২৫৬ জন অধিবাসী বাস করতেন। এই মানুষগুলির জীবন সংগ্রামের অভিব্যক্তি তুলে ধরেছিলেন নারায়ণ বর্মন (৫২)। কথা প্রসঙ্গে তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন যে প্রতিবেশিরা তাদের কটুক্তি করতেন যে তারা সরকারের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন বিনা পরিশ্রমে। কিন্তু নারায়ণ বর্মন ও ওই শিবিরে থাকা প্রতিটি মানুষের জীবন সংগ্রাম ও রাষ্ট্রের ব্যর্থতার বিষয়ে কেউ কর্নপাত করতে চান নি।

পুনর্বাসন শিবিরে আসার পূর্বে প্রথম অবস্থায় এই মানুষগুলোকে ‘অস্থায়ী আনুমোদন পত্র’ (*Temporary Visa*) দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ভারতের অভ্যন্তরে শিবিরের পরিস্থিতি দেখে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার। পরবর্তীকালে সরকারে প্রতিশ্রুতি মত দুই বছরের মধ্যে তাদের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রসঙ্গে প্রথম অবস্থায় অনেকেই পুনর্বাসন শিবিরে আসার জন্য প্রস্তুতি নিলেও শেষ মুহুর্তে অনেকেই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে।

এই শিবিরের সকলকে একসাথে একবারে নিয়ে আসা হয়নি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল থেকে ধাপে ধাপে তাদের ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের পুনর্বাসন শিবিরে নিয়ে আসা হয়। প্রথম পর্বের বিনিময় সম্পন্ন হলে ধীরে ধীরে আরো অনেকেই এসেছিল এই শিবিরে। এই মূহুর্তকে স্বাক্ষী করে রাখতে ছিটমহল বিনিময়ের দিনে ভারত ও বাংলাদেশের উভয় গণমাধ্যমগুলিও উপস্থিত ছিল। তাদের সকলের অশ্রুচক্ষুতে যে আবেগ ও উদ্বেগ এর

ছবি ধরা পরে তাতে জড়িয়ে ছিল দেশ ছেড়ে আসার কষ্ট। পরিবারে মহিলাদের ছিটমহলে দৈনন্দিন জীবনের অংশ ছিল হাঁস, মুরগি, ছাগল এবং কৃষি জমি। ভারতীয় ছিটমহল পুনর্বাসন শিবিরে তাদের সব কিছুই ছেড়ে আসতে হয়েছিল। শিবিরের পরিবেশে কর্ম জীবনের স্মৃতি গুলো তাদের আবেগ তাড়িত করেছিল। এইভাবে কর্মহীন জীবনে তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছিল অবসাদ ও মানসিক চাপ। কারণ সরকার কেন্দ্রীক নতুন ভূখন্ডে তাদের জন্য কোন কর্ম সংস্থান করে দেওয়া হয়নি। আবার অপরদিকে ভারতীয় ছিট থেকে আসা শিবিরের মহিলাদের বিশ্বাসের অভাবে কেউ স্থানীয় গৃহের কর্মের জন্যও নিযুক্ত করতে চাইত না। ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় সেই আক্ষেপের সুর তাদের কথায় ধরা পরে- 'আমরা কারো কাছে বিশ্বাস যোগ্য ছিলাম না'।

হলদিবাড়ী ও মেখলীগঞ্জ শিবিরের মত দিনহাটা কৃষি ফার্মের জমিতে অস্থায়ী শিবিরে তাদের বরণ করে নিয়ে আসা হয়। অন্যান্য শিবিরের মতো এখানেও তাদের মাথা গোজার জন্য একটি করে টিনের ঘর দেওয়া হয়। তবে যদি কোন পরিবারের সদস্যের সংখ্যা হয় ৫ জনের উপরে তাদের মধ্যে কিছু জনকে ২ টি ঘরও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সবকিছুর মাঝে ভালো মন্দ মিলিয়েও তাদের মনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফেলে আসা বন্ধুদের স্মৃতি মধুর সম্পর্ক নিয়েই নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে হচ্ছিল। পুনর্বাসন শিবিরের এই ভয়াবহতার মধ্যদিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় তাদের জীবন শুরু করতে হয়। সেখানে মানুষিক, শারীরিক অবসাদগ্রস্থ জীবনের ক্ষোভ ব্যাক্ত করেছিলেন 'নব্য নাগরিক' পরিচিতি পাওয়া মানুষেরা।[২৫]

৪.৫. শিবিরের নব্যনাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন

২০১৫ সাল ৬ই জুন স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ভারতীয় ছিটমহলের শিবিরে নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়টি সুরক্ষিত হয়। বিনিময় পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটে অধিবাসীদের মনে দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়। ২০১১ সালের পর যখন উভয় দেশের ছিটমহলের মানুষদের রাষ্ট্র নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রাথমিক সিদ্ধান্তে ভারতীয় ছিটের থেকে ১১২৭ জন ভারতীয় মূল ভূভাগে আসার জন্য সম্মত দেন। কিন্তু বিনিময় প্রক্রিয়া শুরু হলে ১৮৭ জন পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে।[২৬] কিন্তু প্রতিকূলতা থাকা স্বত্বেও সীমান্ত চুক্তি (LBA) ছিটমহলের রাষ্ট্রহীন অধিবাসীদের রাষ্ট্রীয় করে তোলার উল্লেখযোগ্য প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বিনিময় পরবর্তী 'ভারতীয় ছিটের' অধিবাসী অথবা যারা 'বিনিময় হয়নি' তাদের জন্য উভয় দেশের সরকার তাদের তাদের জীবন যাত্রার উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহন করে। এছাড়াও ছিটমহলগুলিতে থাকা অধিবাসীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এবং এই মর্মে তৎকালীন অর্থবর্ষে ৩০০৮.৮৯ কোটি টাকার বাজেটও ঘোষণা করা হয়।[২৭] আদের উন্নতির স্বার্থে সাবেকি অধিবাসীদের জন্য রাস্তাঘাট, স্কুল, অঙ্গনওয়ারী প্রেক্ষাগৃহসহ একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয় ও কিছু কিছু বাস্তবায়িত হয়েছিল। এর পাশাপাশি নব্য নাগরিকদের জন্যও ভারত সরকারের থেকে পরিকল্পনা নেওয়া হয়।[২৮]

৪.৫.১. অস্থায়ী শিবিরের নাগরিক জীবন

প্রাথমিক অবস্থায় বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা শিবিরের অধিবাসীদের নানারকম সংঘাতের কিংবা সমালোচনার স্বীকার হতে হয়েছিল। একইসাথে তাদের আবাসন দেওয়ার ব্যাপারে কিছু নিয়ম ও নির্দেশ বেঁধে দেওয়া হয়। পরিবারের পাঁচ জন মাথা পিছু একটি করে টিনের ঘর দেওয়া হয়। এই ঘরগুলির আয়তন ১৪ x ১৫ ফুট যা দুটি কক্ষে বিভক্ত ছিল। প্রথম অবস্থায় তারা

যখন এসেছিলেন তাদের একত্রিত ভাবেই রান্নার ব্যবস্থা ছিল, ছিল ভোজনশালা, পর্যাপ্ত পরিমান শৌচালয়, জলের পাম্প ইত্যাদি। এই শিবিরের মত বাকি শিবিরগুলির চরিত্র ছিলো অভিন্ন। কিন্তু বিভিন্ন কথপোকথনের থেকে জানা যায় যে, অনেকে বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত থাকার ফলে সঠিক সময়ে একত্রিত হয়ে সকলের খাওয়া দাওয়া করা সম্ভব ছিল না। ফলত, কিছু দিনের মধ্যেই নিজেরা নিজেদের খাবার বানিয়ে নিত। আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধার অধিকারী হলেও বাস্তবে তাদের শিবিরে অভ্যন্তরে সমস্যার অন্ত ছিল না।[২৯]

(ক). স্বাস্থ্য পরিষেবা: পুনর্বাসন শিবিরগুলির মধ্যে দিনহাটা, মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ীর এই তিনটি শিবির একেবারেই মহকুমা শহরের নিকটে। তাই শিবিরে থাকাকালীন যেকোন অসুবিধার জন্য শহরের সব রকম সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতে পারতেন। বিনিময়ের পর থেকে তারাও সাবেকী ছিটের মানুষদের মতই সমমর্যদা পেতেন। দিনহাটা শিবিরে আসার পর ৪ জন শিশুর প্রসূতি হয়। এই প্রতিটি শিশুকে দিনহাটা হাসপাতালে প্রসব করানো হয়। এছাড়াও শিবিরে নিয়ম করে পোলিও, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া সবরকম স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হত।[৩০]

(খ). খাদ্য পরিষেবা: ছিটমহল পুনর্বাসন শিবিরে সরকারের থেকেই খাদ্য পরিষেবার করার জন্য রেশনের ব্যবস্থা ছিল। এই সব কিছু শিবিরের বাইরে থাকা অধিবাসীদের কাছে শিবিরে থাকা মানুষগুলোর প্রতি ইর্শা আরোও বাড়িয়ে তুলেছিল। কিন্তু বিনিময় পূর্ব ৬৮ বছরে তাদের নিজেদের জমিতেই উৎপাদিত দ্রব্য খেয়ে জীবন অতিবাহীত করতে হত। কারণ, ছিটমহলের অধিবাসীদের মূল ভূখণ্ডের ভূভাগে প্রবেশের অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হত না। ফলত, বাজার ঘাট সব কিছুর মধ্যেই একটা প্রতিবন্ধকতার ছবি ধরা পরেছে।

এই তিনটি শিবিরে প্রথম পর্যায়ে তাদের একসাথে রান্নার ব্যবস্থা থাকতো। তার জন্য একটা নিদিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এরফলে সকল পরিবার বা ব্যাক্তির ক্ষেত্রে রোজ প্রায় ২ ঘণ্টার মত সময় খাওয়ার জন্যই নষ্ট হত। তাই তারা নিজেরা আলাদা আলাদা করে রান্না করে খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। হলদিবাড়ী ছিটমহল শিবিরের অধিবাসী জয়প্রকাশ রায়ের কথায় বর্নিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে তাদের এই সমস্যার কথা তিনি অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে পরিবার পিছু রেশন সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানায় এবং প্রশাসনের থেকে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়। শিবিরের দেওয়া নব্য নাগরিকদের দেওয়া সরবরাহযোগ্য দ্রব্যের তালিকে নিম্নে দেওয়া হলো।[৩১]

সরণি - ৩

প্রতিটি পরিবার পিছু মাসিক খাদ্য পরিষেবার বিনামূল্যে সরবরাহকারী দ্রব্যাদি	
চাল	৩০ কিলো
মুসুর ডাল	৫ কিলোগ্রাম
পাউডার দুধ	১ কিলোগ্রাম
খাওয়া লবন	১ কিলোগ্রাম
সরসার তেল	৫ লিটার
কেরোসিন তেল	৫ লিটার

[* *যদি ৫ জন এর বেশি পরিবারের সংখ্যা হয় তাদের ৫ কিলোগ্রাম চাল আরো অতিরিক্ত দেওয়া হত*]।

(গ). শিক্ষা পরিষেবা: ছিটমহলের জীবনে শিক্ষা তেমন কোন ছিল না। যদিও বা তা হয় তার জন্য ভারতীয় ছিটের অধিবাসীরা নকল ঠিকানা বানিয়ে বাংলাদেশের স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ হত। হলদিবাড়ী শিবিরে থাকা দুই জন ছাত্রের কথায় বাংলাদেশের শিক্ষা গ্রহণের সংকটের স্পষ্ট চিত্র উঠে এসেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহল বাসীদের অনেকেই নকল

পরিচয়ের অবলম্বনে স্কুল কিংবা কলেজে ভর্তি হয়েছে। বিনিময় হয়ে যাওয়ার পর নাগরিকত্বের সমস্যা সমাধান হওয়ায় এদের অনেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশের কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। বিনিময় হয়ে আসার পর ভারতীয় স্কুল কলেজে ভর্তি হয়েছে ঠিকই যদিও এদের কেউই কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়নি। আবার যাদের নকল পরিচয়ে ভর্তির শংসা পত্রগুলি ছিল ভারতে তা গুরুত্ব দিয়ে গ্রহন করা হয়নি। ফলত, শুরুর দিকে অনেকে শিক্ষা প্রতিষ্টানে ভর্তি হলেও পরে অনেকে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। যা বিনিময় হয়ে আসা ভারতীয় ছিটের সবুজ রায়ের কথায় উঠে আসে।[৩২]

আবার একই রকম অবস্থার স্বীকার ছিল অন্য প্রসাদ রায় (২২)। অন্য প্রসাদ নাজিরগঞ্জ ৪১ নং ছিটের বাসিন্দা। তিনি বলেন নাগিরগঞ্জ ছিট থেকে ৩৯ জন যারা ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তাদের মূলত পার্শ্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে কালিয়াগঞ্জ নবারুন দ্বিমুখী বিদ্যালয়। এই স্কুলটি বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত। ছিটমহলে জন্ম গ্রহন করায় তাদের কোন জন্মের শংসাপত্র ছিল না। এরফলে স্কুলের ভর্তির ক্ষেত্রে যে অত্যাবশ্যকীয় ছিল তার পরিবর্তে স্কুলে ভর্তির জন্য পার্শ্ববর্তী নেতাদের মৌখিক অনুমোদনের ওপর নির্ভর করতে হত।[৩৩]

অন্ন প্রসাদের মত একই ছিটের সনদ রায়ের (২১) ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েতের সুপারিশে শিক্ষার সুযোগ ঘটেছিল। কারণ তাদের কারো কাছেই কোন জন্মের শংসা পত্র ছিল না। শিক্ষাকেন্দ্র থেকে পড়াশুনা শেষ করলেও এদের কেউ সরকারী চাকুরির সুযোগ পেত না।[৩৪] হলদিবাড়ি ছেলেদের পাশাপাশি এই শিবিরের মেয়েরাও ভারতের স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তবে পারিবারিক অভাবের কারণে মাঝপথেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলত, তাদের ঘরের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে হয়েছিল। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই অর্থনৈতিক অভাবের ফলে কিছু দিনের মধ্যেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই সবকিছুর মধ্যে বিনিময় পরবর্তী ছিটমহল

সমস্যার যে সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছিল তা নিয়েও নব্য নাগরিকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যা সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্যগুলিতে ধরা পরে।[৩৫]

৪.৬. অভাব ও অভিযোগ

নতুন রাষ্ট্রগঠন (বাংলাদেশ) কিংবা বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা স্মৃতির মাঝে 'ছিটমহল বিনিময়' ভারতীয় ছিটমহলের নাগরিকদের স্থায়ী নাগরিক পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছিল। এই সুযোগ কতটা সফল অথবা ব্যর্থ হয়েছে তা শিবিরের ব্যাক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। বরং তাঁরা স্বাধীনোত্তর সাত দশকের উভয় রাষ্ট্রের গৃহীত দ্বিপাক্ষিক ব্যার্থতাকেই দায়ি করেছেন। তাঁরা আজ রাষ্ট্রহীনতা থেকে মুক্ত হলেও বর্তমান সরকারের নীতির ওপরেও একাধিক অভাব-অভিযোগ তুলে ধরেছেন। যা জয়প্রকাশ রায়, নারায়ণ রায়, স্বপন বর্মন প্রমুখের কথায় বারংবার উঠে এসেছিল।

হলদিবাড়ী শিবিরের অধিবাসীদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশ ত্যাগের (বাস্তুচ্যুত) কঠিন বাস্তবতাকে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে নানা রকম প্রতিকূলতার মাঝে ভারতীয় ভূখন্ডে আসার পেছনে ছিল একাধিক প্রত্যাশা। যার অনেকটাই সম্পন্ন হলেও কিছু অসম্পূর্ণতার কারণে তৈরি হয়েছিল ক্ষোভ। তারা বলেছেন-

> *"হলদিবাড়ি শিবির আমাদের কাছে প্রথম জীবনের নাগরিকত্বের অনুভব দিয়েছিল। আমরা কৃতজ্ঞ সরকারের থেকেও আমাদের জন্য থাকার জায়গা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল জন্তু জানোয়ারদের থাকার পরিবেশের মতো। এই শিবিরের মেয়েদের কে আবার অন্য চোখে দেখা হত।"*

দিনহাটার শিবিরের প্রসঙ্গে দৈনন্দিন জীবন চালনের সামান্যতম পরিষেবা সংক্রান্ত প্রসঙ্গে তাদের ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। শিবিরের আসার পর যে অস্থায়ী শিবিরে বসবাসের জন্য ঘরগুলি

দেওয়া হয়েছিল প্রথমে ভালো থাকলেও পরিচর্যার অভাবে তা বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের জন্য পরিবার প্রতি দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি করে আবাসন (Flat) নির্ধারিত হয়। কিন্তু দুই বছরের (২০১৭) মধ্যে আবাসনগুলি হস্তান্তর না হওয়ায় সকলের মনে একটা অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়।[৩৬] কিন্তু ২০২০ সালের পর থেকে একে একে শিবিরের অধিবাসীদের আবাসনগুলি হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।[৩৭]

মেখলীগঞ্জ শিবিরটি ভোটবাড়ি কৃষিফার্ম এলাকায় গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের ছিটের অধিবাসীরূপে বিনিময় হওয়া মানুষদের মনে নতুন বাসস্থান নিয়ে তৈরি হয়েছিল আবেগ। এই শিবিরে মোট ৫০ টির পরিবার বসবাস করত। বিনিময়ের পূর্বে তাঁরা বাংলাদেশের হাতিবান্দা, বাঁশকাটা, লোথামারি ছিটের মধ্যে বসবাস করত। যা ছিল পাটগ্রাম ও হাতিবান্দা উপজেলার অধীনে। ভারতে সীমানা অতিক্রমের মধ্য দিয়ে একাধিক প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল তাদের মনে। কারণ পুনর্বাসনের জন্য ধার্য টাকার দ্বারা যে নতুন নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তার মধ্যে ছিটমহলের অধিবাসীরা অন্তভূক্ত ছিল। কিন্তু মেখলীগঞ্জ মহকুমা শিবিরের অধিবাসীরা তাদের জন্য যে আবাসন পানিশালায় (১৫২ নং মৌজা) নির্মাণ করা হয়েছিল তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। এই স্থানের নির্মীয়মান আবাসন নিয়ে শিবিরের থাকা অধিবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। তাদের অভিযোগের মূখ্য যে কারণ তা হল, পুনর্বাসনের জন্য আবাসনের যে জায়গাটি নির্ধারণ করা হয়েছে তা নদীর পাশ্ববর্তী (ধরলা নদী) হওয়ায় তা বসবাসের অযোগ্য ছিল। কারণ, যদি তাদের কোন কিছুর প্রয়োজনে মেখলীগঞ্জ শহরে আসতে অতিরিক্ত ১৫ কিলোমিটার পথ সহ নদী অতিক্রম করতে হবে। এছাড়া অবহাওয়া পরিবর্তনে বর্ষা কিংবা বৃষ্টি হলে তাদের আরও কঠিন প্রতিকূলতার সন্মুখীন হতে হবে বলে তাঁরা জানায়। এবিষয়ে মেখলীগঞ্জ মহকুমার আধিকারিক অপ্রতিম ঘোষের কাছে তাদের অভাব ও অভিযোগ লিখিত আকারে জানিয়ে ছিলেন। তবে প্রতিবারের মত আমলাদের দেওয়া

সিদ্ধান্ত প্রতিশ্রুতি মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই নিয়ে মেখলীগঞ্জে শিবিরের অধিবাসীদের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।[৩৮] অতি সাম্প্রতি তিনটি শিবিরের থাকা অধিবাসীদের ৯৬টি পরিবারকে আবাসন বা ফ্ল্যাট বাড়ি দেওয়া হয়েছে। তবে এই আবাসনগুলি নিয়ে নব্য নাগরিকদের থেকে নানান অভাব ও অভিযোগের কথা উঠে এসেছে। ২০১৯ সালে এই শিবিরের ৯৬ টি ৫জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারগুলোকে দুটি কক্ষের আবাসন দেওয়া হয়। তবে আবাসনগুলি বসবাসের অনুকূল ছিল না। এই প্রসঙ্গে শিবিরের অধিবাসী কমলেশ সরকার বলেছেন-

'আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৩ জন কিন্তু এই দুটি করে ঘর, আমি ভাবছি আমরা থাকবো কি করে'।

ইতিপূর্বে তার ভাই নিত্যানন্দ্য সরকার আবাসনগৃহ পরিত্যাগ করে পরিবার সহ পুনরায় শিবিরে ফিরে যায়। তিনি ক্ষোভে হুমকি দিয়ে বলেছেন যে তাকে যদি অতিরিক্ত ফ্ল্যাট দেওয়া না হয় তাহলে সে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। এই একই সুর শোনা গিয়েছিল কমলেশ বাবুর গলায়। শিবিরের থাকা ভারতীয় ছিটমহলের মানুষদের নতুন বাসস্থান নিয়ে যে আবেগ তৈরি হয়েছিল, বাস্তবিক ক্ষেত্রে তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল একাধিক মত বিবাদ।[৩৯]

৪.৬.১. নব্য নাগরিকদের সাথে মূল ভূখণ্ডের নাগরিকদের সম্পর্ক

২০১৮ সালের বিনিময় পরবর্তী সময়ে উভয় রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। এই সমস্যার ঠিক সমসাময়িক সময়ে দাঁড়িয়ে নাগরিকত্ব পঞ্জীকরণের মত বিতর্কের মাঝেও বিনিময়কৃত ছিটমহলের অধিবাসীরা ছিল এর বাইরে।

২০১৫ সালের ৩১ শে জুলাই ভারতীয় ছিটমহল থেকে দিনহাটা, মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ি শিবিরে যারা নব্য নাগরিক হিসাবে এসেছিল তাদের প্রাথমিক অবস্থায় নানান প্রতিকূলতার

সম্মুখীন হতে হয়। সেই দেশের মূল ভূখন্ডের নাগরিক সমাজের কাছে তারা ব্রাত্য হয়ে পরেছিল এবং শিবিরের সাথে জুড়ে গিয়েছিল কিছু শর্ত। যদিও এই পরিস্থিতির স্বীকার তাদের বেশীদিন হতে হয়নি। মেখলীগঞ্জের শিবিরের বাসিন্দা স্বপন বর্মন জানিয়েছেন যে প্রথমে তাদের অন্য চোখে দেখা হতো। কারণ তাদের কাউকেই স্থানীয় মানুষেরা বিশ্বাস করতেন না। ফলত, কাজের অভাব বোধ করতেন। এই পরিস্থিতির সাথে তারা ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়ে চলতে শিখলে মানুষের প্রতি ওই বিশ্বাস আসার ফলে তাদের প্রতিবেশিরাও স্বাভাবিক ভাবে গ্রহন করতে শুরু করে।[৪০]

ভারতীয় ছিটের অধিবাসী রূপে ভারতের মুল ভূখন্ডে এলে প্রতিবেশীদের সাথে যে দূরত্ব ছিল তা অনেকটাই স্বাভাবিক হতে শুরু করে। একে অপরের প্রতি বিশ্বাস তাদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধকে দৃঢ় করে। হলদিবাড়ী ছিটমহল পুনর্বাসন শিবিরের সাথে সাবেকি ছিটমহলের অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য ধরা পরে। প্রতিবেশী সাবেকি ছিটের অধিবাসীরা তাদের সাথে নিজেদের তুলনামূলক প্রসঙ্গে নব্য নাগরিকেরা কোন সমস্যার মধ্যে নেই, বরং আমারাই তাদের থেকে বেশি সমস্যার মধ্যে পরে আছি।[৪১]

প্রসঙ্গক্রমে দিনহাটায় আসা নব্য নাগরিকদের অভিযোগও ছিল যথেষ্ট। দিনহাটার নারায়ণ রায়ের মত মানুষের কাছে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার বিন্দুমাত্রপূরণ হয়নি বলে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন। কারণ দেশভাগের পর ২০ থেকে ৩০ বছর আগে চলে আসেন তাঁরাই আজ সরকারী চাকুরী পেয়ে গেছে। তাঁরা সকলেই প্রায় ভালো ভাবে আছেন। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলে দুই দেশের ব্যর্থতা তাদের আজও বঞ্চনার মধ্যেই ফেলে দিয়েছে।

তাই এই সমস্ত কথপোকথনের মাধ্যমে একথা বলা যায় যে দিনহাটা শিবিরবাসীদের দৈনন্দিন জীবন অতটা মসৃণ ছিল না।[৪২] দেশত্যাগ করে আসার কষ্টের মাঝে সরকারের নেওয়া প্রকল্পগুলি ছিল প্রলেপমাত্র। তারই মাঝে তিনি সাবেকি ছিটমহলের অধিবাসীদের সাথে শিবিরের থাকা ব্যক্তিদের সুসম্পর্কের অভাব অভিযোগের জায়গাটি নজরে আনেন। তারা হয়তো আজ রাষ্ট্রহীনতার থেকে মুক্তি পেয়েছে, তবুও তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আজও অনেক ক্ষেত্রেই একই রকম ছিল।

৪.৬.২. ভারতীয় সরকার কর্তৃক নব্য নাগরিকদের স্বীকৃতি প্রদান

নব্য কিংবা পুরাতন যাই হোক না কেন রাষ্ট্রীয় পরিচিতি প্রাপ্তির ফলে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি আদায়ের সাথে ব্যক্তিকেও সেই রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হয়। বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্র '*ভোরের কাগজ* ২০ই নভেম্বর ২০১৫ থেকে জানা যায়- ৬০ জন মানুষ হাতিবান্দা ছিট ছেড়ে ভারতের দিকে পাড়ি দিয়েছে নব্য নাগরিক হয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে।[৪৩] ছিটমহল বিনিময় সময়ে ৯৮৭ জন নাগরিক ভারতে মূল ভূখণ্ডে নব্য নাগরিকত্বের রূপে নাগরিকত্ব পেয়েছিল। কিন্তু নাগরিক হয়ে ওঠাই তো শেষ কথা নয়, এই সাথে সাথে ছিল তাদের সম্মুখে নতুন নতুন সমস্যা যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের নাগরিকত্ব প্রদানে উভয় দেশের সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাদের জন্য ভোটার কার্ড, জর্ব কার্ড, রেশন কার্ড ও আধার কার্ড গড়ে দেওয়া হয়। যা নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল:

(ক) ভোটার কার্ড: নাগরিক হয়ে ওঠার প্রধান অবলম্বন ছিল সেই দেশের সচিত্র সংশাপত্র প্রাপ্তি। সেই মর্মে ছিটমহল বিনিময়ের পর নব্য নাগরিকদের জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহন করা হয়, যাতে তারা মূল নাগরিকদের মত নিজেদের সেই দেশের নাগরিক হিসাবে প্রমান দিতে

পারে এবং ভোটাধিকার অর্জন করতে পারে। ২০১৫ সালে ভারতে পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটে এই মানুষগুলি প্রথম ভোট দানের সুযোগ পান। ২০১৬ সালে *Election Law Amendment bill* পাশ হয় লোকসভায়। ওই বছর ৩রা মার্চ রাষ্ট্রপতি দ্বারা অনুমোদনের পর ভোটাধিকারের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়।[৪৪]

হলদিবাড়ীর ছিটমহল পুনর্বাসন শিবিরের মত দিনহাটা ও মেখলীগঞ্জ পুনর্বাসন শিবিরে থাকা নব্য নাগরিকরাও ভোটাধিকারের অধিকার পায়। কিন্তু ভোটধিকার হলেও তাদের ভোট পর্বকে কেন্দ্র করে সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল। হলদিবাড়ী পুনর্বাসন শিবিরের মানুষদের সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলি জোরপূর্বক ভোট দানে বাধা দেয়। ফলত, ছিটে ৯৬ টি পরিবার থাকলেও মোট ৪-৫ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও ছিটমহল বিনিময় পূর্বে কেউ কেউ বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডে ভূয়ো নাগরিক পরিচয়ে (*Proxy Citizen*) নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহন করেছিল।[৪৫]

দিনহাটা ছিটমহল পুনর্বাসন শিবিরে ভোটদানের অভিজ্ঞতাও ছিল একই রকম। তারাও ভোট পর্বে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তবে দুই একজন গিয়েছিল ভোট দিতে যদিও যায় তাদের হাত থেকে ভোট দেওয়ার জন্য যে অনুমতি পত্রটি দেওয়া হয়েছিল তা কেড়ে নেওয়া হয়। সেই সমস্ত দুস্কৃতিরা তাদের বলে ভোট দিতে আর আসতে হবে না। তাদের বোকা ভেবে বলা হয় রাত ১০টার সময় আসতে। তাই তারা নাগরিকত্বের অধিকার প্রাপ্ত হলেও সমাজ বিরোধীদের প্রভাবে ভোটেদানের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হন। তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যারা বিনিময়ে আগে ভোটধিকারে প্রয়োগ করেছিল তাঁরা ভোট দিতে পেরেছিল। তবে সেক্ষেত্রে পুরুষরাই ভোটদান করেছিল, মহিলারা সেখানে কোন ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। বিনিময় পরবর্তী সময়ে এই ভাবেই নব্য নাগরিক রূপে ভারতে মূল নাগরিকত্বের প্রধান অধিকারকে তাঁরা উপভোগ করেছিল। তাই বলা যায়, নিয়োমগত ভাবে

ভোটারকার্ড তাদের থাকলেও ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে তারা কোন রকম নির্বাচনের অংশগ্রহণ করতে পারতেন না।

(খ) আধার কার্ড: ভারতের নাগরিকত্বের পরিচয়গত প্রমাণের আর এক মাধ্যমে হল আধার কার্ড (Aadhar Card)। 'নব্য নাগরিক' রূপে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে ভারতীয় ছিটের মানুষদের জন্যও এটি ছিল সমভাবে প্রযোজ্য। ২০০১ সালে পূর্বতন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপায়ীর সময়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর সুরক্ষার ও লোকসংখ্যার বিষয়টি মাথায় রেখে স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র (Unique Identification) ব্যাপারে আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে ২০০৯ সালে ভারত সরকারের Unique Identification Authority of India (UIDAI) এই প্রকল্পের দ্বারা বাস্তবায়িত করা হয়। এরপর ২০১৯ সালে তা ভারতের সর্বত্র চালু হয়েছিল। ভারতীয় নাগরিক হয়ে ওঠার সাথে ব্যাঙ্ক পরিষেবা, যান্ত্রিক উপায়ে ভোট প্রয়োগে, অথবা ট্রেনের টিকিটের মত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলোর মধ্যে আধার কার্ডের ব্যবহার অপরিহার্য।[৪৬] তাই নব্য নাগরিকরাও একই নিয়মের আওতায় পরে। যা তাদের মূল ভূখন্ডের অধিবাসীদের মত পরিচিতির প্রদানের আধার হয়ে উঠেছিল শিবিরে থাকা ভারতীয় ছিট থেকে আসা অধিবাসীদের কাছে।

(গ) জব কার্ড: বিনিময় পরবর্তী সময়ে বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা নব্য নাগরিকদের শিবিরের নতুন পরিবেশে তাদের দুই বছরের জন্য অস্থায়ী ভাবে রাখা হয়। কিন্তু সব পরিস্থিতিই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই তারা বহু ক্ষেত্রেই নিজেদেরকে মূল ভূভাগের অধিবাসীদের সাথে একাত্ব করে উঠতে পারেনি। তাদের কাছে কর্মসংস্থান একটা বড় সীমাবদ্ধতা হিসাবে তৈরি হয়েছিল। কর্মসংস্থানে নিয়ে আসার পূর্বে প্রাথমিক ভাবে তাদের জর্ব কার্ড করে দেওয়া হয়। কিন্তু সকলে কার্ড থাকা সত্ত্বেও কর্ম সংস্থান সুযোগ পায়নি। আর যদি পেয়েও থাকে তাতেও অভিযোগ তৈরি হতে দেখা যায়। যদিও কেউ ১০০ দিনের কাজের জন্য নির্বাচিত

হন, তবে তা শুরু হলেও কিছু দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়।[৪৭] ২০১৮ সালেও একই ধরণের অন্য একটি সমস্যা সকলের সামনে আসে। মূলত পারিশ্রমিকের টাকা নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। তাদের ১০০ দিনের কাজ করিয়ে মাত্র দিন প্রতি ৮৫ টাকা দেওয়া হত। তাঁরা এই সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।[৪৮] মেখলীগঞ্জ শিবিরেও একই ধরণের সমস্যা দেখা যায়। এখানে জব কার্ড প্রাপকরা ভেবেছিল তাদের এতদিনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বাস্তবে ছবিটা ছিল উল্টো। তাদেরকে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ১৫-২৯ দিন সুযোগ দেওয়া হত।[৪৯] দিনহাটা শিবিরের ক্ষেত্রে সরাসরি অভিযোগ করা হয়েছিল ১০০ দিনের কাজে বছরে ১৬-১৭ হাজার টাকা উপার্জন হবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু তাদের বছরে ৪-৫ হাজারের বেশী আয় হয় না। তাই জব কার্ড দেওয়া হলেও তাঁরা পূর্ণাঙ্গ কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত হত।[৫০]

দিনহাটা শিবিরে পুরুষের প্রত্যাহিক জীবনের সাথে মহিলাদের বহু ক্ষেত্রেই পার্থক্য আছে। তাঁরা মূলত বাড়ির কাজের সাথেই যুক্ত থাকত। বাড়ির কাজ করা বলতে তাদের পরিচিতি ছিল গৃহস্থালী হিসাবে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বে-সরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থা (*Non-Governmental Organisation*- NGO) দ্বারা নানা ধরণের হস্তশিল্প যেমন-ব্যাগ অথবা ঘর সাজানোর নানান জিনিস বানানোর কাজে অনেকেই আবার যুক্ত ছিলেন।[৫১] এই সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হলেও সরকার কেন্দ্রীক নেওয়া পরিকল্পনায় যে একাধিক অবেহলার স্বীকার হতেন তা জানিয়ে ছিলেন। এই সমস্ত পরিস্থিতির বিচারে মূল ভূখন্ডে আসা অধিবাসীরা জর্ব কার্ড সংক্রান্ত একাধিক বে-নিয়ময়ের অভিযোগ তুলে ছিল। কর্ম সংস্থানের কথা মাথায় রেখে তাঁরা সরকারের কাছে পরিবার পিছু একজনকে চাকরির দাবি তুলেছিলেন।

৪.৭. শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা: আধুনিক প্রগতিশীল সমাজের বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রসার ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারতীয় ছিটমহল থেকে আগত নব্য নাগরিকদের কাছে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া ছিল খুবই কঠিন দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী স্কুল পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। কার্যত তাদের কাছে—'শিক্ষা ছিল লুকিয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়া', আর ওই দেশের স্কুলে নিজের নাম নথিভুক্ত করা। তারা যে ক্যাম্প বা শিবিরে ছিল/ ছিলেন সেখানে কোন আলাদা করে স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়নি। স্কুলের গন্ডির মধ্যে প্রথমে অবিশ্বাসের জায়গা থেকে কেউ তাদের সাথে কথা বলত না। সহজে তাদের সাথে কেউ বন্ধুত্ব করতে চাইত না। ২০১৮ সালের ক্ষেত্র সমীক্ষার নিরীখে জানা যায় এই শিবির থেকে ১৮-১৯ জন হলদিবাড়ী কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিল। আবার এখানে থেকেই ৫০ থেকে ৬০ জন হলদিবাড়ী স্কুলের পড়াশোনার সাথে যুক্ত হতে পেরেছিল।[৫২]

দিনহাটার ক্ষেত্রেও একই সমস্যার পুণরাবৃত্তি ঘটে। দিনহাটায় স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে জন্মের শংসাপত্র চাওয়া হয়। কিন্তু যে সমাজ ৬৮ বছর পরাধীনতার সাথে রাষ্ট্রহীনতায় জীবন ব্যতিত করেছে তাদের কাছে জন্মের শংসাপত্র ছিল দুরহস্ত। ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা দেখেছি নারায়ণ রায়, [যিনি দিনহাটা পুর্নবাসন শিবির ক্যাম্পের অধিবাসী ছিলেন] মূলত তার সুপারিশের দ্বারা নব্য-নাগরিকদের সন্তানের স্কুল বা কলেজে ভর্তির নেওয়া হতো।[৫৩]

৪.৭.১. শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক সমস্যা: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতীয় ছিটমহল ও ভারতের অভ্যন্তরে থাকা বাংলাদেশের ছিটমহলগুলির মধ্যে জনসংখ্যা হিসাবে সংখ্যাগুরু ছিল রাজবংশী হিন্দু ও নস্যশেখ সম্প্রদায়ের শ্রেনীর মানুষ। তাদের বেশির ভাগ কামতাপুরী/রাজবংশী ভাষায় কথা বলতেন। হিন্দুরা এক্ষেত্রে ভারতীয় আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের Backword Class Welfare Department এর তালিকায় তারা তফশীলি তালিকাভূক্ত শ্রেনী (Scheduled Caste) ও নস্যশেখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা অন্যান্য পিছিয়ে

পড়া শ্রেনী ভুক্ত (Other Backward Class)। কিন্তু তাদের কেউ জাতিগত শংসাপত্র না পাওয়ার ফলে স্কুলে কিংবা কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যায় পরতে হতো। হলদিবাড়ীর ক্ষেত্রে ১৩ জন ছাত্র হলদিবাড়ী কলেজে পড়াশুনা করে তাদের রাজবংশী হিসাবে তফশিলি শংসাপত্র না থাকার কারণে সরকারী সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তবে তাঁরা ভারত সরকারের উর্দ্ধতন দফতরে সমস্যার কথা জানিয়েছিল। ২০১৮ সালের ক্ষেত্রে সমীক্ষার নিরিখে সবুজ রায়ের নিজের অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে যে, তাদের শিবিরে যে অর্থনৈতিক দুর্দশা সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র তফশিলি জাতির শংসাপত্র না থাকায় অসংরক্ষিত আসনে ১৬০০ টাকার বিনিময়ে কলেজে ভর্তি হতে হত।[৫৪] এই শিবিরে প্রায় সকলেই ছিলেন রাজবংশী (ক্ষত্রিয়) হিন্দু ও তাদের সাথে তিনটি মুসলমান পরিবার বসবাস করত। সরকারের তরফ থেকে তাদের নাম তফশিলি হিসাবে নথিভূক্ত করা হলেও তাদের কেউই শংসাপত্র হাতে পায়নি। তাই ভারত সরকারের বহু বিষয়ে স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষায় সরকারী বিভিন্ন জাতির শংসাপত্র জনিত বৃত্তিমূলক সুবিধা থাকলেও তাঁরা এই সেই সমস্ত অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত।[৫৫]

৪.৮. শিবিরের অধিবাসীরূপে দৈনন্দিন জীবিকা

কর্মসংস্থানের অভাব নব্য-নাগরিকদের দৈনন্দিন/প্রত্যহিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। তাঁরা সরকারের কাছে তাদের কর্মসংস্থানগত চাহিদার কথা জানালেও এক্ষেত্রে কোন সুরাহা হয় নি। কার্যত নব্য নাগরিকদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে শুরু করে। বাহ্যিক ভাবে এই পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি ‘ঝা-চকচকে’ মনে হলেও এর অভ্যন্তরে ছিল অভাব অনটনের চিত্র। সে অভিযোগ জয়প্রকাশ রায়, স্বপন বর্মন, নারায়ণ বায়ের বক্তব্যে উঠে আসতে দেখা যায়। এই শিবিরের সদস্যরা অন্যের বাড়িতে দিন মজুরির কাজের সাথে যুক্ত, আবার কেউ কেউ জমির

দিন হাজিরার কাজ করে নিত্যদিনের অর্থনৈতিক জোগান করতে অসংগঠিত কাজের সাথেই যুক্ত হতেন। একই সাথে কিছু কিছু ছাত্ররাও স্কুলের পড়াশুনার বাইরে টোটো গাড়ি চালিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন।[৫৬]

পুনর্বাসন শিবিরের নারীদের হতাশার অন্ত ছিল না। যাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বচ্ছল তারা পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর যারা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল তারা ঘরে বসে ঘর সাজানোর মত সামগ্রী তৈরি করার পথ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে তা শুরু হলেও বাজারের চাহিদা না থাকায় বিশেষ ভাবে লাভবান হননি। তাই প্রত্যেকটি শিবিরে একটাই কথা ---*"আমরা ফ্ল্যাট বাড়ি চাই না, চাই চাকরী"--- মেখলীগঞ্জ ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির।*[৫৭]

৪.৯. পর্যবেক্ষণ

এই অধ্যায়ের উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় আন্দোলন পরবর্তী সাফল্য হিসাবে ২০১৫ সালের ৩১ শে জুলাই Land Boundary Agreement দ্বারা এই সকল মানুষ নাগরিকত্বের অধিকায় পায়। সীমান্ত সমস্যার (Dispute) মধ্য দিয়ে যারা ছিটমহলের অধিবাসী হতে বাধ্য হয়েছিল। ২০১৫ সালের ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাস্তুহারা হয়ে পুনবাসন শিবিরে আশ্রয় গ্রহন করেছিল। এই বিষয়টি পুনরায় তাদের দেশভাগের স্মৃতিকে উস্কে দিয়েছিল।

২০১৫ সালের ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই সকল মানুষদেরকে যে কোন একটি দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতীয় ছিটের (৯৮৭) জন ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্বে [Enclaves Settlement Camp] হলদিবাড়ি, দিনহাটা ও মেখলীগঞ্জে তিনটি শিবিরে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। ছিটমহল পুনবাসন শিবিরে বসবাসকারী মূল ভূখণ্ডের মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল

ব্রাত্য। এই সকল নাগরিকদের জীবনে ফেরানোর জন্য ভারত সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একই সাথে এই প্রক্রিয়ায় তাদের জর্ব কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদি প্রদান করা হয়। যদিও সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলি ক্যাম্পের দৈনন্দিন জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি।

পরবর্তী পর্বে সরকারের থেকে স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য আবাসন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবুও দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার জন্য নানান সংকটের সম্মুখীন তাদের হতে হয়। এই ক্ষোভ থেকে তাদের অনেকে পুরানো ছিটমহলে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে। অথাৎ একদিকে ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যেমন তাদের সামনে নতুন সম্ভবনার উন্মোচন হয়েছিল, অপরদিকে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা তাদের এক দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের মুখে ফেলে দিয়েছিল।

টীকা ও সুত্র নির্দেশ

১. https://www.unhcr.org/uk/about-unhcr/who-we-are/1951-refugee দেখা হয়েছে: ১০.০৭.২০২১

২. দেবব্রত চাকী: ব্রাত্যজনের বৃতান্ত প্রসঙ্গ: ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল; (সোপান, কলকাতা, ২০১১) ।

৩. Rup Kumar Barman: '*The Origin and Evolution of the Enclaves of India and Bangladesh: A Historical Study*' (New Delhi, Abhijeet Publication,2019), পৃষ্ঠা-১৩৬।

৪. Amar Roy Pradhan: '*Rule of Jungle*', N.B. Publication, 1995।

৫.ছিটমহলের জনগনণার নীরিক্ষে: http://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=4785। দেখা হয়েছে ১২.০৭.২০২২

৬. Debarshi Bhattacharya: '*Study on Impact of Exclusion of Enclave of Dohogram- Angarpota Bangladeshi Enclaves from the Coverage of Land Boundary Agreement, 2015*' (International Journal of Research in Economic and Social Sciences), Vol-7, issue 5, May 2017, পৃ. ৭৪-৮৫।

৭. https://www.mha.gov.in/en এই ওয়েবসাইট দেখার তারিখ: ০২.০৪.২০২০

৮।MinistryofExternalAffairs:https://mea.gov.in/outogingvisitdetail.htm?25341/List+of+bilateral+documents+signed+exchanged+adopted+and+handed+over+during+the+visit+of+Prime+Minister+of+India+to+Bangladesh, এই ওয়েবসাইট দেখার তারিখ ১০.০৯.২০২২।

৯.: Debarshi Bhattacharya (2015), প্রাগুক্ত ।

১০. Hindustan Times (31.07.2015) https://www.hindustantimes.com/india/enclave-exchange-india-bangladesh-to-make-history-at-midnight/story-Kc3121DtODl8sIQyLTvbKK.html। এই ওয়েবসাইট দেখার তারিখ: ১৬.০৭. ২০১৫।

১১. Sreeparna Banerjee, Ambalika Guha, Anasua Basu Ray Chaudhury: '*The 2015 India-Bangladesh Land Boundary Agreement: Identifying Constraints*

and Exploring Possibilities in Cooch Behar' (Observer Research Foundation, July 2015), পৃ. ২।

১২. মোহাম্মদ গোলাম রববানী; *বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল অবরুদ্ধ ৬৮ বছর*, (প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৭), পৃ.১০৯।

১৩. তদেব, পৃ.পৃ. ১০১-১০৩।

১৪. Arup Joyti Das: *'Kamtapur and the Koch Rajbanshi Imagination'*, (Montage Media, Guwahati, Assam, 2009), পৃষ্ঠা- ১০২।

১৫. *উত্তরবঙ্গ সংবাদ*, 'বংশীবদনের সাথে সাক্ষাৎ সমস্যা মেটাতে বিভিন্ন দলের কাছে সাহায্য চাইবে ছিটমহলের সমন্বয় কমিটি', (৯ ই জুলাই ২০১০, শিলিগুড়ি)।

১৬. *উত্তরবঙ্গ সংবাদ*, 'ছিটমহল নিয়ে কেন্দ্রীয় উদ্যোগকে স্বাগত ফ-ব', ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩, (শিলিগুড়ি)।

১৭. Note: বিনিময় পূর্বে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটগুলো বিনিময় পরবর্তী সাবেকী ছিট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অথবা '*নব্য নাগরিকদের* (Note) (ভারত ও বাংলাদেশের ২০১৫ সালে ৩১সে জুলাই বিনিময় হলে উভয় দেশের অভ্যন্তরে থাকা ছিটের অধিবাসীদের অধিকার দেওয়া হয় তারা কোন দেশের নাগরিক হতে চান। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটের থেকে ৯৮৭ জন ভারতীয় ছিটের নাগরিক যারা ভারতের মূল ভূখণ্ডের অধিবাসী হয়ে ভারতে চলে আসে। প্রথম অবস্থায় তাদের ধাপে ধাপে নিয়ে আসা হয়। ভারতের কুচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ, দিনহাটা ও হলদিবাড়ী তে তিনটি ক্যাপ করে রাখা হয়, এই নতুন নাগরিক হয়ে আসা মানুষকেই নব্য নাগরিক বলা হয়েছে)

১৮. http://coochbehar.nic.in/HTMfiles/Mekhliganj_Block.html এই ওয়েবসাইট দেখার তারিখ ১০.০৯.২০২২।

১৯. সোমার রায়: [হলদিবাড়ী ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার] সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২০১৬)।

২০. Rup Kumar Barman: *MAKAIAS Report*, Boloram Barman এর সাথে সাক্ষাৎকার, ২০১১।

২১. সোমার রায়: [হলদিবাড়ী ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার] সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২০১৬) ।

২২. জয়প্রকাশ রায়: [হলদিবাড়ী পূনর্বাসন শিবির, কুচবিহার],সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২০১৫)।

২৩. স্বপন বর্মন(২৭): [মেখলীগঞ্জ ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার] সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২৬.০৫.২০১৭)।

২৪. মঞ্জুবালা বর্মন (৬২): [মেখলীগঞ্জ ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২৬.০৫.২০১৭) ।

২৫. নারায়ন রায় (৪৮): [দিনহাটা ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২২.০৭.২০১৮) ।

২৬. প্রাগুক্ত, মোহাম্মদ গোলাম রববানী, পৃ. ১১৬।

২৭. Sreeparna Banerjee, Ambalika Guha, Anasua Basu Ray Chaudhury, (2017), পৃ.৯, প্রাগুক্ত।

২৮. সাক্ষাৎকার: মেখলীগঞ্জ, মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ী ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার।

২৯. সাক্ষাৎকার: নারায়ণ রায়, দিনহাটা ছিটমহল পূনবাসন শিবির, কুচবিহার, ২০২০।

৩০. আনন্দবাজার পত্রিকা, 'ছিটমহলের পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে দিলেন আসমা', ১লা এপ্রিল ২০১০, কলকাতা।

৩১. জয়প্রকাশ রায় (৪০): [হলদিবাড়ী ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (১১ই জুলাই ২০১৮) ।

৩২. সবুজ রায় (২০): [হলদিবাড়ী ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (১১ই জুলাই ২০১৮) ।

৩৩. অন্নদাপ্রসাদ রায় (২০): [হলদিবাড়ী ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (১১ই জুলাই ২০১৮) ।

৩৪. সনদ রায় (২৩), [হলদিবাড়ী ছিটমহল পূনবাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার , সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২০১৮)।

৩৫. হলদিবাড়ী ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার, ২৯.০৭.২০১৮।

৩৬. উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি।

৩৭. সাক্ষাৎকার করা হয়েছে হলদিবাড়ী ছিটমহল পুনর্বাসন শিবিরের অধিবাসীদের সাথে, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, ২০১৯।

৩৮. উত্তরবঙ্গ সংবাদ, কুচবিহার (১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭) ।

৩৯. উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি, ১৯.১১.২০১৯।

৪০. '*নাগরিকপঞ্জী ও বিভেদের রাজনীতি*', সংহতি উদ্যোগ, (জানুয়ারী ২০১৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা)।

৪১. স্বপন বর্মন (২০) [মেখলীগঞ্জ ছিটমহল পূর্নবাসন শিবির, কুচবিহার] সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২৬.০৭.২০১৭) ।

৪২. সোমার রায়, [হলদিবাড়ী ছিটমহল পূনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২০১৬)

৪৩. নারায়ণ রায় (৪৮): [দিনহাটা ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২২.০৭.২০১৮) ।

৪৪. *ভোরের কাগজ,* ২০ই নভেম্বর ২০১৫, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪৫. Mukul Chakraborty:,*'Geopolitics of Chhitmahal and Social Exclusion of Inhabitants in Indo-Bangladesh Enclaves*' September 2016, The University of Bardwan, (PhD.Thesis).

৪৬. সাক্ষাৎকার করা হয়েছে [হলদিবাড়ী পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (১৯-০৭-২০১৮)।

৪৭. orxiv.org/ftp/arxiv/papers/1708/1788.05117.pdf. এই ওয়েবসাইট দেখার তারিখ: ২৮.১২.২০১৯।

৪৮. সাক্ষাৎকার করা হয়েছে [হলদিবাড়ী পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২০১৫)।

৪৯. সাক্ষাৎকার করা হয়েছে [হলদিবাড়ী পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (১৯-০৭-২০১৮)।

৫০. সাক্ষাৎকার করা হয়েছে [মেখলীগঞ্জ ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, কুচবিহার, (২০১৮) ।

৫১. সাক্ষাৎকার করা হয়েছে [দিনহাটা ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির অধিবাসীদের সাথে, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২০১৮) ।

৫২. Sreeparna Banerjee, Ambalika Guha, Anasua Basu Ray Chaudhury, (2017), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২।

৫৩. সাক্ষাৎকার করা হয়েছে [মেখলীগঞ্জ ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির] সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, কুচবিহার, (২০১৮) ।

৫৪. সাক্ষাৎকার করা হয়েছে [দিনহাটা ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির অধিবাসীদের সাথে] সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, কুচবিহার, (২০১৮) ।

৫৫. অন্নদাপ্রসাদ রায় (২০): [হলদিবাড়ী ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (১১ই জুলাই ২০১৮) ।

৫৬. স্বপন বর্মন (২০) [মেখলীগঞ্জ ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার] সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২৬.০৭.২০১৭) ।

৫৭. নারায়ণ রায় (৪৮) [দিনহাটা ছিটমহল পুনর্বাসন শিবির, কুচবিহার], সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে, (২২.০৭.২০১৮)

উপসংহার

রাষ্ট্রহীনতার প্রশ্নটি বর্তমান বিশ্বের কাছে বহুল চর্চিত। বিশ্বের বহু দেশ এই সমস্যা থেকে আজও মুক্ত হতে পারে নি। বর্তমান গবেষণায় ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের রাষ্ট্রহীন নাগরিকদের নাগরিক হয়ে ওঠার ক্রমাগত সংগ্রামকে দেখানো হয়েছে। যেখানে ধরা পড়েছে দুই দেশের অভ্যন্তরে থাকা বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের নাগরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা তাদের নিরপত্তার অস্পষ্টতা। এই অস্পষ্টতার জায়গাটি নিয়ে ছিটমহলের জনমানসে ও মূল নাগরিকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে জোরালো প্রতিবাদ। সে প্রতিবাদের ভাষায় উঠে এসেছে তাদের নাগরিকত্ব ও মানবাধিকারের সুরক্ষার প্রশ্নটি।

প্রতিটি রাষ্ট্রই তার সীমারেখার মধ্যে তার ভূখণ্ডের আত্মপরিচয়কে নিদিষ্ট করে। সেই সাথে তার অভ্যন্তরে থাকা নাগরিকেরা পায় তাদের রাষ্ট্রীয় আত্ম পরিচিতি। প্রাথমিক পর্যায়ে ছিটমহলে থাকা রাষ্ট্রহীনতা ও মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে নাগরিক সমাজের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ছিটমহল নিয়ে দুই দেশের রাষ্ট্রহীন নাগরিকদের নিস্পত্তির বিষয়ে একাধিকবার মিলিত হয়েছে। কারণ বিশ্বের অনান্য রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রহীনতা নিয়ে চর্চা হলেও ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ছিটমহলে জনসংখ্যার পরিমান ছিল লক্ষ্যনীয়। তাই ২০১৫ সালে ৩১ সে জুলাই 'ছিটমহল বিনিময়ের' মধ্য দিয়েই ছিটমহল সমস্যার চিরতরে অবসান ঘটে।

ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল নিয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে কুচবিহারের ইতিহাস নিয়ে চর্চা অনিবার্য। কারণ মধ্যযুগের সৃষ্ট 'চাকলা' গুলি আজকের আধুনিক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক স্তরে ছিটমহল বলেই পরিচিতি তৈরি করেছে। যে ছিটমহল সৃষ্টির সাথে আছে মুঘল ও কুচবিহারের

মহারাজা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কিংবা কুচবিহারের মহারাজা ও মুঘলদের সাথে পাশা খেলা নিয়ে কিংবদন্তীমূলক গল্প। আর এই ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর গভীরে ছিটমহলের মানুষের জীবনে তৈরি হয়েছিল নাগরিকত্বহীন হয়ে ওঠার ইতিহাস।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিমালয়ের পাদদেশ কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় ছিটমহলের সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত চর্চা করা হয়েছে। ছিটমহল সমস্যা সম্পর্কে প্রতিবেশি ভূখণ্ডের অধিবাসীরা খুব বেশি অবগত ছিলেন না। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ছিটমহল সংক্রান্ত সৃষ্টি গোড়াপত্তন হয়েছিল মধ্যযুগে। যেখানে প্রাক্‌জ্যোতিষপুর থেকে কামরূপ ছিল একেবারেই প্রভাব মুক্ত। বর্তমান এই ইতিহাস অনুসন্ধানে ছিটমহলগুলি ছিল এই ভূভাগেরই অংশ। যাকে কেন্দ্র করেই পূর্বে ছিটমহলের কিংবদন্তী, রাজনৈতিক সংযোগের ও ভ্রাতৃঘাতি বিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে সুযোগে কখনো মুঘল, কখনো ভুটান আবার কখনো বিট্রিশ শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেই সূত্রে ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টির সাথে এই জেলার কিছু বিচ্ছিন্ন ভূভাগ ভুটানের শাসনাধীনে চলে যায়। বিট্রিশরা ক্ষমতায় এলে Anglo-Bhutan Treaty (১৭৭৩) সালে কুচবিহার করদ মিত্র রাজ্যে 'Semi-colonial' সম্পর্কের দ্বারা দুই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা সমাধানে সমর্থ হয়। কিন্তু এরই মাঝে কুচবিহার ও বাংলাদেশের চাকলা গুলির সমস্যার সমাধান নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত অমীমাংসিত থেকে যায়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের কাছে সীমানা নির্ধারনের বিষয়টি ছিল অন্যতম সমস্যা। ব্যরিষ্টার সিরিল র‍্যাডক্লিফ্‌কে সেই দ্বায়িত্বভার দেওয়া হয়। কিন্তু উভয় পাশ্ববর্তী ভারত ও বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বিক্ষিপ্ত ভূখণ্ডগুলি সীমান্ত সমস্যা নিষ্পত্তির বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৯৪৯ সালে কুচবিহারে ভারত ভুক্তি চুক্তি বা Instrument of Accession এর ফলে জটিলতা তৈরি হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন হতে শুরু করে। এই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) সীমান্ত সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কারণ, সীমান্ত সমস্যার জড়িয়ে ছিল মানবাধিকারের মত বিষয়। ১৯৪৮ সালে ১০ই ডিসেম্বর *Universal Declaration of Human Rights* এর ১৫নং ধারায় প্রত্যেক ব্যাক্তির নাগরিকত্বের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করা হয়। রাষ্ট্র সংঘ কতৃক অপর দুটি নির্দেষ রাষ্ট্রহীন মানুষদের স্বার্থে করা হয়েছিল। প্রথমটি হল (ক) *Convention Relating to the Status of Stateless Persons(1954)* ও (খ) Convention *Relation on the Reduction of Statelessness(1961)* যা রাষ্ট্রহীন নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় আত্মপরিচয় দিতে প্রয়াসী হচ্ছে। তবুও যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের এর মত বিষয়গুলি আজও বিশ্বের নানা স্থানে রাষ্ট্রহীন করে তুলছে বহু মানুষকে। যার প্রকোপ থেকে নারী-পুরুষ কিংবা শিশুরাও মুক্ত নয়। অতি সম্প্রতি আফগানিস্তান কিংবা ইউক্রেনের যুদ্ধ প্রসঙ্গটি বিশ্বের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক সমাজের সামনে তুলে ধরছে রাষ্ট্রহীনতার ক্রমপর্যায়কে।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে সীমান্ত সমস্যা আবারো দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতার সাথে সীমানার অভ্যন্তরে পরে থাকা উভয় রাষ্ট্রের বিক্ষিপ্ত ভূখণ্ডগুলি ছিটমহলে রূপান্তরিত হয়। সেই বিচ্ছিন্ন ভূভাগের অধিবাসীদের অবস্থান মূল ভূভাগের (Host Country) কাছে রাষ্ট্রহীন করে তুলেছিল প্রায় ৫০ হাজারের মত মানুষকে (২০১১ সালের ছিটমহল জনগনণা)। এই ভূ-ভাগের মানুষদের রাজনৈতিক ও মানসিক সত্তা ছিল মূল ভূ-ভাগের সাথেই সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নির্ধারনের ভিত্তিতে সমস্যাকে শিথিল করার উদ্যোগ গ্রহন করে উভয় দেশের সরকার। সেক্ষেত্রে নেহেরু-নুন চুক্তি (১৯৫৮), ইন্দিরা মুজিব চুক্তি (১৯৭৪) কিংবা তিনবিঘা চুক্তি (১৯৯২)

সীমান্ত সমস্যা সমাধানের পথ হিসাবে উঠে আসলেও তা কখনই ছিটমহলের মানুষদের মানবাধিকার হীনতা থেকে মুক্ত করতে পারে নি।

২০১০ সালে উভয় রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক ছিটমহলে জনগণনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হলদিবাড়ীর সাংসদ প্রয়াত অমর রায় প্রধান তার গ্রন্থ *'Rule of Jungle'* -এ প্রায় ১ লক্ষের মত ছিটমহলের রাষ্ট্রহীন মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। একই সাথে দেখিয়েছে মানবাধিকার উলঙ্ঘিত হওয়ার মত বিষয়গুলি। যা ১৯৯০ এর দশকে নাগরিক অধিকার আদায়ের দিকে আন্দোলনমুখী করে তুলেছিল। দৈনন্দিন জীবনে অ-নাগরিক হয়ে ওঠা ছিটমহলের অধিবাসীদের সংকট তুলে ধরেছিল নাগরিক সমাজের কাছে।

২০১৫ সাল ৩১ সে জুলাই এর প্রাক কালে একের পর এক বৈঠক উভয় রাষ্ট্রের সরকারকে বাধ্য করেছিল ৬৮ বছরের রাষ্ট্রহীনতার পরিসমাপ্তি ঘটাতে। সেই ছিটমহল বিনিময়ের সংগ্রামের ইতিহাস ভারত ও বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ছিটমহলের মানষের কাছে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। তারা রাষ্ট্রহীন মানুষের থেকে হয়ে উঠেছে 'নাগরিক'। ছিটমহলের বিনময় পরবর্তী সময়ে ছিটমহলের অধিবাসীদের যে কোন একটি দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভিতরে থাকা ভারতীয় ছিট থেকে ৯৮৭ জন 'নব্য নাগরিক' রূপে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহন ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই নব্য নাগরিকদের পুনর্বাসনের জন্য কুচবিহার জেলার অভ্যন্তরে দিনহাটা, মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ীতে তিনটি পুনর্বাসন শিবির গড়ে তোলা হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলি বিনিময় পরবর্তীতে 'সাবেকী ছিটমহল' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছিটমহল বিনিময়ের দ্বিতীয় ধাপে 'সাবেকী ছিটমহলগুলির' পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাদের প্রতিটি নাগরিকদের জন্য দেওয়া হয় ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, জাতিগত শংসাপত্র কিংবা জব কার্ড ইত্যাদি।

এছাড়াও ছিটমহলের বাচ্চাদের জন্য তৈরি হয় প্রাথমিক স্কুল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সাবেকি ছিটমহলগুলিতে হয়েছে মন্দির, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা।

ভারতীয় ছিটমহলগুলিত ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সরকারও একই রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পাটগ্রাম উপজেলার অভ্যন্তরে ৫৫টি ছিট আছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে ভারতীয় ছিটের পাটগ্রামের ১১৯ নং বাঁশকাটা ছিটের সরকারি উদ্যোগে নিয়ে সেখানকার অধিবাসীরা বিনিময় পরবর্তী ছিটমহলে তৈরি করেছে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, কৃষি বান্ধব পরিবেশ ইত্যাদি। আব্দুল ছাত্তারের কথায় বোদা উপজেলার ছিটমহলগুলিতেও প্রায় একই চিত্র উঠে এসেছিল। কিন্তু সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত না হওয়ায় এখানকার জনমানসে দেখা দেয় ক্ষোভ।

ছিটমহল নিয়ে আমার গবেষণা সন্দর্ভে ৬৮ বছরের অবদমনের ইতিহাস ও বিনিময় পরবর্তী সার্বিক চিত্র ধরা পরেছে। তা সত্ত্বেও সাবেকি ছিট কিংবা নব্য নাগরিকদের মধ্যে অভাব ও অভিযোগের আজও সুস্থ্য পরিনতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নামে সংগঠন তৈরি করে প্রকৃত সমস্যার কথা প্রশাসনের দৃষ্টিগোচরে আনার চেষ্টা চলাচ্ছে। যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা কর্মসংস্থানের মত বিষয় নিয়ে মত বিরোধ উঠে আসছে তাদের বক্তব্যে। কিন্তু তবুও উভয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে ছিটমহল সমস্যা সমাধান বিশ্বের কাছে নজির সৃষ্টি করেছে। যা আগামী দিনে উভয় রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার (তিস্তা চুক্তি, ফরাক্কা চুক্তি, অনুপ্রবেশ, রোহিঙ্গা ইত্যাদি) আশানরূপ সমাধানের পথ উন্মুক্ত করবে বলে আশা করা যায়।

সংযোজনী- I

সংযোজনী- I.I

The Anglo-Cooch Behar Treaty, 1773 AD.

Articles of the Treaty signed between the Honorable East India Company and Durrinder Narayan, the King of Cooch Behar, 1773.

Durrinder Narain, Rajah of Cooch Behar, having represented to the Honorable the President and Council of Calcutta the present distressed state of the country, owing to its being harassed by the neighbouring independent Rajahs, who are league to depose him, the Honourable the President and Council, from a love of justice and desire of assisting the distressed, have agreed to send a force, consisting of four companies of Sepoys and a field piece for the protection of the said Rajah and his country ,against his enemies , and the following conditions are mutually agreed on:-------

1st ---That the said Rajah will immediately pay into the hands of the Collector of Rungpoor 50000 Rupees, to defray the expenses of the force sent to assist him.

2nd ---That if more than 50000 Rupees are expended, the Rajah will make it good to the Honorable the English East India Company, but in case any part of it remains unexpended that it be delivered back.

3rd---That the Rajah will acknowledge subjection to the English East India Company upon his country being cleared of his enemies, and will allow the Cooch Behar country to be annexed to the Province of Bengal.

4th---That the Rajah further agrees to make over to the English East India Company one half of the revenue of Cooch Behar for ever.

5th ---That the other moiety shall remain to the Rajah and his heirs for ever provided he is firm in his allegiance to the Honrable United East India Company.

6th ---That in order to ascertain the value of the Cooch Behar country, the Rajah will deliver a fair hustobood of his district into the hands of such person, as the Honorable the President and Council of Calcutta shall think proper to depute for that purpose, upon which valuation the annual mulguzary, which the Rajah is to pay, shall be established.

7th ---That the amount of the mulguzary, settled by such person as the Honorable the East India Company shall depute, shall be perpetual.

8th ---That the Honorable English East India Company shall always assist the said Rajah with a force when he has occasion for it for the defence of the country, and Rajah bearing the expense.

9th ---That this Treaty shall remain in force for the space of two years, or till such time as advices may be received from the Court of Directors, empowering the President and Council to ratify the same forever.

This Treaty signed, sealed and concluded by the Honorable the President and Council at Fort William, the fifth day of April 1773, on the one part, and by the Durrinder Narayan, Rajah of Cooch Behar, at Behyar Fort, the 6th Maug 1179 Bengal style, on the other part.

সংযোজনী- I.II

The Anglo-Bhutan Treaty, 1774, Articles of a Treaty made between the Honourable East India Company and the Deva Raja or Raja of Bhutan.

1.That, the Honourable Company, wholly from the consideration of distress to which the Bhutias represent themselves to be reduced, and from the desire of living in peace with their neighbours, will relinquish the lands belonged to Deva Raja before the commencement of the war with the Raja of Cooch Behar, namely, to the eastward of the lands of Chikhakhata and Paglahat, and to the westward of the lands of Kyranti, Maraghat and Luckeepore.

2.That, for the possession of the Chichakhata provinvce, the Deva Raja shall pay an annual tribute of five Tangan horses to the Honourable Company, which was the acknowledgement paid to the Cooch Behar Raja.

3.That, the Deva Raja shall deliver up Dhairendra Narayan, Raja of Cooch Behar, together with his brother, the Dewan Deo, who is confined with him.

4.That, the Bhutias, being merchants, shall have the same privileges of trade as formerly, without the payment of duties, and their caravan shall be allowed to go to Rungpore annually.

That, the Deva Raja shall never cause incursions to be made into the country, nor in any respect whatever, most the ryots, that have come under the Honourable Company's subjection.

That, if any *ryot* or inhabitant whatever, shall desert from the Honourable Company's territories, the Deva Raja shall cause them to be deliverd up immediately upon application being made to him.

5.That in case of Bhutias or any one under the Government of Deva Raja shall have any demands upon, or disputes with any of the inhabitants of these or any part of Company's territories, they shall prosecute them by an application to the Magistrate who shall reside here for the administration of justice.

6.That, whatever Sannyasis are considered by the English as an enemy, the Deva Raja without allow to take shelter in any part of the districts now given up, nor permit them to enter into the Honourable Company's territories, or through any part of his; and if the Bhutias shall not of themselves be able to drive them out, they shall give information to the Resident on the part of the English in Cooch Behar and the they shall not consider the English troops pursuing the Sannyasis into these districts as ant breach of this treaty .

7.That, in case the Honourable Company shall have accession for cutting timbers from any part of woods under the Hills, they shall do it duty free, and the people they send shall be protected.

That, there shall be a mutual release of prisoners.

"This treaty to be signed by the Honourable President, and Council of Bengal and the Honourable Compay's seal to be affixed on the one part, and to be signed and sealsed by the Deva Raja on the other part".

Signed and ratified at Fort William, the 25th of April 1774.

(Signed)
Warren Hastings, William Andersey, P.M.Daores, J.Lawrell
Henry Goodwin, J. Graham, George Vansitart,
(A true copy)
(Signed)
J.Auriol
Assistant Secretary.

সংযোজনী- I.III

Treaty between his Excellency the Right Honorable Sir JHON LAWRENCE, G.C.B., K.C.S.I., Viceroy and Governor- General of Her Britannic Dhurm and Deb Rajahs of Bhootan Concluded on the one parts by Lieutenant-Colonel Herbert Bruce, C.B., by virtue of full power to that effect vested in him by the Viceroy and Governor- General, and on the other part by SAMDOJEY DEB JIMPEY and THEMSEYRENSEY DONAI according to full powers conferred on them by the DHURM and DEB RAJAHS, --1865

Article 1.

There shall henceforth be perpetual peace and friendship between the British Government and the Government of Bhootan.

Article 2.

Whereas in consequence of repeated aggressions of the Bhootan Government and of the refusal of that Government to afford satisfaction for those aggressions, and of their insulting treatment of the officers sent by His Excellence the Governor- General in council for the purpose of procuring an amicable adjustment of differences exiting between the two states, the British Government has been compelled to sieze by an armed forced the whole of Doars and certain Hill Posts protecting the passes into Bhootan and whereas the Bhootan Government has now expressed its regret for past misconduct and a desire for the establishment of Friendly relations with the British Government, it is hereby agreed that the whole of the tract known as the Eighteen Doars, bordering on the district Rungpoor, Cooch Behar, and Assam , together with the Talook of Ambaree Fallacottah and the Hill territory on the left bank of Teesta up to such points as may be laid down by the British Commissioner appointed for the purpose is ceded by the Bhootan Government to the British Government for ever.

Article 3

The Bhootan Government hereby agree to surrender all British subjects as well as subject of the chief of Sikkim and Cooch Behar who are now detained in Bhootan against their will, and to place no impediment in the way of the return of all or any of such persons into British territory.

Article 4

In consideration of the session by the Bhootan Government of the territories specified in Article 2 of this Treaty, and of the said Government having expressed its regret for the past misconduct, and having hereby engaged for the future to restrain all evil-disposed persons from committing crimes within British territory or the territories of the Rajahs of Sikkim and Cooch Behar and to give prompt and full redress for all such crimes which may be committed in defiance of their commands, the British Government agree to make an annual allowance to the Government of Bhootan of a sum not exceeding fifty thousand rupees (Rupees 50,000) to be paid to officers not below the rank of Jung pen, who shall be deputed by the Government of Bhootan to receive the same. And it is further hereby agreed that the payments shall be made as specified below:-

On the fulfillment by the Bhootan Government of the Conditions of this treaty twenty-five thousand rupees (Rupees 25,000).

On the 10th January following the 1st payment, thirty-five thousand rupees (Rupees 35,000).

On the 10th January following forty-five thousand rupees (Rupees 45,000).

On every succeeding 10th January fifty thousand rupees (Rupees 50,000).

Article 5

The British Government will hold itself at Liberty at any time to suspend the payment of this compensation money either in whole or in part in event of misconduct on the part of the Bhootan Government or its failure to check the aggression to its subjects or to comply with the provisions of this treaty.

Article 6

The British Government hereby agree, on being duly made in writing by the Bhootan Government, to surrender, under the provisions of Act VII of 1854, of which a copy shall be furnished to the Bhootan Government, all Bhootaneses subjects accused of any of the following crimes who may take refuge in British dominions. The crimes are murder, attempting to murder. Rape, kidnapping, great personal violence, maiming, dacoity, robbery or burglary, knowlingly receiving property obtained by dacoity, robbery or burglary, cattle stealing, breaking and entrain a dwelling house and stealing therein, arson, setting fire to village, house , or town, forgery or uttering forced documents, counterfeiting current coin, knowingly uttering base or counterfeit coin, perjury, subornation of perjury, embezzlement by public officers or other persons, and being an accessory to any of the above offences.

Article 7

The Bhootan Government hereby agree, on requisition being duly made by or by the authority of, the Lieutenant- Government of Bengal, to surrender any British subjects accused of any of the crimes specified in the above Article who may take refuse in the territory under the jurisdiction of the Bhootan Government, and also any Bhootanese subjects who, after committing any of committing any of the above crimes in British territory, shall flee into Bhootan, on such evidence of their guilt being produced as shall satisfy the local court of the district in which the offence may have been committed.

Article 8

The Bhootan Government hereby agrees to refer to the arbitration of the British Government all disputes with, or causes of complaint against the Rajahs of Sikkim and Cooch Behar, and to abide by decision of the British Government ; and the British Government hereby engage to enquire into and settle all such disputes and complaints in such manner as justice may require, and to the observance of the decision by the Rajahs of Sikkim and Cooch Behar.

Article 9

There shall be free trade and commerce between the two Governments. No duties shall be levied on Bhootanese goods imported into British territories nor shall the Bhootan Government

levy any duties on British goods imported into, or transported through, the Bhootan territories. Bhootanese subjects residing in British territories shall have equal justice with the sunjects of the Bhootan Government.

Article 10

The present treaty of ten Articles having been concluded at Sinchule on the 11th day of November 1865, corresponding with the Bhootea year Shim Lung 24th day the 9th month and signed and sealed by Lieutenant-Colonal Herbert Bruce, C.B., and Samdojey Deb Jimpey and Themseyrensey Donai, the ratifications of the same by His Excellency the Viceroy and Governor- General or His Excellency the Viceroy and Governor-General in council and by their Highnesses the Dhurm and Deb Rajahs shall be mutually delivered within thirty days from this date.

H. BRUCE, Lieut.-Col.,
Chief Civil and Political Officer,
In Dabe Nagri,
In Bhootea Language

This Treaty was ratified on the 29th November 1865 in Calcutta by me.
25th January 1866 JHON LAWRENCE
Governor- General

সংযোজনী- I.IV

Agreement of Merger of the Cooch Behar State 1949

A Collateral Letter of V.P.Menon, Advisor to the Government of India, Ministry of States, to Jagaddipendra Narayan Bhup Bahadur, Maharaja of Cooch Behar, about the merger of Cooch Behar State.

D.O. No. F.15 (19)-F/49

MINISTRY OF STATES
New Delhi
The 30th August , 1949

MY DEAR MAHARAJ SAHIB

In connection with the Agreement concluded between the Governor General of India and Your Highness for the integration of Cooch Behar State Your Highness raised certain points for clarification; the Government of India has considered them and accepts the following arrangements

(1) It is the intension of the Government of India to administer for the present territories of Cooch Behar State as a centrally administered area under a Chief Commissioner.

(2) All contracts and agreement entered into by Your Highness before date on which the administration is made over to the Government of India will be honoured except in so far as any of these contracts or agreements is either repugnant to the provision of any law made applicable to the State or inconsistent with the general policy of the Government.

(3). The Allowances at present drawn by her Highness the Rajmata will be continued for her lifetime and will be paid out of the revenues of the State. Your Highness' brother and other members of the Ruling Family will also be paid allowances from the revenues of the State as per list attached.

(4) The responsibility for the Cooch Behar State Forces will be taken over by the Government of India from 12th September 1949. If these forces are disbanded or any of the men discharged they will receive the pension or gratuity or compensation to which they may be entitled under the rules of the State.

(5) Adequate grants will be provided to for the protection of Your Highness' person and palace.

(6) No land or building being Your Highness' private property shall be requisitioned or acquired without payment of full compensation.

(7) Electricity from the State Power House for the main residence of Your Highness and family within the State will be provided at the fixed rate in existence immediately before the transfer of administration to Government of India. Water supply will be provided free of charge to the main palace of Your Highness and family within the State.

(8) The management of the temples and Debuttar properties in the State may be entrusted to a Trust which shall consist of Your Highness as President , 3 nominees of Your Highness and 2 nominees of Government . This Trust will be in charge of all temples both inside and outside the State. In the event of the abolition of the zamindaris which are Debuttar property, Government will ensure that the Trust has adequate resources to fulfill its object.

(9) Your Highness may create a Trust for the marriage of the son and daughter of Isharani of Cooch Behar with a corpus of Rs. 1 lakh. The trustees will be besides Your Highness, Their High ness of Jaipur and Dewas Junior.

(10) The Civil List of Reserve Fund of Rs. 10,60,900 shall be Your Highness' private property and shall be held by Your Highness in Trust for meeting expenditure in connection with Your Highness' marriage or specials repairs to the palace and any unforeseen expenditure.

(11) The administration of the Maharajkumar Fund with a corpus of Rs. 486900 shall be formally vested in a Trust which Your Highness and Their Highnesses of Jaipur and Dewas Junior shall be trustees.

(12) Your Highness will be entitled to hold customary Durbar and troops present at the capital will take part in the Dasserah and other celebrations.

(13) Your Highness will retain your present rank in the Indian Army.

(14) Government will endeavour to associate the name Narayan with the Cooch Behar State Forces even after their absorption in the Indian Army.

The Ministry of States has issued a Memorandum on the privileges and dignities which has been finalized in consultation with the Rajpramukhs of Unions and other States. Your Highness will see that the Memorandum deals adequately with the various suggestions made by the Rulers from time to time regarding their rights and privileges.

With kind regards

Yours Sincerely,
V.P. MENON

Lieutenant-Colonel His Highness
Maraja Sir Jagaddipendra Narayn Bhup Bahadur
Maharaja of Cooch Behar,
Cooch Behar, (Bengal)

A list of allowances to members of the Ruler's family to be paid out of the revenues of the State, *vide* para 1(3) of the Collateral Letter has been attached with the Agreements.

AGREEMENT OF MERGER OF COOCH BEHAR STATE TO INDIAN UNION

AGREEMNT MADE THIS Twenty eighth day of August 1949 between the Governor General of India and His Highness the Maharaja of Cooch Behar.

Whereas in the best interests of the State of Cooch Behar as well as of the Dominion of India it is desirable to provide for the administration of the said State by or under the authority of the Dominion Government.

IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS: --

ARTICLE I

His Highness the Maharaja of Cooch Behar hereby cedes to the Dominion Government of full and exclusive authority jurisdiction and powers for and in relation to the governance of the

State and agrees to transfer the administration of the State to the Dominion Government on 12th day of September 1949 (hereinafter referred to as 'the said day').

As from the said day the Dominion Government will be competent to exercise the said powers, authority and jurisdiction in such manner and through such agency as ot may think fit.

ARTICLE II

His Highness the Maharaj shall continue to enjoy the same personal rights , privileges , dignities and titles which he would have enjoyed had this agreements not been made.

ARTICLE III

His Highness the Maharaja shall with effect from the said day be entitled to receive for his life-time from the revenues of the State annually for his Privy Purse the sum of Rupees eight lacs fifty thousand free of all taxes. After him the Privy Purse will be fixed at Rupees seven lacs only. This amount is intended to cover all the expenses of the Ruler and his family, including expanses on account of his personal staff, maintenance of his residences, marriages and other ceremonies etc., and will neither be increased nor reduced for any reason whatsoever.

The Government of India undertakes that the said amount of the sum of Rupees eight lacs and fifty thousand shall be paid to His Highness Maharaja in four equal installments in advance at the beginning of each quarter from the State treasury or at such treasury as may be specified by the Government of India.

ARTICLE IV

His Highness the Maharaja shall be entitled to the full ownership, use and enjoyment of all private properties (as distinct from State properties) belonging to him on the date of this agreement.

His Highness the Maharaja will furnish to the Dominion Government before the 15th September, 1949 an inventory of all the immovable property, securities and cash balances held by him as such private property.

If any dispute arises as to whether any item of property is the private property of His Highness the Maharaja or State property, it shall be reoffered to a judicial officer, qualified to be appointed as a High Court Judge, and the decision of that officer shall be final and binding on both parties.

ARTICLE V

All the members of His Highness' family shall be entitled to all the personal privileges, dignities and titles enjoyed by them whether within or outside the territories of the State immediately before the 15th day of August, 1947.

ARTICLE VI

The Dominion Government guarantees the succession, according to law and custom, to the gaddi of the State and to His Highness the Maharaja's personal rights, privileges, dignities and titles.

ARTICLE VII

No enquiry shall be made by or under authority of the Government of India, and no proceedings shall lie in any Court in Cooch Behar, against His Highness the Maharaja whether in a personal capacity or otherwise, in respect of anything done or omitted to be done by him or under his authority during the period of his administration of that State.

ARTICLE VIII

(1) The Government of India hereby guarantees either the continuance in service of permanent members of the Public Services of Cooch Behar on condition, which will not be less advantageous that those on which they were serving before the date on which the administration of Cooch Behar is made over to the Government of India or the payment of reasonable compensation.

(2) The Government of India further guarantees the continuance of pensions and leave salaries sanctioned by His Highness the Maharaja to servants of the State who have retired or proceeded on leave preparatory to retirement, before the date on which the administration of Cooch Behar is made over to the Government of India.

ARTICLE IX

Except with the previous sanction of the Government of India no proceedings, civil and criminal shall be instituted against any person in respect act done or purporting to be done in the execution of his duties as a servant of the State before the day on which the administration is made over to the Government of India.

In confirmation whereof Mr. Vapal Pangunni Menon, Advisor to the Government of India in the Ministry of States has appended his signature on behalf and with the authority of the Governor General of India and Lieutenant Colonel His Highness Maharaja Jagaddipendra Narayan Bhup Bahadur, Maharaja of Cooch Behar has appended his signature on behalf of himself, his heirs and successors.

JAGADDIPENDRA NARAYAN
Maharaja of Cooch Behar
V.P.MENON
Advisor to the Government of India

সংযোজনী- I.V

NEHRU – NOON AGREEMENT, 1958

In accordance with the directives issued by the Prime Ministers, the sectaries discussed this morning the following disputes:

West Bengal – East Pakistan

1. Bagger Awards in disputes I and II
2. Hilli.
3. Berubari Union No. 12
4. Demarcation in the Indo- Pakistan frontier so as to include the two chitland of old Cooch Behar state adjacent of Red Cliffe line in West Bengal.
5. 24 th Parganas – Khulna
   } Boundary disputes
   24 th Parganas – Jassore

Assam – East Pakistan

6. Pakistan Claims to Bholaganj
7. Piyain and Sumra – Boundary disputes

Tripura – East Pakistan

8. Tripura land under Pakistan railways and Tripura land to the West of the railways at Bhalgalpur
9. Fine river -- Boundary disputes

West Bengal and East Pakistan

10. Exchange of Enclaves of the old Cooch Behar State in Pakistan and Pakistan Enclaves in India, claim to territorial compensation for extra area going to Pakistan.

As a result of the discussions, the following agreement were arrived at;

(1) Bagge awards on disputes I and II.
It was agreed that the exchange of territories as a result of demarcation should take by 15 January, 1959
(2) Hilli

Pakistan Government agrees to drop this dispute. The position will remain as it is at present in accordance with the award made by Sir Cyril Radcliffe and accordance with the line drawn by him on the map.

(3) Barubari Union No. 12

This will be divide as to give half the area to Pakistan, the other half adjacent to India being retained by India. The division of Barubari Union No. 12 will be horizontal starting from the North East corner of Dobiganj thana. The division should be made in such a manner that the Cooch Behar enclaves between Pachagar thana of East Pakistan and Barubari Union No. 12 of Jalpaiguri thana of West Bengal will remain connect as at present in Indian territory and will remain in Indian territory and will remain in India. The Cooch Behar enclaves lower down between Boda thana of East Pakistan and Barubari No. 12 will be exchanged along with the general exchange of enclaves and will go to Pakistan.

(4) Pakistan Government agree that the two chitlands of the old Cooch Behar State adjacent to Redcliffe Line should be included in West Bengal and the Redcliffe line should be included in West Bengal and Redcliffe lines should be adjacent accordingly.

(5) 24 – Parganas- Khulna

} Boundary disputes

24 – Parganas – Jessore

It is agreed that the mean of the two respective claims of India and Pakistan should be adopted, taking the river as a guide, as far as possible, in the case of the latter dispute (Ichhamoti river)

(6) Pakistan Government agrees to dope to claim on Bojhganj.

(7) Piyain and Surma river regions to be demarcated in accordance with the relevant notifications, cadastral survey maps and if necessary, record of rights. Whatever the result of this demarcation might be, the nationals both of the Governments to have the facility of navigation on both of these river.

(8) Government of India agrees to give a perpetual right to Pakistan the land belonging to Tripura State to the West Of the Railway line at Bhagalpur.

(9) The question of Feni River to be dealt with separately after farther study.

(10) Exchange of Old Cooch Behar State enclaves in Pakistan and Pakistan enclaves in India without claim to compensation for extra area going to Pakistan, is agreed to.

The secretaries also agreed that the question of giving exchange of territory as a result of the demarcation already carried out, should be given early consideration.

M.A.S. Baig
Foreign Secretary
Ministry of Foreign Affairs
And Commonwealth Relations

M.J Desai
Commonwealth Secretary
Ministry of External Affairs
Government of India

Government of Pakistan

New Delhi, 10th September, 1958

সংযোজনী- I.VI

THE CONSTITUTION (NINTH AMENDMENT) ACT, 1960

Statement of Objects and Reasons appended to the Constitution (Ninth Amendment) Bill, 1960 (Bill No. 90 of 1960) which was enacted as The Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960

Statement of Objectives and Reasons

Agreements between the Governments of India and Pakistan dated 10th September, 1958, 23rd October, 1959, and 11th January, 1960, settled certain boundary disputes between the Governments of India and Pakistan relating to the borders of the States of Assam, Punjab and West Bengal, and the Union territory of Tripura.

According to these agreements, certain territories are to be transferred to Pakistan after demarcation. In the light of the Advisory Opinion of the Supreme Court in Special Reference No. 1 of 1959, it is proposed to amend the First Schedule to the Constitution under a law relatable to article 368 thereof to give effect to the transfer of theses territories.

New Delhi Jawaharlal Nehru.

The 12th December, 1960.

The Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960

[28th December, 1960.]

An Act further to amend the Constitution of India to give effect to the transfer of certain territories to Pakistan in pursuance of the agreements entered into between the Governments of India and Pakistan.

BE it enacted by Parliament in the Eleventh Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.-This Act may be called the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960.

2. Definitions.- In this Act,-

(a) "appointed day" means such date_ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint as the date for the transfer of territories to Pakistan in pursuance of the Indo-Pakistan agreements, after causing the territories to be so transferred and referred to

in the First Schedule demarcated for the purpose, and different dates1 may be appointed for the transfer of such territories from different States and from the Union territory of Tripura;

(b) "Indo-Pakistan agreements" mean the Agreements dated the 10th day of September, 1958, the 23rd day of October, 1959 and the 11th day of January, 1960, entered into between the Governments of India and Pakistan, the relevant extracts of which are set out in the Second Schedule;

(c) "transferred territory" means so much of the territories comprised in the Indo-Pakistan agreements and referred to in the First Schedule as are demarcated for the purpose of being transferred to Pakistan in pursuance of the said agreements.

3. Amendment of the First Schedule to the Constitution. - As from the appointed day, in the First Schedule to the Constitution,

(a) in the paragraph relating to the territories of the State of Assam the words, brackets and figures "and the territories referred to in Part I of the First Schedule to the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960" shall be added at the end;

(b) in the paragraph relating to the territories of the State of Punjab, the words, brackets and figures "but excluding the territories referred to in Part II of the First Schedule to the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960" shall be added at the end;

(c) in the paragraph relating to the territories of the State of West Bengal, the words, brackets and figures "but excluding the territories referred to in Part III of the First Schedule to the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960" shall be added at the end;

(d) in the paragraph relating to the extent of the Union territory of Tripura, the words, brackets and figures "but excluding the territories referred to in Part IV of the First Schedule to the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960" shall be added at the end.

[See Sections 2(a), 2(c) and 3]

PART I

The transferred territory in relation to item (7) of paragraph 2 of the Agreement dated the 10th day of September, 1958, and item (i) of paragraph 6 of the Agreement dated the 23rd day of October, 1959.

PART II

The transferred territory in relation to item (i) and item (iv) of paragraph 1 of the Agreement dated the 11th day of January, 1960.

PART III

The transferred territory in relation to item (3), item (5) and item (10) of paragraph 2 of the Agreement dated the 10th day of September, 1958, and paragraph 4 of the Agreement dated the 23rd day of October, 1959.

PART IV

The transferred territory in relation to item (8) of paragraph 2 of the Agreement dated the 10th day of September, 1958.

THE SECOND SCHEDULE

[See section 2(b)]

1. EXTRACTS FROM THE NOTE CONTAINING THE AGREEMENT DATED THE 10TH DAY OF SEPTEMBER, 1958

2. As a result of the discussions, the following agreements were arrived at:

(3) Berubari Union No. 12

This will be so divided as to give half the area to Pakistan the other half adjacent to India being retained by India. The division of Berubari Union No. 12 will be horizontal, starting from the north-east corner of Debiganj thana.

The division should be made in such a manner that the Cooch Behar enclaves between Pachagar thana of East Pakistan and Berubari Union No. 12 of Jalpaiguri thana of West Bengal will remain connected as at present with Indian territory and will remain with India. The Cooch Behar enclaves lower down between Boda thana of East Pakistan and Berubari Union No. 12 will be exchanged alongwith the general exchange of enclaves and will go to Pakistan.

(5) 24 Parganas---Khulna 24 Parganas---Jessore Boundary disputes.

It is agreed that the mean of the two respective claims of India and Pakistan should be adopted, taking the river as a guide, as far as possible, in the case of the latter dispute (Ichhamati river).

(7) Piyain and Surma river regions to be demarcated in accordance with the relevant notifications, cadastral survey maps and, if necessary, record of rights. Whatever the result of this demarcation might be, the nationals of both the Governments to have the facility of navigation on both these rivers.

(8) Government of India agree to give in perpetual right to Pakistan the land belonging to Tripura State to the west of the railway line as well as the land appurtenant to the railway line at Bhagalpur.

(10) Exchange of old Cooch Behar enclaves in Pakistan and Pakistan enclaves in India without claim to compensation for extra area going to Pakistan, is agreed to.

(Sd.) M. S. A. BAIG, Foreign Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Commonwealth Relations, Government of Pakistan.

(Sd.) M. J. DESAI, Commonwealth Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India.

NEW DELHI, THE SEPTEMBER 10, 1958.

2. EXTRACTS FROM AGREEMENT ENTITLED "AGREED DECISIONS AND PROCEDURES TO END DISPUTES AND INCIDENTS ALONG THE INDO-EAST PAKISTAN BORDER AREAS", DATED THE 23RD DAY OF OCTOBER, 1959.

4. West Bengal-East Pakistan Boundary Over 1,200 miles of this boundary have already been demarcated. As regards the boundary between West Bengal and East Pakistan in the areas of Mahananda, Burung and Karatoa rivers, It was agreed that demarcation will be made in accordance with the latest cadastral survey maps supported by relevant notifications and record-of-rights.

6. Assam-East Pakistan Boundary.

(i) The dispute concerning Bagge Award III has been settled by adopting the following rational boundary in the Patharia Forest Reserve region:

From a point marked X (H522558) along the Radcliffe Line BA on the old Patharia Reserve Boundary as shown in the topographical map sheet No. 83D/5, the boundary line shall run in close proximity and parallel to the cart road to its south to a point A (H531554); thence in a southerly direction up the spur and along the ridge to a hill top marked B (H523529); thence in a south-easterly direction along the ridge down the spur across a stream to a hill top marked C (H532523); thence in a southerly direction to a point D (H530517); thence in a south-westerly direction to a flat top E (H523507); thence in a southerly direction to a point F (H524500); thence in a south-easterly direction in a straight line to the mid-stream point of the Gandhai Nala marked G (H540494); thence in south-westerly direction up the mid-stream of Gandhai Nala to point H (H533482); thence in a south-westerly direction up a spur and along the ridge to a point I (H517460); thence in a southerly direction to a point on the ridge marked J (H518455); thence in a south-westerly direction along the ridge to a point height 364 then continues along the same direction along the same ridge to a point marked K (H500428); thence in a south and south-westerly direction along the same ridge to a point marked L (H496420); thence in a south- easterly direction along the same ridge to a point marked M (H499417); thence in a south-westerly direction along the ridge to a point on the bridle path with a height 587; then up the spur to the hill top marked N (H487393); then in a south-easterly and southerly direction along the ridge to the hill top with height 692; thence in a southerly direction down

the spur to a point on Buracherra marked O (H484344); thence in a south-westerly direction up the spur along the ridge to the trigonometrical survey station with height 690; thence in a southerly direction along the ridge to a point height 490 (H473292); thence in a straight line due south to a point on the eastern boundary of the Patharia Reserve Forest marked Y (H473263); along the Radcliffe Line BA

The line described above has been plotted on two copies of topographical map sheets Nos. 83D/5, 83D/6 and 83D/2.

The technical experts responsible for the ground demarcation will have the authority to make minor adjustments in order to make the boundary alignment agree with the physical features as described.

The losses and gains to either country as a result of these adjustments with respect to the line marked on the map will be balanced by the technical experts.

(Sd.) J. G. KHARAS, Acting Foreign Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Commonwealth Relations, Karachi.

(Sd.) M. J. DESAI, Commonwealth Secretary, Ministry of External Affairs, New Delhi.

NEW DELHI; OCTOBER 23, 1959.

3. EXTRACTS FROM THE AGREEMENT ENTITLED "AGREED DECISIONS AND PROCEDURES TO END DISPUTES AND INCIDENTS ALONG THE INDO-WEST PAKISTAN BORDER AREAS", DATED THE 11TH DAY OF JANUARY, 1960.

1. West Pakistan-Punjab border. Of the total of 325 miles of the border in this sector, demarcation has been completed along about 252 miles. About 73 miles of the border has not yet been demarcated due to differences between the Governments of India and Pakistan regarding interpretation of the decision and Award of the Punjab Boundary Commission presented by Sir Cyril Radcliffe as Chairman of the Commission. These differences have been settled along the lines given below in a spirit of accommodation:

(i) The Sarja Marja, Rakh Hardit Singh and Pathanke (Amritsar- Lahore border).-The Governments of India and Pakistan agree that the boundary between West-Pakistan and India in the this region should follow the boundary between the Tehsils of Lahore and Kasur as laid down under Punjab Government Notification No. 2183-E, dated 2nd June, 1939. These three villages will in consequence, fall within the territorial jurisdiction of the Government of Pakistan.

(iv) Suleimanke (Ferozepur-Montgomery border). The Governments of India and Pakistan agree to adjust the district boundaries in this region as specified in the attached Schedule and as shown in the map appended thereto as Annexure I.

(Sd.) M. J. DESAI, Commonwealth Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India.

(Sd.) J. G. KHARAS, Joint Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Commonwealth Relations, Government of Pakistan.

NEW DELHI; JANUARY 11, 1960.

সংযোজনী- I.VII

LAND BOUNDARY AGREEMENT (a.k.a. Indira – Mujib pact) 16th May 1974

Between the government of the peoples' Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India concerning the Demarcation of land boundary between Bangladesh and Indian in the related matters.

The Government of the people's Republic of the Bangladesh and the Government of the Republic of India, Bearing in mind the friendly relations exiting between two countries, desiring to define more accurately at certain point and to complete the demarcation of the land boundary between Bangladesh and India-

have agreed as follows:

Article 1

The land boundary between Bangladesh and India in the area mentioned below shall be demarcated in the following manner:

1. Mizoram – Bangladesh sector. - Demarcation should be completed on the basis of the latest preparation notification and record.
2. Tripura – Sylhet sector.- Demarcation which is already progress in this area on the agreed basis should be completed as early as possible.
3. Bhalgalpur Railway line. - The boundary should be demarcated at a distance of 73 feet parallel to the toe of railway embarkment towards the east.
4. Sibpur – Gaurangala sector.- The boundary should be demarcated in continuation of the process started in 1951-52 on the basis of the district settlement maps of 1915-1918.
5. Muhuri river (Belonia) sector.- The boundary should be demarcated along the mid-stream of the course of Muhuri river at the time of demarcation. The boundary will be fixed boundary. Two government should be raise embankments on their respective sides with a view to stabilising the river in the present course.
6. Remaining portion of the Tripura – Noakhali/ Comilla sector.- The demarcation in this sector should be completed on the basis of Chakla- Roshanabad Estate Maps of

1982-1894 and the district settlement maps of 1915-1918 for area not covered by the Chakla- Roshanabad Maps.

7. Fenny river.- the boundary should be demarcated along the mid-stream of the course at the time of demarcation of that branch of the Fenny river indicated as the Fenny river indicated as the Fenny river on the survey of India maps sheet No. 79 M/15 1st edition 1933, till its join the stream show as Asalong C on the said map. From the point on downstream, the boundary should be demarcated along the mid – stream of the course of the Fenny river at the time of demarcation of the boundary. The boundary in this sector will be a fixed boundary.
8. Rest of Tripura – Chittagong Hill tracts sector. - The boundary will follow the mid stream of that branch of the Fenny river, referred to in para 7 about, up To Grid reference 009779 (map sheet as in para 7 about) from where the boundary will follow the mid-stream of the eastern most tributary. From the source of this tributary, the boundary will shortest distance to the mid-stream of the stream marked Bayan Asalong, on the map referred to above, and trance will run generally northward along the mid-stream of this river till it reaches its source on the ridge (indicated by grid reference 046810 on the map referred to above). Form these it will run along the crest of this ridge up Boghoban Trig Station. From Boghoban Trig Station up to the trijunction of the Bangladesh- Assam- Tripura boundary (Khan Talang Trig Station), the boundary will run along the watershed of the river system of the two countries. In case of any difference between the map and the ground, the ground shall prevail. The boundary will fixed boundary in this sector.
9. Beanibazar – Karimganj sector.- The demarcated portion of the boundary west of Umapati village should be demarcated in the accordance with the agreed basis of demarcation, living Umapati village in India.
10. Hakar Khal.- The boundary should be demarcated in accordance with the Nehru- Noon Agreement of September 1958 treating Hakar Khal as a geographical feature distance from Ichhamati River. The boundary will be fixed boundary.
11. Baikari Khal.- In the Baikari khal, the boundary should be demarcated on the agreed basis and principal, namely the ground prevail, i.e. as per the agreement reached between the land Director record and Surveys of West Bengal and Erstwhile East Pakistan in 1949. The boundary will be the fixed boundary.
12. Enclaves. - The Indian enclaves in Bangladesh and Bangladesh enclaves in India should be exchanged expeditiously, excepting the enclaves mention in this paragraph 14 without claim to compensation for the additional area going to Bangladesh.
13. Hilli.- The area will be demarcated in accordance with Radcliffe Award and the line drawn by him on the map.
14. Berubari.- India will retain the southern helf of south Berubari Union No 12 and the adjacent enclaves, measuring an area of 2.64 square miles approximately and in exchange Bangladesh will retain the Dahagram and Angerpota enclaves. In India will lease in perpetuity to Bangladesh an area of 174 meters x 85 meters near Tin Bigha to connect Dahagram with panbari Mouza (P.S. Patgram) of Bangladesh.

15. Lathitilla – Dumabari.- From point Y (the last demarcated boundary pillar position), the boundary shall round southwards along the Patheria Hills RF boundary up to the point where it meets the Western boundary Dumabai Mouza. Thence, along the same Mouza boundary up to the tri Mouzas Dumabari, Lathitilla and Bara Putnigaon through the junction of the two Mouzas Dumabari and Lathitilla. From this point shall run along the shortest distance to meet the mid-stream of putni Chara. Thence it shall run generally southwards along the mid-stream of the course of Putni Chara at the time of demarcation, till its meets the boundary Sylhet (Bangladesh) and Tripura (India).

Article 2

The Government of Bangladesh and India agreed that territories in adverse possession in area already demarcated in respect in which boundary strip map are already prepared, shall be exchange within six month of the signing of the boundary strip map by the plenipotentiaries. They may sign the relevant map as early as possible and in any case not later than the 31st December, 1974. Early measures may be taken to print maps in respect of other areas where demarcation has already taken place. These should be printed by 31st may 1975 and signed by the plenipotentiaries thereafter in order that the exchange of adversely held possessions in these areas may take place by 31st December 1975. In sectors still to be demarcation transfer of territorial jurisdiction may take place within six months of the signature by plenipotentiaries on the concerned boundary strip maps.

Article 3

The Government of Bangladesh and India agree that when areas are transferred, the people in these areas shall be given the right of staying on where they are, as nationals of the state to which the areas transferred. Pending demarcation of the boundary and exchange of territory by mutual agreement, there should be no disturbance of the status quo and peaceful condition shall be maintained in the order regions. Necessary instructions in the local authorities on the border by the two countries.

Article 4

The Government of Bangladesh and India agree that any dispute concerning the interpretation or implementation of this agreement shall be settled peacefully thought mutual consultations.

Article 5

This agreement shall be subject to ratification by the Government of Bangladesh and India and Instruments of Ratification shall be exchanged as early as possible. The Agreement shall take effect from the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

Signed in New Delhi on May 16, 9174, in two originals each of which equally authentic.

For the Government of
the people's Republic of Bangladesh
Sheikh Mujibar Rahman
Prime Minister of Bangladesh

For the Government of the Republic of India
Indira Gundhi
Prime Minister of India

সংযোজনী- I.VIII

Terms of the Lease in Perpetuity of Tin Bigha Area

New Delhi 7 October 1982

Excellency:

I have the honour to refer to item 14 of Article I of the Agreement between the Government of Republic of India and the Government of the people's Republic of Bangladesh concerning the Demarcation of the Land Boundary between India and Bangladesh and related matters, signed in New Delhi on 16th of May 1974, and to state that in connection with the lease in perpetuity by India to Bangladesh of an area of approximately 178 metres x 85 metres near 'Tin Bigha' to connect Dahagram with Panbari Mouza (P.S. Patgram) of Bangladesh, the following understanding has been reached between our two Governments :

1. The lease in perpetuity of the aforementioned area shall be for the purpose of connecting Dahagram and Angarpota with Panbri Mouza (P.S. Patgram) of Bangladesh to enable the Bangladesh Government to exercise her sovereignty over Dahagram and Angarpota.
2. Sovereignty over the leased area shall continue to vest in India. The rent for the leased area shall be Bangladesh Tk. 1- (Bangladesh Taka One) only per annum. Bangladesh shall not, however, be required to pay the said rent and the Government of India hereby waives its right to charge such rent in respect of the Lease area.
3. For the purpose started in para I above Bangladesh shall have undisturbed possession and use of the area leased to her in perpetuity.
4. Bangladesh citizens including police, paramilitary and military personnel along with their arms, ammunition, equipment and supplies shall have the right of free and unfettered movement in the leased areas and shall not be required to carry passports and travel documents of any kind. Movement of Bangladesh goods through the leased area shall also be free. There shall be no requirement of payment of customs duty, tax or levy of any kind whatsoever or any transit charges.
5. Indian citizens including police, permanently and military personnel along with their arms, ammunition, equipment and supplies shall continue to have the right of free and unfetters movement in the leased area in either direction. Movement of Indian goods across it shall continue to be used. India may also build a road above and /or below the surface of the leased area in an elevated or subway form for her exclusive use in manner which will not prejudice free and unfettered movement of Bangladesh citizens and goods as defined in paras 1 and 2 above.

6. The two governments shall co-operate in placing permanent markers along the perimeters of leased area and put up fences where necessary.
7. Both India and Bangladesh shall have the right to lay cables, electric lines, water and sewerage pipes etc. over or under the leased area without obstructing free movement of citizens or goods of either country as defined in paras 4 and 5 above.
8. The modalities for implementing the terms of the lease will be entrusted to the respective Deputy Commissioner of Rangpur (Bangladesh) and Cooch Behar (India) in case of differences; they will refer the matter to their respective Governments for regulation.
9. In the events of any Bangladesh / Indian national being involved in an incident in the leased area, constituting an offence in law, he shall be dealt with by the respective law enforcing agency of his own country in accordance with its national laws. In the event of an incident in the leased area involving nationals of both countries, the law enforcing agency on the scene of the incident will take necessary steps to restore law and order. At the same time, immediate steps will be taken to get in touch with the law enforcing agency of the other country. In such cases any Indian national apprehended by a Bangladesh law enforcing agency shall be handed over forthwith to the Bangladeshi side. India will retain residual jurisdiction in the leased area."

I shall be grateful if you kindly confirm that the above sets out correctly the understanding reached between our two Governments. I have also the honour to propose that this latter and your reply confirming the understanding shall constitute an an agreement between our two Governments in respect of the leased area. Which shall be an integral part of the Agreement concerning the Demarcation of the Land Boundary between India and Bangladesh and Related Matters signed on the 16th of May 1974.
Accept, Excellency, the assurances of my highest esteem.

H.E. Mr. A.R. Shams-Ud-Doha
Minister for Foreign Affairs
Government of the People's Republic
Bangladesh

(P.V. Narasimha Rao)
Minister of External Affairs
Government of Republic of India

সংযোজনী- I.XI

Tin Bigha Lease modalities (26 March 1992)

Understanding regarding the modalities for leasing out the Tin Bigha area, 26 March 1992.

1. Indian flags will fly at the four corners of the Tin Bigha corridor as a manifestation of India's sovereignty over the area;

2. An East-West road to connect Dahagram (Bangladesh) with Patgram (Bangladesh) will be constructed by India before 26th June, 1992 roughly at right angles to the existing North-South road. The new East-West road is to conform to the specifications and width of the existing North-South road;

3. Landscaping (horticulture) protected by fencing, on both sides of the proposed road, is to be carried out and maintained by India, so as to prevent the possibility of encroachment and infiltration, keeping adequate provision for drains, laying of cables, water-supply etc., in future;

4. Two check points each are to be set up at both ends of the East-West road where it touches the Bangladesh Boundary. They will be separately manned by Indian and Bangladesh authorities with a view to regulating the movement of traffic;

5. Traffic in the corridor will be regulated by the Indian authorities, and the opening and closing of the check points on the East-West road will be coordinated accordingly in such a manner that there is no intermixing of Indian and Bangladeshi streams of traffic;

6. At the intersection, i. e., the specific point where the East-West road will cross the North-South road, there will be an Indian traffic Police control to direct the traffic movement;

7. Indian traffic movement on the North-South road will continue as heretofore. Bangladesh traffic will use the East-West road in the corridor at alternate hours during the day-light period. However, exceptions will be made at the local level to the above arrangements in case of emergency, such as natural calamities, movement of civil administrators and medical emergencies;

8. Suitable lighting arrangements will be made for the entire corridor in order to facilitate monitoring by security agencies on both sides;

9. Differences, if any, regarding modalities for implementing the terms of lease will be resolved in the first instance through consultations between the Deputy Commissioner of Cooch Behar (India) and the Deputy Commissioner of Lalmonirhat (Bangladesh). Remaining differences, if any, will be referred to their respective Governments for resolution;

10. India and Bangladesh will provide mutual judicial assistance to each other to the extent necessary, in all matters relating to prosecution, trials, etc. concerning incidents constituting offences in the leased area;

11. Agreed arrangements will come into effect from 26th June, 1992.

Ratified by an exchange of letters on 26 March 1992, by J.N. Dixit, Foreign Secretary, India and A.H. Mahmood Ali, Additional Foreign Secretary, Bangladesh.

সংযোজনী- I.XI

Press Release

Text of Exchange of Letters on Modalities for Implementation pf India-Bangladesh Land Boundary Agreement 1974 and Protocol of 2011 to the Land Boundary Agreement

Foreign Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI, -110011
Phone- 2301 2318, Fax: 2301 6781
E-mail: dirfs@mea.gov.in

सत्यमेव जयते

No. 9596/FS/2015 **June 6, 2015**

Excellency,

In pursuance of the exchange of Instruments of Ratifications between our two government on June 6, 2015 to bring into effect the Agreement between the Government of Republic of India and the People's Republic of Bangladesh concerning the Demarcation of the Land Boundary between India and Bangladesh and Related Matters. 1974 and the 2011 Protocol to the said Agreement. I have the honour to propose the following subsequent steps to implement the said Agreement and Protocol.

I. Enclaves

(i) India and Bangladesh agree that the Indian enclaves in Bangladesh and Bangladeshi enclaves in India exchanged pursuant to the 1974 Agreement and 2011 Protocol shall stand transferred to as the 'Appointed Day'

(ii) Prior to the Appointed Day representatives of the two Governments shall conduct a joint visit to the enclaves for the following purposes.

(a) Informing the residents of the enclaves of the provisions contained in the 1974 Agreement and the 2011 Protocol including their rights relating to nationality and citizenship.

(b) Identifying the residents who wish to continue to retain the nationality they hold prior to the actual transfer of territory. This right is available only to those residents who are included in the joint headcount of the population of the enclave finalised and exchanged by the two government at July 2011 and to the children born to such residents from July 2011 till date.

(c) Collection at date including photographs required for issue of entry passes or any other document to facilitate the travel and entry of an enclave resident choosing to retain this original nationality.

(iii) The entry, stay and secure functioning of the representatives in the joint visit and setting up to camps shall be facilitated by both Governments.

(iv) Both Government shall facilitate orderly safe and secure passage to residents of enclaves along with their personal belonging and moveable property to the mainland of India or Bangladesh, as the case may be, including through provision of travel documents.

(v) The travel of the residents who exercise the option of moving from an enclave to the mainland of India or Bangladesh as the case may be will be arranged by the respective Governments through cooperation as mutually agreed and will take place by November 30, 2015. Entry/ exit points would be Haldibari, Burimari and Banglabandha on India-Bangladesh border.

(vi) Both Government shall ensure the safe custody and integrity of land records, where available, and other immovable properties of residents of enclaves till the date of actual transfer when the said enclaves shall vest in the sovereign jurisdiction of the other State and the records shall be exchanged through the relevant designated District Administrations of the two Governments latest by November 30, 2015.

II. Adverse Possessions

(vii) As regards the Adverse Possessions covered under the 2011 Protocol India and Bangladesh shall print sign at the plenipotentiary level and exchange the interim strip maps prepared as provided in Article 3 of the 2011 Protocol to complete the transfer to territorial jurisdiction on the Appointed Day. The ground demarcation of the boundary as per the interim strip maps will be completed by the respective Survey Departments of the two Government by June 30, 2016.

III. Undermarcated Boundary

(viii) India and Bangladesh shall print, sign at plenipotentiary level and exchange the interim shrip maps of the undermarcated sectors prepared as provided un Article 2 of

the 2011 Protocol by the Appointed Day. The ground demarcation of the boundary of the based on these Interim strip maps will be completed by June 30, 2016.

IV. Ownership and Transfer of Immovable Properties

(ix) The enclaves residents exchanging the option of moving from an enclave to the mainland of India and Bangladesh as the case may be shall inform the relevant district administrations prior to the Appointed Day details of the records and specifications of unmovable property held by them. The respective district administration shall put these records in the public domain prior to their moving so as to avoid misuse or usurpation of such property and to enable sale by the owner of the property. The two Governments shall facilitate remittance of sales proceeds of above mentioned immovable properties as appropriate.

2. The existing mechanism of India-Bangladesh Joint Boundary Working Group (JBWG) will finalize all further details in this regard. The same mechanism will be used to address any issue that may arise after the transfer for the next five years till June 2020. Issues pertaining to modalities to facilitate sale of immovable properties referred to in paragraph 1(ix) above and remittance of such sakes proceeds will be addressed by the JBWG at an early date.

3. Excellency, I have the honour further to propose that this latter and your Excellency's reply thereto, confirming that the above sets out correctly the understanding between us shall constitute an Agreement between our two Governments.

(Dr. S. Jaishankar)

H.E.Mr. Md. Shahidul Haque
Foreign Secretary
Government of the People's
Republic of Bangladesh
Dhaka

সংযোজনী- I.XII

The Letter received from the Bangladesh side is as follow

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH,
DHAKA

পররাষ্ট্র সচিব
Foreign Secretary

Excellency

In pursuance of the exchange of Instruments of Ratification between our two governments on June 6, 2015 to bring into effect the Agreement between the Government of the people's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India concerning the Demarcation of the Land Boundary between India and Bangladesh and Related Matters 1974 and the 2011 Protocol to the said Agreement and your letter of June 6, 2015. I have the honor to confirm that the following correctly sets out the subsequent steps to implement the said Agreement and Protocol.

1. Enclaves

(i) Bangladesh and India agree that the Bangladeshi enclaves in India and Indian enclaves in Bangladesh exchanged pursuant to the 1974 Agreements and 2011 Protocol shall stand transferred to the other with effect from the midnight of July 31, 2015. This shall be referred to as the "Appointed Day".

(ii) Prior to the Appointed Day, representative of the two Governments shall conduct a joint visit to the enclaves for the following purposes.

(a) Information the residents of the enclaves of the provisions contained in the 1974 Agreement and the 2011 Protocol, including their rights relating to nationality and citizenship.

(b) Identifying the residents who wish to continue to retain the nationality they hold prior to the actual transfer of territory. This right is available only to those residents who are included in the joint headcount of the population of the enclave finalised and exchanged by the two governments in July 2011 and to the children born to such residents from July 2011 till date.

(c) Collection of data, including photograph, required for issue of entry passes or any other document to facilitate the travel and entry of an enclave resident choosing to return his original nationality.

(iii) The entry, stay and secure functioning of the representatives in the joint visit and setting up of camps shall be facilitated by both Governments.

(iv) Both Governments shall facilitate orderly, safe and secure passage to residents of enclaves along with their personal belongings and moveable property to the mainland of Bangladesh or India, as the case may be including through provision of travel documents.

(v) The travel of the residents who exercise the option of moving from an enclave to the mainland of Bangladesh or India, as the case may be, will be arranged by the respective Government s through cooperation as mutually agreed, and will take place by November 30, 2015. Entry/exit points would be Haldibari, Burimari and Bangladandhu on the Bangladesh-India border.

(vi) Both Governments shall ensure the safe custody and integrity of land records where available and other immovable properties of residents of enclaves till the date if actual transfer when the said enclaves shall vest in the sovereign jurisdiction of the State and the records shall be exchanged through the relevant designated District Administrations of the two Governments latest by November 30, 2015.

II. Adverse Possessions

(vii) As regards the Adverse Possessions converted under the 2011 Protocol Bangladesh and India shall print sign at the plenipotentiary level and exchange the interim strip maps prepared as provided in Article 3 of the 2011 Protocol to complete the transfer of territorial jurisdiction on the Appointed Day, The ground demarcation of the boundary as per the interim strip maps will be completed by the respective Survey Departments of the two Governments by June 30, 2016.

III. Undemarcated Boundary

(viii) Bangladesh and India shall print, sign at plenipotentiary level and exchanging level and exchanged the interim strip maps of the undermacated sectors as provided in Article 2 of the 2011 Protocol by the Appointed Day. The ground demarcation of the boundary of the boundary of the boundary based on these Interim strip maps will be completed by June 30, 2016.

IV. Ownership and Transfer of Immovable Properties

(ix) The enclave residents exercising the option of moving from an enclave to the mainland of Bangladesh or India as the case may be shall inform the relevant district administrations prior to the Appointed Day details of the records and specifications of immovable property held by them. The respective district administrations shall put these records in the public domain prior to their moving so as to avoid misuse or usurpation of such property and to enable sale by the owner of the property. The two Governments shall facilitate remittance of sales proceeds of above mentioned immovable as appropriate.

2. The existing mechanism of Bangladesh-India Joint Boundary Working Group (JBWG) will finalize all further details in this regard. The same mechanism will be used to address any issue after that may arise after the transfer for the next five years till June 2020. Issues pertaining to modalities to facilitate sale of immovable properties referred to in paragraph 1(ix) above and remittance of such sales processed will be addressed by the JBWG at an entry date.
3. Excellency, I have the honour to confirm that the above understand between us on the modalities for implementation of the 1974 Land Boundary Agreement and its 2011 Protocol shall continue an Agreement between our two Governments.
4. Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

(Md. Shahidul Haque)

H.E. Dr. S Jaishankar
Foreign Secretary
Ministry of External Affairs
Government of the Republic of India
New Delhi. New Delhi June 08, 2015

সংযোজনী- I.XIII

Government of West Bengal

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, COOCH BEHAR

জেলা শাসকের করণ, কোচবিহার

Sagar Dighi Complex, P.O. Cooch Behar, Dist. Cooch Behar, Pin- 736101, West Bengal

Phone: (03582) 227101, Fax: (03582) 227000, #e-mail: din-cbr@nic.in, dmcoochbehar@gmail.com

---

NOTICE

No. 06 Dated 25th July 2015

It is necessary and expedient in pursuant to the decision taken during the 6th India-Bangladesh Joint Boundary Working Group meeting help in Dhaka, Bangladesh for smooth implementation of Land Boundary Agreement (LBA) 1974 and in exercise of the power delegated to the District Magistrate, Cooch Behar, West Bengal by the Ministry of Home Affairs, Govt of India (vide No. 26030/145/2015-IC-II Dated.02/07/2015) under Section 16 of the Citizenship Act, 1955, a list of 14,854 persons living in Bangladeshi enclaves located within the jurisdiction of Coochbehar district, India who have opted to acquire Indian Citizenship during the India-Bangladesh Joint Field Visit conducted 06-16 July, 2015 is hereby notified in the public interest.

The said list shall be displayed at prominent public places of all the 51 Bangladesh enclaves. The list shall also be displayed in the Office of the District Magistrate Coochbehar, Office of the Sub-Divisional Officer of Mekhliganj, Dinhata, Mathabhanga & Tufanganj and Office of the Block Development Officer of Mekhliganj, Dinhata-I, Dinhata-II, Mathabhanga-I, Sitalkuchi and Tufanganj-I. The residents of Bangladeshi enclaves whose names are found in that list are requested to submit Claims and Objections if any in writing addressed to the District

Magistrate, Cooch Behar from 25-31 July 2015. The claims & objections may be submitted in the Office of the concerned Block Development Officer, Office of the concerned Sub-divisional Officer of the District Magistrate, Cooch Behar.

After the disposal of Claims and Objections, the citizenship status (acquisition/renunciation) of residents in Bangladeshi Enclaves will be determined as per the Citizenship Act, 1955 following which a final list of persons who have acquired Indian Citizenship and/or renunciated Bangladesh Citizenship will be prepared.

District Magistrate

Cooch Behar

সংযোজনী- I.XIV

Government of West Bengal
OFFICE OF THE MEGISTRATE, COOCH BEHAR
Sagar Dighi Complex, P.O. Cooch Behar, Pin: 736101, West Bengal
Phone: (03582) 227101 # Fax: (038582) 227000, e-mail: din-cbr@nic.in, dmcoochbehar@gmail.com
ENCLAVE CELL

Memo No.: ENC/174/VII-G Date: 31/10/2018

From,
District Magistrate
Cooch Behar

To,
Sri Bhupari Ranjan Roy,
S/o. Lt. Patita Pawan
Falnapur, Mahismuri

Subject: Reply of RTI Query received from Sri. Bhupati Ranjan Roy, Mahismuri.

With reference to the above subject, the point wise reply furnished below:

Query	Reply
Location of Hospitals newly established in the 51 Former Enclave area	Hospitals have been upgraded to accommodate the newly acquired enclave population and their location are as follows • Haldibari Rural Hospital • Dinhata Sub-Divisional Hospital • Mathabhanga Sub-Divisional Hospital • 3nos, of Non-GPI Head Quarter Sub Centres (Masaldanga, Poaturkuthi, Nalgram)
No. of beds in the said Hospitals	No. of beds in the existing hospital have been upgraded as follows:

	• Haldibari Rural Hospital (from 30 beds to 100 beds) • Dinhata Sub-Divisional Hospital (from 230 to 300 beds) • Mathabhanga Sub-Division Hospital (from 170 to 250 beds)
Allotment fund for the said hospitals	• Haldibari Rural Hospital Rs: 905 Lakhs • Dinhata Sub-Divisional Hospital: Rs: 498.97 Lakhs (230-250 bed) • Mathabhanga Sub-Division Hospital: Rs. 325.55 Lakh (170-250 bed) • 3 nos. of Non-GP Head Quarter Sub Centres: Rs. 38.42 Lakh • Power Stn. At Dinhata SD Hospital: Rs. 87.64 Lakh • Electrical works in Hospital upgradation: Rs. 390.34 Lakh

Additional District Magistrate (D)

Memo No.: ENC/174/I/VII-G Date: 31/10/2018

Copy forwarded for information and necessary action

For Additional District Magistrate (D)

1.SPIO, Coochbehar

Coochbehar

সংযোজনী- I.XV

Memo No,: ENC/175/VII-G Date- 31/10/2018

From,

District Magistrate
Cooch Behar

To,

Sri Bhupati Ranjan Roy,
S/o. Lt. Patita Pawan
Falnapur, Mahismuri

Subject: Reply of RTI query from Sri. Bhupati Ranjan Roy, Falnapur, Mahismuri

With reference to the above subject the point wise reply is furnished below:

Sl No	Name of the Chhit	Roads constructed by PWD in KM	Financial Approval
1	Batrihatchi fragment	9.28	Rs 61.33 crore
2	Kismat Btrigatchi	3.27	
3	Poaturkuthi	9.57	
4	Dakshin Masaldanga fragment	8.29	
5	Karala fragment	3.35	
6	Purba Masaldange fragment	2.13	
7	Madhya Masaldanga	1.3	
8	Kachua	2.02	
9	Paschim Masaldanga fragment	0.25	

10	Chit Kutchlibari	2	
11	Balapukhari	2.5	
12	Dhabalsati Mirgipur	1.2	
13	Jote Nijjama	1.3	
14	Chhitland of Jagatber No.3	2.3	
15	Chhitland of Jagatber No.2	3.4	
16	Chhitland of Dhabalguri No.1		

Memo No,: ENC/175/VII-G Additional District Magistrate (D)

Copy forwarded for information and necessary action to: Date: 31/10/2018

1. SPIO, Cooch Behar

সংযোজনী II

সংযোজনী II.I

১

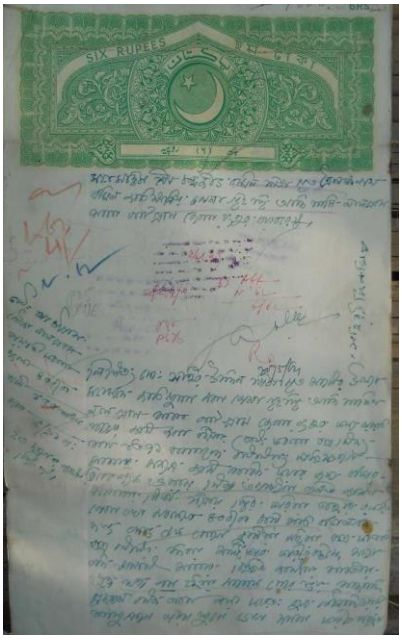

২

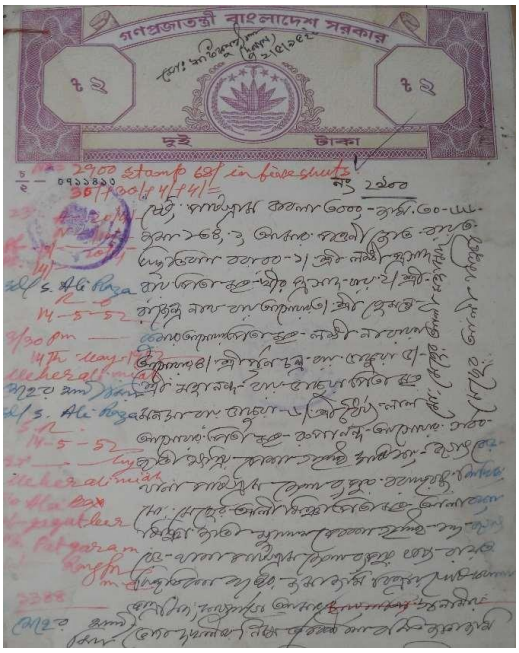

৩

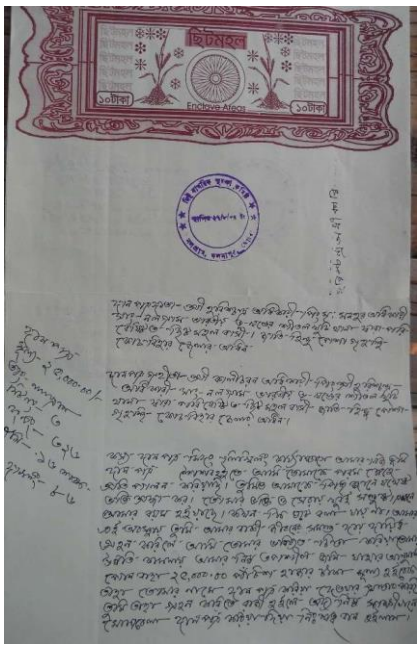

১। পূর্ব পাকিস্তান সম্যে ভারতীয় অধিবাসীদের কাছে থাকা দলিল

২। বাংলাদেশের ছিটের অধিবাসীদের কাছে থাকা দলিল।

৩। নলগ্রাম, ফলনাপুর ও জোংড়া ছিটমহল নাগরিক কমিটির নিজের তৈরি করা জমির দলিল

সংযোজনী II.II

১

২

১। ফলনাপুর (বাংলাদেশের) ছিটে থাকা অধিবাসীদের গৃহ/২. ফলনাপুরে থাকা ছিটমহলের অভ্যন্ত্রে থাকা বাংলাদেশের সীমানার খুঁটি (২০১২) চিত্র: অঙ্কন রায়

সংযোজনী II.III

১। ছিটমহল সমস্যা সমাধানে ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠি (২০০৫)

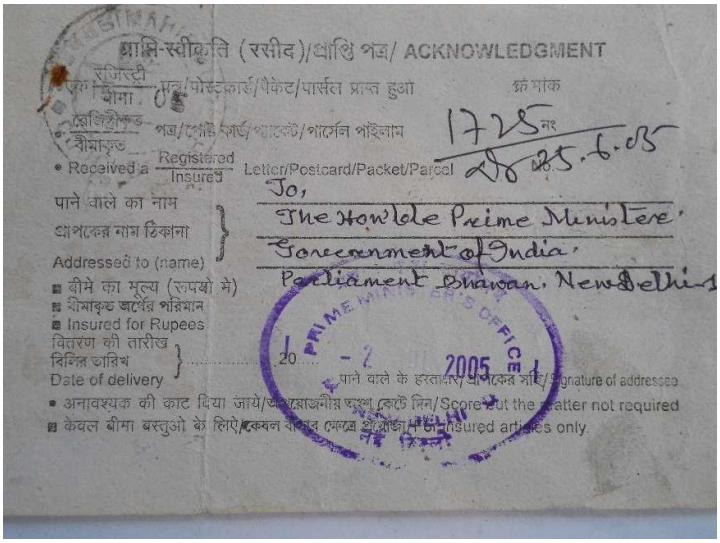

২। ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠি (২০০৬)

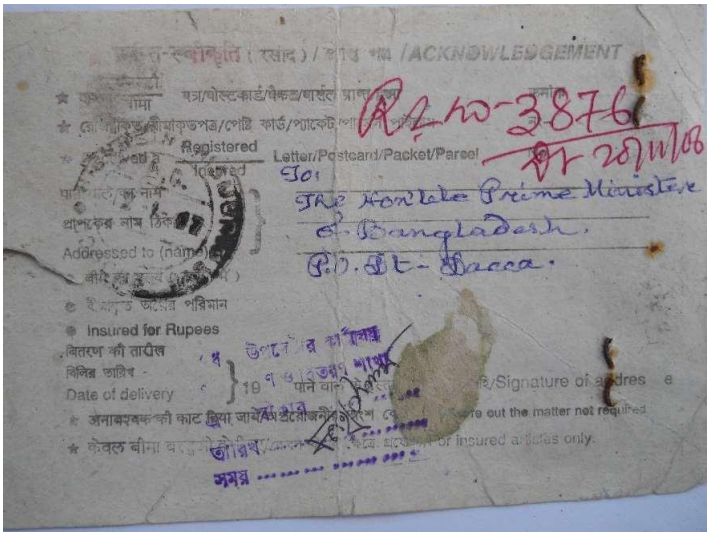

সংযোজনী II.IV

১। ২০১৫ সালে ছিটমহল পরবর্তী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিট (বাঁশকাটা) নবনির্মিত প্রাথমিক স্কুল (ছবি তুলেছেন মহঃ আলাউদ্দিন)

২। বাঁশকাটা ছিটে তৈরি হওয়া মসজিদ(২০২১)

সংযোজনী II.V

১। ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময় হওয়ার পর পোঁয়াতুর কুঠি ছিটমহলে তৈরি হওয়া অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র (২০২০)
চিত্র: অঙ্কন রায়

২। পোঁয়াতুর কুঠি ছিটের বিনিময়ের পর নবনির্মিত কমিউনিটি হল (২০২২)
চিত্র: অঙ্কন রায়

সংযোজনী II.VI

হলদিবাড়ী নব্য নাগরিকদের আবাসন (২০২০) চিত্র: অঙ্কন রায়

সংযোজনী II.VII

ভারতীয় ছিটের অধিবাসীরা ভোট দান, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ৫ই এপ্রিল ২০২০ কুচবিহার

নববর্ষের সেরা উপহার পেয়ে খুশি সাবেক ছিটের রত্নারানি

মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষে উপহার পেলেছে আত্মপরিচয়। ভোটারকার্ড হাতে পেয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত উকিলচন্দ্র বর্মন, রত্নারানি রায়, শ্যামলচন্দ্র বর্মন, নীলরানি রায়েরা। এরা সকলেই সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দা। এরা এবার ভোট দিতে পারবেন বলে তারা শুনেছিলেন। তবু একটা সংশয় ছিল। বাংলা নববর্ষের ঠিক আগের দিন হাতেকেলেই সেই ভোটারকার্ড হাতে পান তারা। আর এতেই উচ্ছ্বসিত মেখলিগঞ্জ মহকুমার ভোটবাড়িতে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় পাওয়া সাবেক ছিটমহলবাসীরা। তারা বললেন, বাংলা নববর্ষের আগে এটাই জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি। কারণ, এতদিন তাদের কোনো নাগরিকত্বের প্রমাণ ছিল না। যা নিয়ে নানা সমস্যায় ভুগলেন তারা। আর ভোটার পরিচয়পত্র হাতে পাবার পর সেই দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হবার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটল বৃহস্পতিবার নববর্ষের দিনটিতেও। চলল একে অপরকে মিষ্টি মুখ করানো, ভালো খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। আনন্দে কেউ কেউ গানও গাইলেন। শিবিরের বিভিন্ন পরিবারের মহিলা সদস্যদের দিনভর নানা রকমের খাবার রাঁধতেও ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল। তাদের কথায়– এর চেয়ে বড়ো উপহার আর কিছুই হতে পারে না। তাই আনন্দ করব না তা হয় নাকি ?

ভোটবাড়ির অস্থায়ী শিবিরে মোট ৭টি পরিবার রয়েছে। ছিটমহল বিনিময় চুক্তি কার্যকর হবার পর এরা বাংলাদেশের ভিতরে থাকা ভারতীয় ছিটমহল গাটামারি, বাঁশকাটা, হাতিবান্ধা প্রভৃতি এলাকা থেকে পছন্দের দেশ ভারতে এসেছেন। প্রশাসন সূত্রেই জানা গেছে, ভোটবাড়ির অস্থায়ী শিবিরে মোট ৪৭টি পরিবারের মধ্যে ১২৬ জনের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোটবাড়ির অস্থায়ী শিবিরে দাঁড়িয়ে বছর ষাটের রত্নারানি রায় বললেন, 'ভোটারকার্ড হাতে পাওয়াতে নববর্ষে খুব আনন্দ হচ্ছে। প্রথম ভোট দেব। এই আনন্দে এদিন বাড়িতে মাছ, মাংস মিষ্টান্ন সহ নানা ধরনের খাবারের আয়োজন করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। বছর পঁয়ত্রিশের শ্যামলচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'জীবনের সবচাইতে মূল্যবান একটি পরিচয় পেয়ে গেলাম ঠিক বাংলা বছরের

বৃহস্পতিবার ভোটারকার্ড হাতে পেলেন রত্নারানি রায়। –সংবাদচিত্র

প্রথম দিনের আগেই।' ষাটোর্ধ্ব উকিলচন্দ্র বর্মন আবার বললেন, 'ভোটারকার্ড হাতে পেয়ে যাবার পর বছরের প্রথম দিনটায় কী যে আনন্দ হচ্ছে সেটা বলে বোঝানো যাবে না।' সবমিলিয়ে অন্য ধরনের নববর্ষের আনন্দে মাতলেন ভোটবাড়ি ক্যাম্পের সাবেক ছিটমহলের মানুষেরা। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা হলদিবাড়ি কৃষিফার্মের সাবেক ছিটের অস্থায়ী শিবিরে গিয়ে বাসিন্দাদের হাতে ভোটারকার্ড তুলে দেন। বাংলা নতুন বছরে প্রথম দিনে ভোটার কার্ড পেয়ে খুশি অস্থায়ী শিবিরের বাসিন্দারা। সাবেক ছিটের বাসিন্দা জয়প্রকাশ রায়, হরি বর্মন, গোবিন্দ রায়, জানান, এর আগে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলেও ভোটারকার্ড না পাওয়ায় বিভিন্ন কাজকর্ম করতে পারছিলেন না। ভোটারকার্ড হাতে পাওয়ায় এবারে তারা ভিনরাজ্যে কাজ করতে যেতে পারবেন। সাবেক ছিটের অস্থায়ী বাসিন্দাদের ভোটপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অস্থায়ী শিবিরে একটি মডেল বুথ কেন্দ্রের নমুনা তৈরি করা হয়েছে।

মানচিত্র

কামতাপুর রাজ্যের দূর্গ

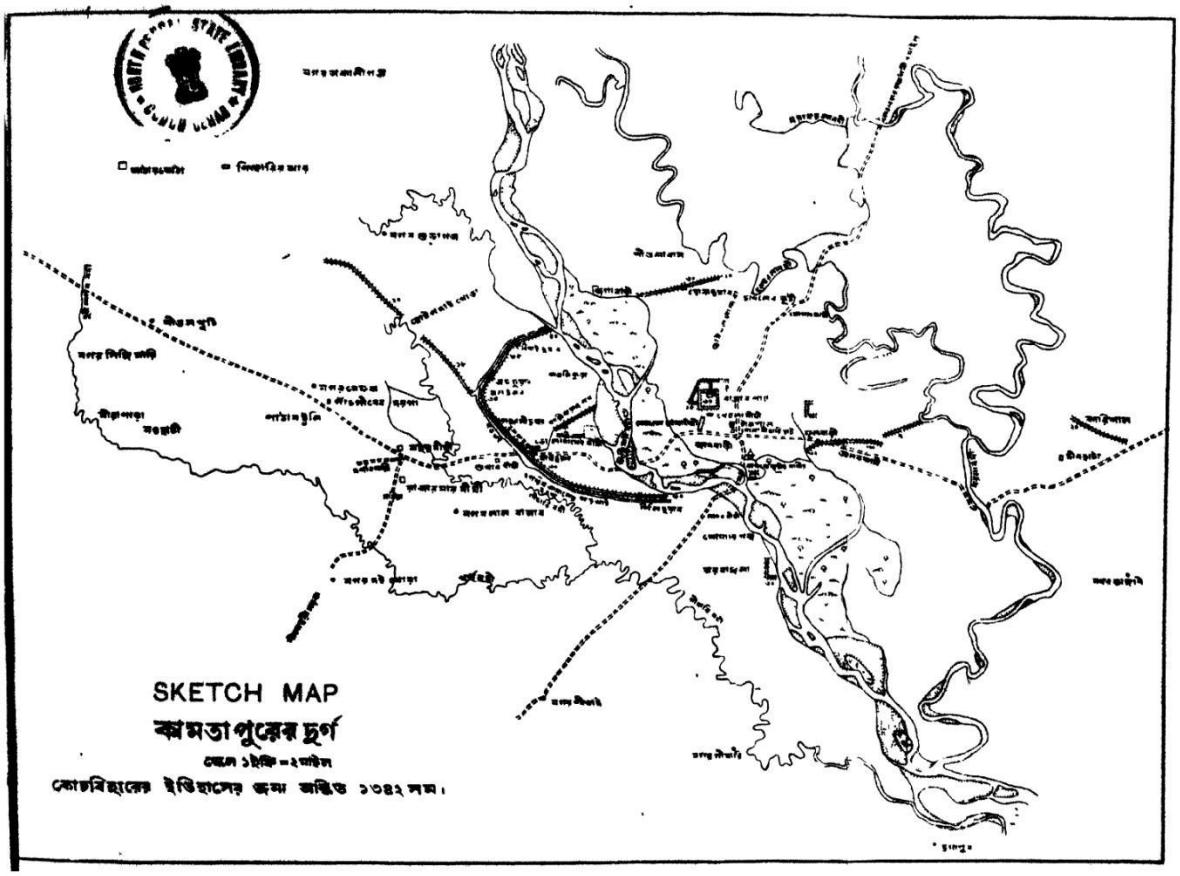

(সূত্রঃ কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ)

ষোড়শ শতাব্দী কামতা রাজ্য

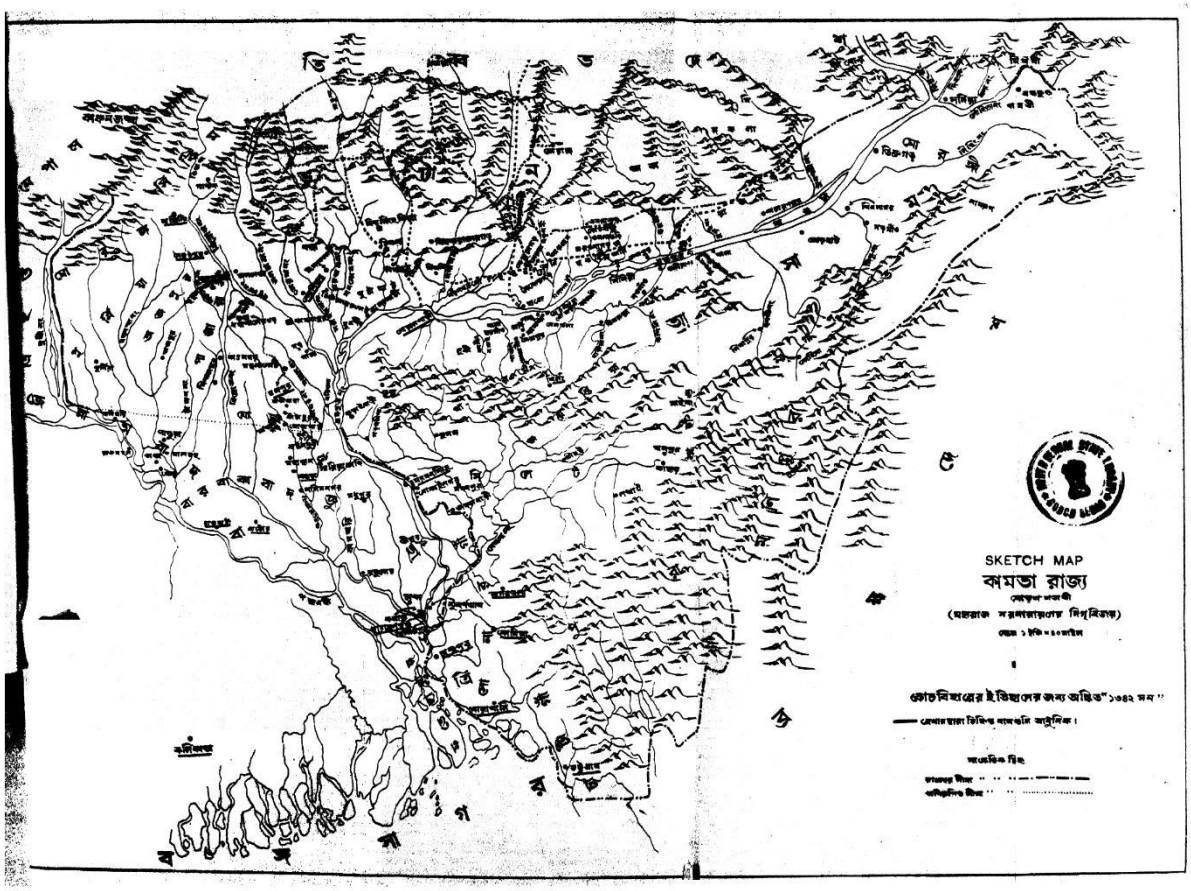

(সূত্রঃ কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ)

পৌরানিক কামরূপ দেশ

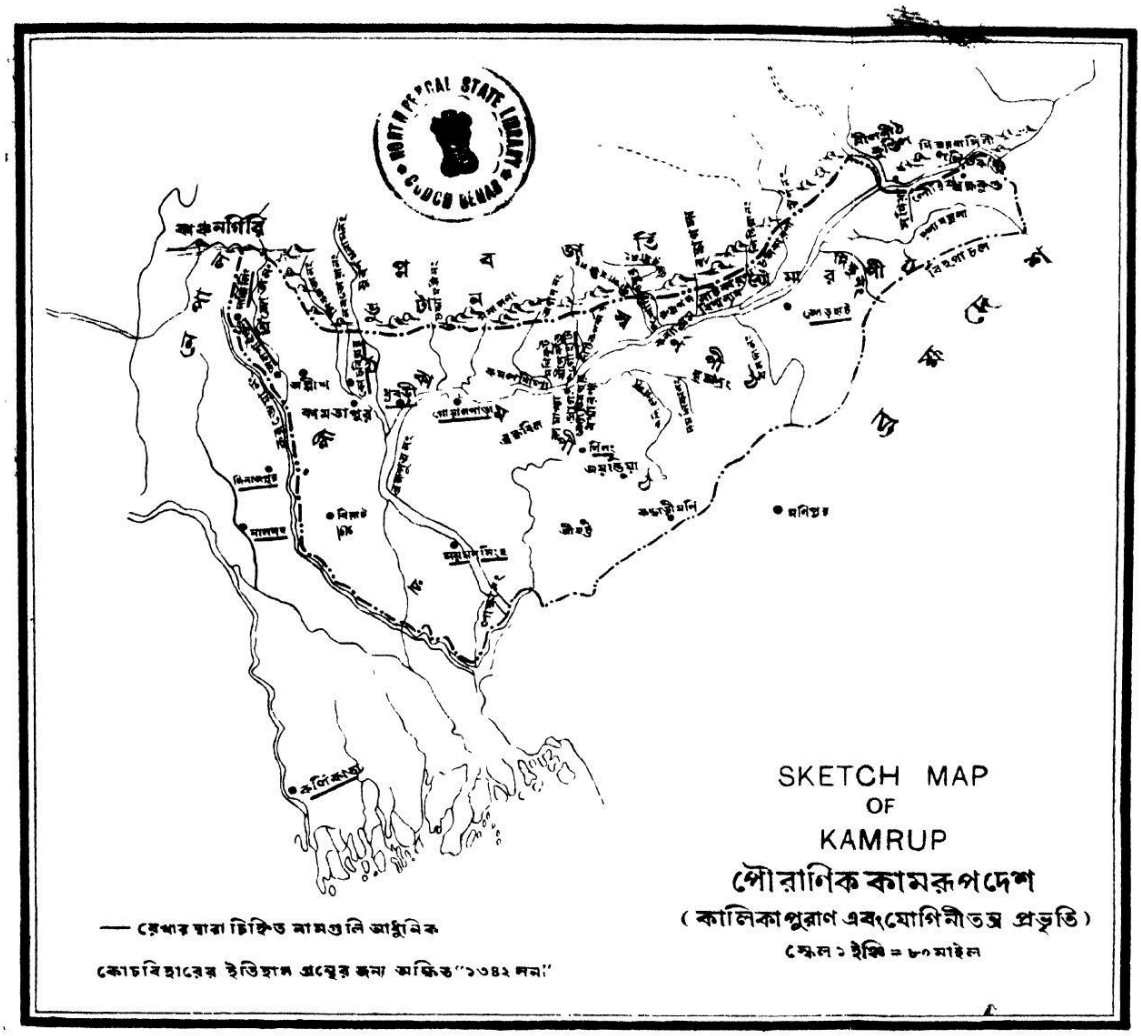

(সূত্রঃ কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খন্ড. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ)

কুচবিহার জেলার ছিটমহলের অবস্থান

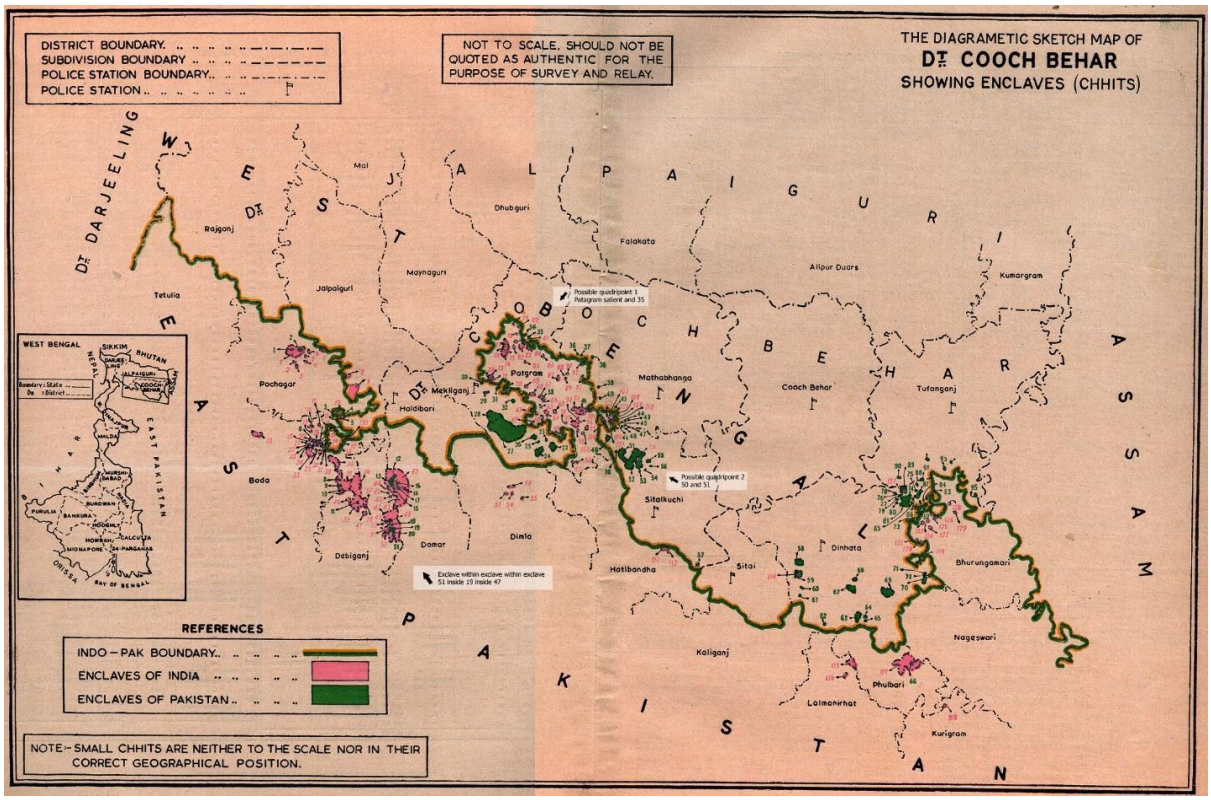

(সুত্রঃ কোচবিহার জেলার জেলাবিভাগের ওয়েবসাইট গৃহীত হয়েছে {এই ওয়েবসাইটটি দেখার দিবসঃ ১২.০১.২০১৮}

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার ছিটমহল চিহ্নিত করার চিত্রিত নকসা, ২৬ সে জুলাই ২০১১)

ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল

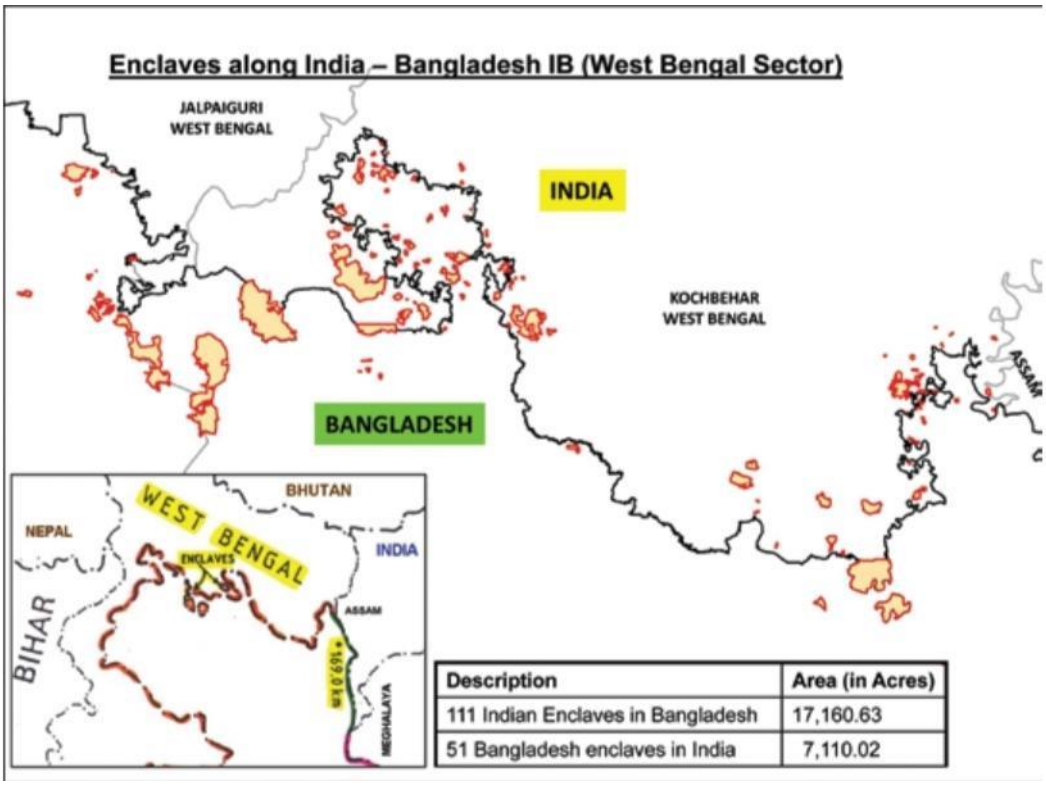

সূত্রঃ Brendan R. Whyte, *Waiting for the Esquimo: A Historical and Documentary study of Cooch Behar enclaves of India and Bangladesh.* Research Paper no. 8. School of Anthropology, Geography and Environmental Studies, The University of Melbourne, 2004.

{১৯৪৯ সালে ভারত-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সীমানার চিত্র)}

ভারত-বাংলাদেশ অ্যাডর্ভাস পজিশন

ANNEXURE - I

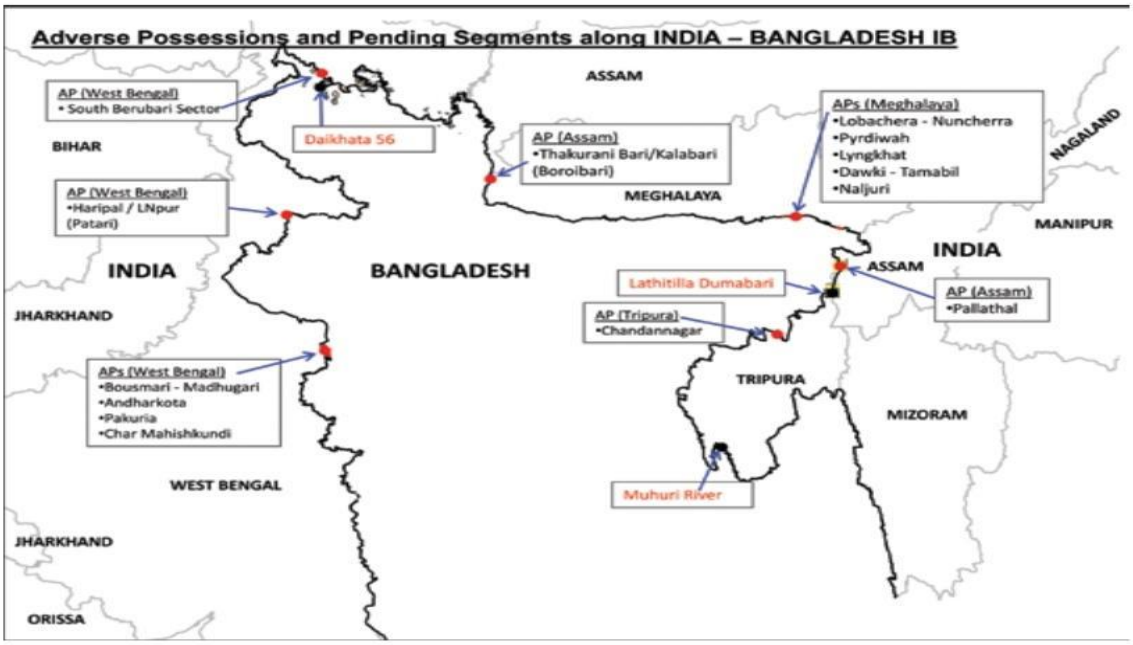

সূত্র নির্দেশঃ

ভারত-বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্ত রূপে থাকা ভূভাগ (Adverse Possission) এর চিত্র

ভারত-বাংলাদেশ বানিজ্যিক রেল ব্যবস্থা হলদিবাড়ী থেকে চিলাহাটী (২০২০)

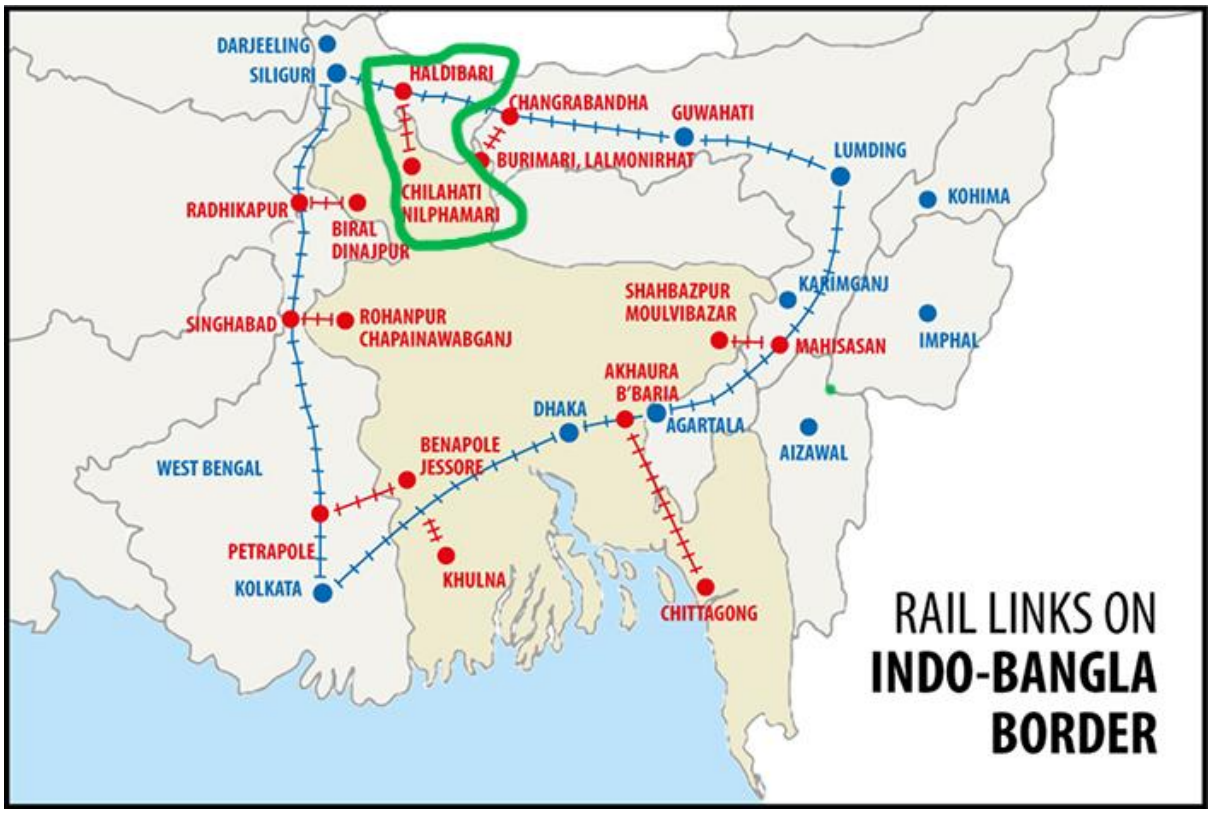

সূত্রঃ ভারত- বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত হলদীবাড়ি ও চিলাহাটি হয়ে মিতালী এক্সপ্রেসের যাত্রাপথের ম্যাপ। এই রেলপথটি ২৬সে মার্চ ২০২১ সালে যাত্রা শুরু করে

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক উপাদান

বাংলা গ্রন্থ

ঘোষ, মুন্সি জয়নাথ: রাজউপাখ্যান, সম্পাদনা বিশ্বনাথ দাস, দ্বিতীয় সংস্করন., কলকাতা, মালা প্রকাশনী, ১৯৮৯. ইংরাজী অনুবাদ Rev. Robinson, কলকাতা ব্যাপ্টিস মিশন প্রেশ, ১৮৭৪.

ফার্সী গ্রন্থ

Allami, Abul Fazl: *Ain-i Akbari, (3 Vols.), vol. 1*, translated into English by Blochmann H., edited by Phillot D.C., reprint ed., New Delhi, Crown Publications, 1988;v*ol. II,* translated into English by Jarrett H.S. and revised by Sarkar Jadunath, reprint ed, (New Delhi, Crown Publications, 1988) and *vol. III*, translated into English by H.S. Jarrett, revised by Jadunath Sarkar, New Delhi, Classical Publishing Co., 1996.

সংস্কৃত গ্রন্থ

কালিকা পুরান, সম্পাদনা তর্করন্ত পঞ্চানন আচার্য, কলকাতা, নবভারত প্রকাশনী, ১৩৮৪ বি. এস.

সরকারি প্রকাশনা ও কার্যবিবরনী.

Administrative Report of the Cooch Behar State , Cooch Behar, The Cooch Behar State Press, *1884-1946.*

Census of India, Census of West Bengal, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991.

Hartley, A.C.: *Final Report of the Rangpur Survey and Settlement Operations,* Alipore, Bengal Government Press, 1940.

Hunter, W.W.: *Statistical Account of Bengal, vol. X, Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar,* reprint ed., Delhi, Concept Publishing House, 1984.

Martin, Montgomery: *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, (5 Vols.)*, reprint ed., New Delhi, Cosmo Publications, 1976.

Stewart, Charles: *The History of Bengal,* London, 1813.

মৌখিক সাক্ষাৎকার: (ছিটমহল -বিনিময় পূর্বে ও পরবর্তী, ছিটমহল উদ্বাস্তু নাগরিকবৃন্ত)

মৌখিক সাক্ষাৎকার আকবর আলী, ১৭ই অক্টোবর, ২০১২।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বলরাম বর্ম্ ১৯সে ফেব্রুয়ারী, ২০১৩/২০১৬, ২০১৮।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বিরেন বর্মন, ১৯সে অক্টোবর, ২০১২।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বিমল বর্মন, ২০ই মার্চ, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বিনোদ বর্মন, ৬ই জুন, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বিরেন বর্মন, ৮ই জুলাই, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বিষ্ণু বর্মন, ৩রা জুলাই, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার দেব চন্দ্র বর্মন, ৩রা জুলাই, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার ধনেশ্বর বর্মন, ১৫ই মে ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার গেনেন্দ্র নাথ বর্মন, ১৫ই মার্চ ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার হৃদয় নাথ রায়, ৮ই জুলাই ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার জগদীশ রায় প্রধান, ২০১৩, ২০১৬,২০১৮।

মৌখিক সাক্ষাৎকার মনসুর আলম, ৯ই মে ২০১৩/ ২০১৬,২০১৮।

মৌখিক সাক্ষাৎকার মহঃ বেলাল হোসেন, ১৭ই অক্টোবর।

মৌখিক সাক্ষাৎকার নিতাই দাস, ৩রা জুলাই, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার প্রতাপ চন্দ্র বর্মন, ২০ই নভেম্বর ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার প্রমোদ বর্মন, ১লা আগষ্ট ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার শশী মোহন বর্মন, ১৫ই মার্চ, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার সুবল চন্দ্র বর্মন,৩১সে জুলাই, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার সুবোধ চন্দ্র রায়, ১৭ই মার্চ, ২০১৩।

ছিটমহল বিনিময় হয়ে আসা ক্যাম্পের অধিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎকার:

মৌখিক সাক্ষাৎকার নারায়ণ রায়

মৌখিক সাক্ষাৎকার জয়প্রকাশ রায়

মৌখিক সাক্ষাৎকার সবুজ রায়

মৌখিক সাক্ষাৎকার সোমার রায়

সহায়ক উপাদান

বাংলা গ্রন্থ

আহমেদ, খান চৌধুরী আমানতউল্লা: কোচবিহারের ইতিহাস, *Vol.1*. কোচবিহার, The Cooch Behar State Press, 1936, পূনমুদ্রন (সম্পা),কলকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৯০।

ঘোষ, আনন্দ গোপাল: কোচবিহারের ইতিহাস, সম্পা: আনন্দ গোপাল ঘোষ ও নারায়ণ সাহা, দাজ্জিলিং, উত্তরবঙ্গ ইতিহাস প্রকাশনী পরিষদ, ১৯৯০।

বন্ধ্যোপাধ্যায়, ভগবতী চরন, কোচবিহারের ইতিহাস, কোচবিহার, দ্যি কুচবিহার স্টেট প্রেস, ১৮৮৪,

বন্ধ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পা:): দেশভাগ দেশত্যাগ, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৪।

---------: *স্মৃতি আর সত্তা,* কলকাতা, পোগ্রেসিভ পাবলিকেশন্, ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়: উদ্বাস্তু, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭০।

চাকী, দেবব্রত: ব্রাত্য জনের বৃতান্ত: প্রসঙ্গ: ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল, কলকাতা, সোপান, ২০১১।

চক্রবর্তী প্রফুল্ল কুমার : প্রান্তিক মানব: পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা, কলকাতা, প্রতিক্ষন পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।

বিশ্বাস রাজর্ষি (সম্পাঃ) : ছিটমহল ইতিহাস জনজীবন সংস্কৃতি, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৮।

বিশ্বাস রাজর্ষি (সম্পাঃ): ছিটমহলের নতুন গল্প, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৮।

রববানী মোহম্মদ গোলাম: বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহলঃ অবরুদ্ধ ৬৮ বছর, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭।

রায়চৌধুরী লাডলীমোহন: ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯।

সেলিম মহম্মদ: বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৯।

ইংরাজী গ্রন্থ

Banerjee, Parul. Basu Rou Choudhury and Ghosh Atig (ed.): The State of Being Stateless: An account of South Asia, Delhi, Orient Blackswan, 2016.

Barma, Sukhobilash (eds): *Socio-political movements in North Bengal(A Sub-Himalayan Tract)* edited by Sukhobilash Barma, (Global Vision Publishing House, New Delhi), 2007.

Barman, Rup Kumar: *The Origin and Evolution of the Enclaves of India and Bangladesh: A Historical Study'* (Avhijeet Publication, New Delhi) 2019.

----------: *Migration, State Politics and Citizenship: A Historical Study on India, Bangladesh, and Bhutan; Aayu Publication,* New Delhi, (2021),

----------: The Enclaves of the India-Bangladesh Border: History, Statelessness and Bilateral Relations, (Routledge, 2023).

Butalia, Urvashi: Community, State and Gender: On women Agency during partition, *Economic and Political Weekly, 24th April 1993.*

----------: *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India,* New Delhi, Penguin Books, 1998.

Catudal, Honore Mark: *"Exclaves," Cahiers de Geographic de Quebec 18(43)1974:* pp107-36; "Berlins New Boundaries", Cahiers de Geographic de Quebec 18 (43) 1974: 213-36.

Chakraborti, Prafulla K.: *The Marginal Men: The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal,* Kalyani, Lumiere Books, 1990.

Chatterji, Joya: *The Spoils of Partition: Bengal and India 1947-1967.* Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

Chaudhuri, Harendra Narayan: *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlements*, Cooch Behar, The Cooch Behar State Press, 1903.

Das, Durga (ed): *Sardar Patel's Correspondence 1945-1950, 10 Vols*. Ahmedabad, Nabajiban Publishing House, 1973.

Das, Suranjan: *Communal Riots in Bengal, 1905-47,* Oxford University, South Asian Studies, 1991.

Ghosh, Parth S: Unwanted and Uprooted: A Political Study of Migrants, Refugees, Stateless and Displaced of South Asia, New Delhi, Samskriti, 2004.

Guha, Amalendu: *Medieval and Early Colonial Assam, Society Polity Economy,* Calcutta, K.P. Bagchi & Co. 1991.

Gupta, U.N.: *The Human Rights: Conventions and Indian Law*, New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 2004.

Karan,P.P.: *A Free access to Colonial Enclaves*, Annals of the Association of American Geographers, 50 (June, 1960),

----------*The India-Pakistan Enclaves Problem*, Professional Geographers 18 (1966)

Karma, A.J.: *The Prolonged Partition and Its Pogroms: Testimonies on Violence against Hindus in East Bengal 1946-64,* New Delhi, Voice of India , 2000.

Martin, Montgomery: *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, (5 Vols.)*, reprint ed., New Delhi, Cosmo Publications, 1976.

Menon, V.P.: Integration of the Indian States, reprint ed., Madras, Orient Longman Ltd., 1995.

Misra, Omprakash (ed): *Forced Migration in the South Asian Regions: Displacement, Human Rights and Conflict Resolution,* New Delhi, Manak Publications Pvt. Ltd, 2004.

Mishra, Promod Kumar: Human Rights in South Asia, Kalpaz Publication, New Delhi, (2004).

Nag, Sajal: *Nation and Its Modes of Oppression in South Asia*; (Routledge India, London), 2023।

Poole Ross: Nation and Identity, London, Routledge, 1999.

Pradhan, Amar Ray: *Rules of Jungle,* Calcutta. N.D.

Rabbani, Md. Golam: Statelessness in South Asia: Living in Bangladesh-India enclaves in *Theoretical Perspective, Vols 12 and 13* (2005-2006).

Roy, Anupama: Oxford India Short Introductions: Citizenship in India, New Delhi, Oxford University Press, 2016.

Ruiz, Casetello Del: *Llivia, Imprenta del Servicio Geografico del Ejercito*, Madrid, 1976.

Saha, Rekha*: India Bangladesh Relations*, Calcutta, Minerva Associates Publication Pvt. Ltd, 2000.

Samaddar, Ranabir: *Marginal Nation: Trans-border Migration from Bangladesh to West Bengal*, New Delhi, Sage, 1999.

Schendel, Willem van: Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclaves, *the Journal of Asian Studies, 61.no 1 (February, 2002*), 115-147.

Whyte, Brendan R.: *Waiting for the Esquimo: A Historical and documentary Study of the Cooch Behar Enclaves of India and Bangladesh,* Melbourne, University of Melbourne Press, 2004.

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা:

The Cooch Behar Gazette,

The Daily Star

উত্তরবঙ্গ সংবাদ (শিলিগুড়ি)

আনন্দবাজার পত্রিকা

'উওর প্রসঙ্গ' কুচবিহার

প্রথম আলো, ইদ সংখ্যা

বর্তমান (শিলিগুড়ি)

আন্তর্জাতিক দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ও কনফারেন্স:

'*A Study of Stateless,* United Nations, August 1949, Lake Success-New York'.

'*Convention on the Reduction of Statelessness* adopted on 30 August 1961 by a Conference of Plenipotentiaries which met in 1959 and reconvened in 1961 in pursuance of General Assembly resolution 896 (IX) of 4 December 1954.

Human Rights in Bangladesh 1997, Bangladesh legal aid and services trust (BLAST); Madaripur legal aid association (MLAA); Ain O salish kendra (ASK); Odhikar, The University Limited, Dhaka,

International Covenant on Civil and Political Rights (1966) (Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966 Optional Protocol to the above-mentioned Covenant, Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), adopted and opened for signature, ratification, and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI), of 16 December 1966, entry into force 3 January 1976, in accordance with article 27

International convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (1965).

Refugees International: A collection of photos from Refugees International missions focused on Statelessness, March 2009.

The Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960 (28th December, 1960)

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979),

The Convention on the Rights of the Child (1989),

The United Nations Organizations: Guiding Principles on Internal Displacement, New York, United Nations Publications, 2001, reprint edition, Geneva, United Nations Publications, 2004.

UN Declaration for Elimination of Violence against Women (1993).

UN Convention on the Rights of the Child (1989).

UNHCR: *The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons: Implementation within the European Union Member States and Recommendations for Harmonisation*, October, 2003.

UNHCR: *The Concept of Stateless Persons under International Law, Summary Conclusions* (Prato, 2010).

UNHCR: *Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the office of the High Commssioner for Human Rights; compilations Report Universal Periodic Review: Republic of Maldives.*

UNHCR: *Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the office of the High Commssioner for Human Rights; compilations Report Universal Periodic Review: Republic of Afghanistan.*

বাংলা প্রবন্ধ:

কবির শাহরিয়ার: বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা, ঢাকা, অনন্যা, ২০১৩।

চাকী, দেবব্রত (সম্পাদনা): ছিটমহল ও মানবাধিকার, উত্তর প্রসঙ্গ একটি আত্ম-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জানার্ল, কোচবিহার, ২০০৮।

চাকী, দেবব্রত (সম্পাদনা):এক কুড়ি বর্ষে তিনবিঘা কড়িডর সীমান্ত সমস্যা ও স্থলসীমা চুক্তি ১৯৭৪-র প্রাসঙ্গিকতা, উত্তর প্রসঙ্গ একটি আত্ম-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জানার্ল, কোচবিহার, vol-6.No. 7, জুলাই-২০১২, পৃ.পৃ.৫-২৫।

-----রায়, গোবিন্দ: 'ভারতভূমি ও তিনবিঘা হস্তান্তরের ২০ বছর' কিছু কথা।

-----গুহ, সুশান্ত: রক্তাক্ত তিনবিঘা'স কুড়ি বছর।

দাশ, অভিজিৎ: তিনবিঘা আন্দোলন: প্রেক্ষাপট ও প্রকৃতি; দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা): *তিনবিঘা গনচেতনার গতি প্রকৃতি- এই গন আন্দোলন বিষয়ক সংকলন,* কোচবিহার বইমেলা, জানুয়ারী ২০১০, কোচবিহার

পাল, সাধন কুমার: ছিটমহল সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন ভারতীয় ছিটমহলে করিডোর ও উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব, দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা) উত্তর প্রসঙ্গ, বর্ষ ২০১৩/১৪২০, জুন-জুলাই সংখ্যা ১৩, নং ৬-৭।

বর্মা ধর্মনারায়ণ ও মান্তা ধনেশ্বর: কামরূপ কামতা কুচবেহার রাজ্যের ইতিহাস, প্রকাশক মিনতি অধিকারী, কুচবিহার, ২০০৫।

বর্মণ, রূপ কুমার: ইতিহাস, ঐতিহাসিক ও ইতিহাস চর্চা কোচবিহার রাজ্যে রচিত ইতিহাসের একটি বিশ্লেষণ, দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা), উত্তর প্রসঙ্গ – একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল, কোচবিহার, এপ্রিল ২০১৪।

বর্মণ, রূপ কুমার: ছিটমহল বৃতান্ত: উত্তরবঙ্গের ছিটমহল ও ছিটমহল বাসীদের প্রান্তিকতার বিবিরন, অর্ন্তমুখ, *Vol-3, No. 1, (July-Sep 2013).*

রায় হরিপদ, অভিজিৎ দাস (সম্পাঃ): গন আন্দোলনে কোচবিহার, কলকাতা, অ্যালবাট্রাস, ২০১৯।

রায়, হরিশ চন্দ্র: ছিটমহল সমস্যা প্রসঙ্গ আড়াই বিঘা কড়িডোর ও বোদেশ্বরী মন্দির, দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা) উত্তর প্রসঙ্গ, বর্ষ ২০১৩/১৪২০, জুন-জুলাই সংখ্যা ১৩, নং ৬-৭।

রায়, হরিশচন্দ্র: স্বাধীনোত্তর উত্তরবঙ্গের গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়- "বেরুবাড়ি আন্দোলন", দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা); *উত্তর প্রসঙ্গ, বইমেলা সংখ্যা,* ১৪১৫/২০০৮-০৯, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, কোচবিহার।

রায়, হরিশ চন্দ্র: স্বাধীনোত্তর উত্তরবঙ্গের গন আন্দোলনের ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, উত্তরবঙ্গ, Vol-2, no. 4 (২০০৮-২০০৯) ।

রায়চৌধুরী, শুভপ্রতিম: না নাগরিকের নাভিশ্বাস ভারত বাংলাদেশ জটিল মানচিত্রে অবস্থিত 'ছিটমহল'- এর যাপনকথা, কষ্টকথা, বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম)।

ইংরাজী প্রবন্ধ

Barman, Rup Kumar: The proxy citizens of North Bengal A Study on the present condition of the people of Indian enclaves in Bangladesh; *Karatoya*, University of North Bengal, Hist. Vol.7, Siliguri.

Barman, Rup Kumar: Contested Indentity of Stateless Indians: A Study on the Chhitmahal-dwellers of India-Bangladesh Border Zones, Krishana Banerjee and Prasanta Mondal (Edited): *One The Twin Wheels Unity and Plurality India Through Ages*, Aruna Prakashan, Kolkata, pp. 41-86.

Banerjee, R. N.: An Account of Enclaves –Origin and development, in B. Ray(ed): *District Census Handbook Cooch Behar,* Alipore, 1966, pp.128-133.

----------: Indo-Pakistani Enclaves, *India Quarterly 25(1969),* 254-7.

Banerjee Sreeparna, Guha Ambalika, Basu Roy Chaudhury Anasua: The 2015 India-Bangladesh Land Constraints and Exploring Possibilities in Cooch Behar, ORF (Observer Research Foundation), July 2017.

Bose, Partha Pratim: The Indo-Bangladesh 'Enclaves' ana a Disinherited People, Journal of International Relations, Vol-15, Jadavpur University, (2011).

Chatterji, Joya: The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and the Bengal's Border Landscape, 1947-52", *Modern Asian Studies*, *vol 33, no 1 (1999),* pp. 185-242.

Choudhury, Sushmita & Hussian, Maria: Gray Image of Humanity in the Enclaves Zone, National Human Rights Commission, Bangladesh, Dhaka, 2013.

Hamilton, Buchanan: Account of Rungpur*, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 73.I.7 (1838),* pp.1-19.

Jones,Reece: Sovereignty and statelessness in the border enclaves of India and Bangladesh written By Political Geography 28 (2009).

Jones, Reece: Sovereignty and Statelessness in the border enclaves of India and Bangladesh, *Political Geography*, 28 (2009), pp. 373-381.

Robinsen, G.W.S: West Berlin: *The Geography of an enclave, Geographical Review, 43(1953),* pp. 540-57.

---------: Exclaves: *Annals of the American geographers, 49(September)* 1959, pp-283-95.

Schendel Van Willem: Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclaves; *The Journal of Asian Studies*, Vol-61, No.1 (Feb-2002), pp. 115-147.

Unpacking Bangladesh's 2014 Elections A Clash of the "Warring Begums" written by Pavlo Ignatie

Lives outside the map: the case of Angorpota-Dohogram Enclave, Bangladesh written by. M Atiqur Rahman, Md. Mahbub Murshed, Nahid Sultana, IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 9, Issue 1 (Mar. - Apr. 2013), PP 71-76

Wirsing G. Robert and Das Samir Kumar: Bengal's Beleaguered Borders: Is there a fix for the Indian Subcontinent's Transboundary Problems? The Asia Papers, No.I, Center for International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service in Qatar, 2016.

অন্তঃজাল (Webliography)

- IOSR Journal (iosrjournals.org)
- https://idsa.in/strategicanalysis/BorderManagementDilemmaofGuardingtheIndiaBangladeshBorder_nsjamwal_0104
- http://ontology.buffalo.edu/smith/baarle.htmhttps://sgp.fas.org/crs/row/R46651.pdf
- http://www.traveladventures.org/continents/asia/madha-nahwa-enclave.html
- https://books.openedition.org/obp/4562?lang=en#tocfrom1n3
- https://www.unhcr.org/ibelong/aboutstatelessness/#:~:text=What%20is%20statelessness%3F,the%20nationality%20of%20any%20country.
- https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/internationalcovenantcivilandpoliticalrights#:~:text=Article%2024,1.&text=Every%20child%20shall%20have%2C%20without,family%2C%20society%20and%20the%20State.
- https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial.
- https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/conventioneliminationallformsdiscriminationagainstwomen#:~:text=of%20international%20organizations.,Article%209,change%20or%20retain%20their%20nationality.
- https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/convention-rights-child.
- https://www.un.org/.
- http://www.bdembassyusa.org/uploads/forms/Citizenshiplaw%20amendment.pdf.
- http://athmandupost.eksantipur.com/news/2015-09-30/.
- www.institute.org/wb2015-02-Rothe pdf.
- www.rcusa.org/blog.
- www.refworld.org/docid/50aca6112.html.
- https://prsindia.org/theprsblog/explainer-citizenship-amendment-bill-2019
- https://gjia.georgetown.edu/2022/06/14/the-perpetual-foreigner- statelessness-among-the-vietnamese-minority-in-cambodia/.
- https://www.refworld.org/docid/3ae6b4f71b.html.